সাহিত্যধারা

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রকাশক | রমা ভট্টাচার্য | এ-১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭

মুদ্রক | বাণীরূপা প্রেস | ৯এ মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৯

ব্লক | টাইপোগ্রাফিক আর্টস | ৫৪।১বি পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ | ফ্রিৎস শুল্‌ৎজে-এর মূল চিত্র (২১৯ পৃষ্ঠা দেখুন)
অবলম্বনে প্রবীর সেন

সূচীপত্র

কেন এই সংকলন

"গুরুতর রকম আহত হয়ে চ্যান্সেলার ডলফাস ভিয়েনার চ্যান্সেলারি বিল্ডিংএ অন্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিল। 'আমার—আমার পরিবারকে দেখো তোমরা।' এই তার শেষ কথা। ঠিক তার আগের দিন, এক তরুণ সোশাল ডেমোক্রাট শ্রমিক, জোসেফ গের্ল ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিয়েছেন এই চ্যান্সেলার ডলফাস-এরই বিশেষ নির্দেশে অভিযুক্ত হয়ে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে গের্ল বলেছিলেন: 'স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক্।'···

"বার্লিনের লিহ্‌ক্‌টেন্‌'ফ'ল্ড একটি দেওয়ালের গায়ে বহু বুলেট বিদ্ধ হবার দাগ আছে। ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসের পর স্টর্ম-ফ্যয়েরার আর্নস্ট-এর আদেশে আশিজন কমিউনিস্ট শ্রমিককে এখানে গুলি করে হত্যা করা হয়। উদ্যত রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে শুরু করেন এবং এই বিপ্লবী সঙ্গীতের শব্দ মুখে নিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তারপর ১৯৩৪-এর জুলাইয়ে স্বয়ং আর্নস্টকে এই দেওয়ালের সামনে এনে দাঁড় করায় গোয়েরিঙ। আর্নস্টকে টেনে হিঁচড়ে বধ্যভূমিতে আনতে হয়, সে তখন সাহায্য প্রার্থনা করে আর্তনাদ করছিল, চিৎকার করে বলছিল যে সবাই পাগল হয়ে গেছে, কৃপা ভিক্ষা করছিল সে, কাকুতি মিনতি করছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বধ করার জন্য ছোঁড়া বুলেটগুলো দেহ স্পর্শ করার আগেই সে ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। এটা শুধুই কাকতালীয় জাতের ব্যাপার নয় যে আশিজন শ্রমিকের মধ্যে একজনও এতটুকু বিচলিত হননি। তাঁরা জানতেন কেন তাঁরা নিহত হচ্ছেন এবং তাঁদের বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের অবিচলিত থাকতে হবে, বিশ্বাসভঙ্গ করা চলবে না কারণ, তাঁদের এই সাহস, তাঁদের এই মৃত্যুও হাজার হাজার মানুষকে জীবনের জন্য সংগ্রামে ব্রতী করবে"

এই উদ্ধৃতি জুলিয়াস ফুচিকের লেখা 'হিরোজ অ্যাণ্ড হিরোইজম' থেকে। 'বেঁচে থাকি বিদ্রোহে'—সংকলনটি এই উদ্ধৃতিরই সম্প্রসারণ মাত্র। জোসেফ গের্ল বা ওই আশিজন শ্রমিকের মতো জীবনপ্রেমীরা যাঁরা স্বাধীনতা মুক্তি ও সাম্যের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করেছেন, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করবার মহান আদর্শে যাঁরা উদ্বুদ্ধ, যাঁদের মৃত্যু হিমালয়ের চেয়ে ভারী, এমন কয়েকজন মানুষের, শহিদের চিঠি, গল্প, বিবৃতি বা স্মৃতিকথার সংকলন 'বেঁচে থাকি বিদ্রোহে'।

এই সংকলন অসম্পূর্ণ বলাটা যথেষ্ট নয়। বলা উচিত সর্বৈব অসম্পূর্ণ। প্রথমতঃ, কবিতা বা তাত্ত্বিক আলোচনা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, যে কটি লেখা স্থান পেয়েছে হয়তো তার চতুর্গুণ লেখা সংকলিত করা উচিত ছিল। আসলে, এ ধরনের কাজ কখনো ব্যক্তিগত প্রয়াসে সফল হতে পারে না। সম্পাদকের অজ্ঞানতা আর প্রকাশকের আর্থিক সঙ্গতি একটি সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে। সংকলনে অন্তর্ভূক্ত হয়নি এইরকম কিছু গল্প, স্মৃতিকথা, চিঠি বা বিবৃতির একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে পরিশিষ্ট হিসাবে। এই লেখাগুলি বাংলায় পুস্তকাকারে বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই তালিকাও অসম্পূর্ণ। ম্যাক্সিম গোর্কী বহু পঠিত বলেই বাংলায় অনূদিত তাঁর রচনাপঞ্জী সংযোজিত হয়নি কিন্তু করা উচিত ছিল। সব অসম্পূর্ণতার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েও আমার বিশ্বাস সংকলটি এধরনের কাজের প্রথম প্রয়াস স্বরূপ একটি দায়িত্ব পালন করবে প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মুক্তিকামী বিদ্রোহী বিপ্লবীর উচ্চারণের মর্মেই যে আন্তর্জাতিকতাবোধ ক্রিয়াশীল, এই অনুভব সঞ্চারিত করবে সংকলনটি। অষ্টাদশ শতাব্দীর আয়ার্ল্যাণ্ডের সন্তান রবার্ট এম্মেত, উনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার সন্তান জন ব্রাউন কি বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের এই বাংলারই তরুণ তিমিরবরণ সিংহ সবারই উচ্চারণের সুর একটি জায়গায় এসে এক হয়ে যায়—এক ঐকতানে পরিণত হয়—দুনিয়ার সর্বহারা এক হও! ভিন্ন দেশ, ভিন্ন কাল ভিন্ন পরিস্থিতি, ভিন্ন ভাষায় উচ্চারিত কিন্তু তবু সেই একই আন্তর্জাতিক মহাসঙ্গীত

মৃত্যু শহিদের জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিতে পারে না ব্যক্তিগত জীবনের আয়ু ফুরোলেও তাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁদের আদর্শে, তাঁদের অবিনত স্পর্ধায়। তাঁদের মৃত্যু নিপীড়িত মানুষকে জীবনকে জয় করার পথ দেখায় উদ্বুদ্ধ করে—

'মরণে মেলেনি ছুটি, মৃত্যু তার হল অর্থহীন,—
মরিয়া জীবন্ত হাতে আজো সে গড়িছে ইতিহাস,

(লেনিন, সরোজকুমার দত্ত

চিন্তা করে বিস্মিত হতে হয়, বিশ্বাস করতে যন্ত্রণায় অস্থির হতে হয়, তবু সত্য এইটাই যে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীরা সুযোগ পেলে তাঁদের মৃত্যুকেও অস্ত্র করেন, ব্যবহার করেন। ফাঁসির দড়ি গলায় পরেও তাঁরা তাই ঘোষণা করেন, কোন অন্যায় আমি করিনি, আবার যদি এ জীবন ফিরে পেতাম তবে যা করেছি তা আবারো করতাম। রবার্ট এম্মেত, জন ব্রাউন, সাকো ও

ভানজেত্তি, ভগৎ সিং—সকলেই এই একই কথা বলেছেন। বলেছেন আমাদের উদ্দেশে। যাদের তাঁরা রেখে গেলেন তাদের উদ্দেশে। তাঁদের জীবনের শেষ শব্দটিও মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। বর্তমান সঙ্কলনটি এই শপথই বহন করুক এর চেয়ে বেশী কাম্য আর কি হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, নিপীড়নকারী শ্রেণী কিন্তু বিদ্রোহী বিপ্লবীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করে, বেদিমূলে সাদা ফুলের স্তবকের শ্রদ্ধার্ঘ্য দেয়, লেনিন তাই সতর্ক করে দিয়েছেন :

"মহান বিপ্লবীদের জীবদ্দশায় নিপীড়নকারী শ্রেণীরা তাঁদের অবিরাম উৎপীড়ন করে, তাঁদের শিক্ষাকে নিপীড়নকারীরা বর্বরতম বিদ্বেষ ভরে প্রচণ্ডতম ঘৃণা ভরে এবং মিথ্যা ও কুৎসার সম্পূর্ণ নীতিজ্ঞানবর্জিত রটনার আক্রমণ সমেত গ্রহণ করে। মহান বিপ্লবীদের মৃত্যুর পর চেষ্টা চলে তাঁদের অক্ষতিকর বিগ্রহে (icon) পরিণত করার—ধর্মীয়গুরু তৈরি করার আর কি। নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতি 'দরদ' দেখাতে তাঁদের নামগুলিকে এক ধরনের জ্যোতি দিয়ে মুড়ে ফেলা হয় যার উদ্দেশ্য হল নিপীড়িত শ্রেণীকে প্রতারণা করা এবং একই সঙ্গে বিপ্লবী শিক্ষার সারমর্মটিকে নির্বীর্য করা, এই শিক্ষার বিপ্লবী ধারকে ভোঁতা করা এবং বিকৃত করা।"

এই সংকলনের লেখকরা সকলেই সাহিত্যিক নন। আভিধানিক অর্থে বুদ্ধিজীবীও নন সকলে। কিন্তু তাঁরা দার্শনিক—মহান দার্শনিক—তাই তাঁদের কাজে ও কথায় কোন বিরোধ নেই। তাঁরা গল্পই লিখুন বা রাজনৈতিক আলোচনাই করুন তাঁদের শক্তিমত্তাই বুঝিয়ে দেয় কেন তাঁদের নিহত হতে হয়েছে। কেন অত্যাচারীরা তাঁদের সরিয়ে দিতে উদগ্রীব। অসি ও মসীর এক বিরল মিলন ঘটেছে এঁদের ক্ষেত্রে। বিপ্লবী শ্রীসরোজ দত্তের কবিতা উদ্ধৃত করে বলা যায়—

মৃত্যুরে যে প্রাণ ব'লে ধ্বংস আনে সৃষ্টিচ্ছলে
তারি প্রাণবিনাশের লাগি
প্রাণের পরিখাদ্বারে নিশীথের অন্ধকারে
যারা রহে প্রহরায় জাগি
তাদের অসির আলো ঘুচাল মসীর কালো
অসি মসী এক হয়ে মেশে
গাণ্ডিবী রবে না আর রাজকন্যা উত্তরার
ক্লীব সখী বৃহন্নলা বেশে। (অসি ও মসী)

ভবিষ্যতে শহিদের লেখা কবিতার একটি সংকলন ও বর্তমান সংকলনটির আরো একটি খণ্ড প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে তাই পাঠকদের কাছে একটি আবেদন রাখছি। আপনারা যদি শহিদের রচনা সংকলনের কাজে উদ্যোগী হন এবং প্রকাশকের কাছে আপনাদের সংগ্রহ-করা তথ্য প্রেরণ করেন, তবে আমাদের পরবর্তী প্রয়াস একটি সমবেত প্রয়াস হতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীসুনীল বসু তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহাগার ব্যবহার করতে দিয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। শ্রীমতী ছবি বসু অনুবাদ করে দিয়েছেন জাক্ দেক্যুর-এর চিঠি। লেখক পরিচিতিও তাঁরই লেখা। 'একসাথে' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা (১৩৮৭) থেকে লেখাটি পুনরমুদ্রিত হল। শ্রীঅমল দাশগুপ্ত তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করেছেন দুটি গল্প অনুবাদ ক'রে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাবের বিমল মিত্র, আমাদের বিমল দা, তাঁকে আমরা প্রয়োজনে বিরক্ত করতেই পারি। করেওছি। অন্যান্য অনুবাদকের নাম ক'রে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছিনা, কারণ তাঁরা আমার বন্ধু বা বন্ধু স্থানীয়। সম্পর্কটা তাই দাবী করার।

অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির-এর শ্রীনন্দদুলাল মণ্ডল-এর নাম স্বতন্ত্রভাবে করতেই হবে। তিনি নেপথ্যে থেকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছেন। আর একজন আছেন বিশেষভাবে আমাদের সঙ্গে, শ্রীকমলেশ সেন - যাঁর পরামর্শ ও সহযোগিতা বিনা এই সংকলনের কথা চিন্তা করা যায় না।
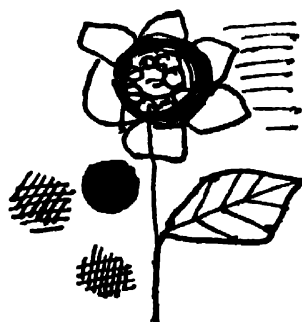
বেঁচে
থাকি
বিদ্রোহে

মৃত্যুকেও যাঁরা
পরাজিত করেছেন বিদ্রোহে
তাঁদের
স্মৃতির উদ্দেশে

জন ব্রাউন

জন ব্রাউন এখন কিংবদন্তীর পুরুষ। বহু গান নাটক ও লোক কাহিনীর এই নায়কের জন্ম কানেক্টিকাটের টরিঙটনে। পশুচারক হিসাবে শুরু হয়েছিল ছেলেবেলা, তারপর পিতার চামড়ার কারখানায় কর্মী হয়েছিলেন আর ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ সালে তাঁকে যখন জন সংঘে ফাঁসি দেওয়া হল, তিনি হলেন শহীদ—ক্রীতদাসদের হয়ে অস্ত্রধারণ করার অপরাধে তাঁর মৃত্যু ঘটল আর তাঁর মহান বীরত্ব তাঁকে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে পুণ্যঃশ্লোক করে রাখল।'

১৮৫৫ সালে কানসাস্-কে ক্রীতদাস প্রথা মুক্ত রাখার সংগ্রামে যোগ দেন জন ব্রাউনের পাঁচ পুত্র। আমেরিকায় তখন গৃহযুদ্ধ চলছে। জন ব্রাউন অস্ত্র-শস্ত্রে গাড়ী বোঝাই করে তখন হাজির হয়েছিলেন সেই সংগ্রামে সাহায্য করতে। ক্রীতদাস প্রথার সমর্থকদের ঘৃণিত কার্য-কলাপের জন্য পরের বছর জন ব্রাউন তাঁর চার পুত্রকে নিয়ে পট্টাওয়াটোমিতে হানা দিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করেন। সারা দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য, ক্রীতদাস ব্যবস্থার গুণমুগ্ধরা সন্ত্রস্ত। জন ব্রাউন এরপর অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। এই সময়েই তিনি ওয়েণ্ডেল ফিলিপস, থরো ও এমারসন-এর মতো খ্যাতনামাদের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই জন ব্রাউনের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তী অধ্যায়ে কানাডায় একটি আলোচনা সভায় সশস্ত্র উপায়ে ক্রীতদাসদের মুক্ত করার ও একটি স্বাধীন প্রদেশ গঠন করার পরিকল্পনা করেন জন ব্রাউন। ব্রাউন ও তাঁর অনুগামীরা মিসৌরিতে এগারো জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে এবং তাঁদের কানাডায় পাঠিয়ে দিতেও সক্ষম হন।

জন ব্রাউন ভার্জিনিয়ার ছোট্ট শহর 'হার্পার্স ফেরি' থেকে কিছু দূরে 'কেনেডি ফার্ম'-এ আশ্রয় নেন ১৮৫৯ সালে। হার্পার্স ফেরিতে একটি সরকারী অস্ত্রাগার ছিল কিন্তু ক্রীতদাসের সংখ্যা খুব বেশী ছিলনা। ১৬ই অক্টোবরের রাতে জন ব্রাউন একুশ জন সহযোগী নিয়ে এই অস্ত্রাগার ও ফেরি ঘাটে যাবার সাঁকোগুলি দখল করে নেন। দুদিন পরে মার্কিন নৌবাহিনীর একটি কম্পানি কর্নেল রবার্ট লী-র নেতৃত্বে পাল্টা আক্রমণ হানে। দশজন নিহত ও সাতজন গ্রেপ্তার হবার পরও জন ব্রাউন ঠাণ্ডা মাথায় মাত্র চারজন যোদ্ধা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। গ্রেপ্তার হবার পর ব্রাউনের বিচার শুরু হলে

সারা দেশ উদ্বেগ হয়ে ওঠে। ভার্জিনিয়ার গভর্নর ওয়াইজ ব্রাউনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দাবি করেও একথা স্বীকার না করে পারেন নি যে ব্রাউনের মতো সত্যবাদী, দৃঢ়চেতা এবং একনিষ্ঠ মানুষ তিনি কখনো দেখেন নি। ১৮৫৯ সালের ৩০শে অক্টোবর আদালত ঘোষণা করে, ব্রাউনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ক্রীতদাস ও অন্যান্যদের সঙ্গে চক্রান্ত করে বিদ্রোহ করার ও প্রথম ধারার হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এর দুদিন পরে চার্লস টাউনের ছোট্ট জনাকীর্ণ বিচারালয়ে রুদ্ধশ্বাস শ্রোতাদের সামনে ব্রাউন তাঁর বক্তব্য রাখেন। ব্রাউন যতক্ষণ কথা বলেন সারা আদালত কক্ষে অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করেছিল। ব্রাউনের বক্তব্য শেষ হলে বিচারক শুক্রবার দোসরা ডিসেম্বর জন সমক্ষে ব্রাউনের ফাঁসির আদেশ জারি করে। কারাগার থেকে ব্রাউন তাঁর স্ত্রীকে লেখেন, 'হার্পার ফেরির ওই দুর্ঘটনায় যা-কিছু ক্ষতি হয়েছে সব সুদে আসলে মিটিয়ে নেওয়া যাবে ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে মাত্র কয়েক মিনিট ঝুলেই। পরাজয়কেও যাতে যতখানি সম্ভব কাজে লাগানো যায় তার জন্যে কোনো চেষ্টার আমি এতটুকু কসুর করবনা।' ব্রাউনের উত্তরাঞ্চলের বন্ধুরা তাঁর পালাবার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু ব্রাউন সে কথা কানেও তুলতে রাজী হননি। তিনি বার বার বুঝিয়েছিলেন যে এই মৃত্যু তাঁর জীবন-রক্ষা পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর হবে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবার পূর্বে তিনি কারাবাস কালে চল্লিশ দিন সময় পান এবং তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। এই সময় তাঁর লেখা অজস্র চিঠি মানবিকতায়, বিশ্বাসের দৃঢ়তায় ও উচ্চারণের নির্ভীকতায় ক্রীতদাস প্রথা বিরোধী এক দলিল হিসেবে মানুষের মনে প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝড় তোলে। তিনি জীবদ্দশাতেই এক কিংবদন্তীর বীরের সম্মান লাভ করেন।

এই বৃদ্ধ বিদ্রোহী আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হবার সময় সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে বলেছিলেন, 'একজন ব্যক্তি অনেক সময় ঠিক কাজ করে এবং সরকার ভুল করে।' ব্রাউনের সেই গ্রেপ্তার দৃশ্যের কথা উল্লেখ করে থোরো লিখেছিলেন, 'আমি সেই দিনটিকে দেখতে পাচ্ছি, শিল্পীরা যেদিন ছবির বিষয় খোঁজ করতে আর রোমে যাবেন না, তাঁরা তখন এই দৃশ্যের ছবি আঁকবেন, কবিরা বাঁধবেন গান, ঐতিহাসিক নথিবদ্ধ করবেন এই ঘটনা।...তখন ক্রীতদাস ব্যবস্থার, অন্ততাপক্ষে তার এই বর্তমান রূপ নিশ্চয় লোপ পাবে। তখন আমরা ক্যাপ্টেন ব্রাউনের জন্যে কাঁদবার স্বাধীনতা পাবো। তখন, সেই তখন আমরা আমাদের প্রতিশোধ নেব, তার আগে নয়।'

'আমি, জন ব্রাউন, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ যে এই অপরাধী দেশের যত অপরাধ রক্ত ছাড়া আর কিছু দিয়েই তা ধুইয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া যাবে না। আমি এক সময় নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করেছি যে তার জন্য হয়তো খুব বেশী রক্তপাতের প্রয়োজন হবে না। এখন মনে হয় সেটা আমার ভুল বোঝা ... এমন কোন রাতের কথা আমার মনে পড়েনা যা এতই তমসাচ্ছন্ন যে রাত প্রভাতের ব্যাঘাত ঘটেছে, এমন কোন ঝড়ের কথা আমার মনে পড়ে না যা এতই প্রলয়ঙ্কর ও ভয়ঙ্কর যে উষ্ণ সূর্য কিরণ ও উজ্জ্বল আকাশের পুনরাগমনে বাধা দিয়েছে।'

মৃত্যুর দিন, পরিবারের উদ্দেশে জন ব্রাউনের এই শেষ লেখা।

১৮৫৯এর ২রা নভেম্বর আদালতে জন ব্রাউনের মর্মস্পর্শী ভাষনের অনুবাদ পেশ করা হয়েছে এখানে।

তবে আমি বলি, তাই হোক

জন ব্রাউন

আদালত হয়তো শুনে খুশী হবে যে আমার মাত্র গুটি কয়েক কথা বলবার আছে। প্রথমেই আমি বলতে চাই যে আমি সব অভিযোগ অস্বীকার করছি কিন্তু এ-কথা স্বীকার করছি যে ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য আমি পরিকল্পনা করেছিলাম। আজ নয় চিরকালই আমি একথা স্বীকার করেছি। আমি অবশ্যই আশা করেছিলাম যে ব্যাপারটা বিনা হাঙ্গামায় ঘটাতে পারব, যেমন হয়েছিল গত বছর শীতকালে। আমি তখন মিসৌরিতে গিয়ে ক্রীতদাসদের মুক্ত করেছিলাম। দু'পক্ষের কেউই একবারো বন্দুক ছোঁড়েনি। ক্রীতদাসদের দেশ পার করিয়ে শেষ পর্যন্ত কানাডায় রেখে এসেছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল এবারো সেই একই ব্যাপার করব আরো বড় আকারে। এইটুকুই ছিল আমার অভিপ্রায়। হত্যা বা ষড়যন্ত্র বা সম্পত্তি ধ্বংস করা বা ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করা বা অভ্যুত্থান ঘটাবার কোন ইচ্ছা আমার কখনোই ছিলনা।

আমার আরেকটি আপত্তি আছে। আমাকে এরকম দণ্ড ভোগ করতে হওয়াটা অন্যায়। আমি যে কথা স্বীকার করেছি যদি সেই রকম কোন হস্তক্ষেপ আমি করে থাকি এবং আমি স্বীকার করছি যে সে-কথা খুব ন্যায্য ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে (কারণ এই বিচারে যাঁরা স্বাক্ষী দিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশের সত্যবাদিতা ও আন্তরিকতার আমি প্রশংসা করছি), তাহলে কিছু বলার থাকত না। সত্যিই যদি আমি ধনী, ক্ষমতাবান, বুদ্ধিমান, তথাকথিত মহান, বা তাঁদের তরফের কোন বন্ধু, কি বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী সন্তান বা ওই শ্রেণীর যে-কোন লোকের হয়ে হস্তক্ষেপ করতাম তাহলে সেটা নিশ্চয় ভাল কাজ হত এবং এই আদালতের প্রত্যেকটি

লোক সেটাকে দণ্ডনীয় বলে মনে না করে পুরস্কারযোগ্য কাজ বলেই মনে করতেন।

এই আদালত, আমার ধারণা ঈশ্বরের আইনের বৈধতা স্বীকার করে। এখানে একটি বই চুম্বন করা হয়েছে দেখেছি, আমার মনে হয় সেটা বোধহয় বাইবেল কিংবা নিদেনপক্ষে নিউ টেস্টামেন্ট। আমি এখান থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি যে লোকে আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করবে আমিও তাদের সঙ্গে সর্বদাই সেই ব্যবহারই করব। আমি আরো শিখেছি যে, "যারা শৃঙ্খলিত, নিজেকে তাদেরই একজন হিসেবে তাদের কথা স্মরণে রেখো।" আমি এই নির্দেশ অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করেছি। আমি আপনাদের বলছি, মানুষ মাত্রেই ঈশ্বর তাকে শ্রদ্ধা করেন একথা বোঝবার মতো অত বয়স আমার এখনো হয়নি। আমার বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের ঘৃণিত দরিদ্র সন্তানদের হয়ে আমি যেভাবে হস্তক্ষেপ করেছি এবং যে কথা আমি সর্বদাই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছি, তা অন্যায় হয়নি বরং উচিত হয়েছে। এখন যদি বিচারের উদ্দেশ্যকে আরো সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আমাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, আমার রক্তকে যদি আমার সন্তানদের সঙ্গে মেশাতে হয়, মেশাতে হয় এই ক্রীতদাসের দেশের লক্ষ কোটি মানুষের রক্তের সঙ্গে যাদের সব অধিকার অস্বীকার করেছে শঠ, নিষ্ঠুর এবং অন্যায় আইনকানুন, তবে আমি বলি, তাই হোক।

আর একটা কথা বলতে চাই। বিচারের সময় আমি যে ব্যবহার পেয়েছি তাতে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে আমি যা প্রত্যাশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক সদয় ব্যবহার পেয়েছি কিন্তু তবু আমি কোন অপরাধ করেছি বলে অনুভব করছিনা। আমার কি উদ্দেশ্য ছিল ও কি ছিলনা সেকথা আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছি।

আমার সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ কিছু বিবৃতি

দিয়েছেন। সে সম্বন্ধেও একটা কথা বলার আছে। শুনতে পাচ্ছি তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন যে তাঁদের আমি আমার সঙ্গে যোগ দিতে প্রকারান্তরে বাধ্য করি। কিন্তু এর উল্টোটাই সত্যি। আমি তাঁদের আহত করার জন্যে একথা বলছিনা, তাঁদের দুর্বলতা দুঃখজনক বলেই বলছি। এদের মধ্যে একজনও নেই যে নিজের ইচ্ছা ছাড়া আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এবং বেশীর ভাগ লোকই স্বয়ং নিজের ব্যয়ভার বহন করেছে। এদের অধিকাংশকেই আমি কোনদিন দেখিনি, একটি কথা অবধি হয়নি। এরা আমার কাছে এসেছেন সেই দিনটিতে এবং সেই উদ্দেশ্যে যার কথা আমি আগেই বলেছি।

আর আমার কিছু বলার নেই।

অনুবাদ ।। সিদ্ধার্থ ঘোষ

লুসিক লিসিনোভা

লুসিক লিসিনোভার তখন উনিশ বছর বয়স, স্কুলের ছাত্রী, সেই বয়সেই তিনি ১৯১৭ সালের বিপ্লবে মস্কোর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পার্টির কাজ করেছেন। যুব শ্রমিক সংগঠনের তিনি ছিলেন একজন সংগঠিকা। এই রোগা চেহারার মেয়েটি মস্কোর অক্টোবর যুদ্ধে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয়।

প্রতিবিপ্লবী শক্তি মস্কোতে যেদিন সম্পূর্ণ পরাস্ত হল ঠিক তার আগের দিন লিসিনোভা যোদ্ধা হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। জোড়া-জোড়া বন্দুকের নলের ওপর চাপিয়ে তাঁর কফিন বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাস্তা দিয়ে।

ইউথ লীগের একজন সদস্য, এ- কোল্পাকভ ১৯১৭-র ১৫-ই নভেম্বর একটি চিঠিতে লেখেন :

'গতকাল রেড স্কোয়ারে আমরা লুসিককে কবর দিলাম। দিনটি ছিল রোদে ঝলমল, উজ্জ্বল। শব যাত্রার পুরোভাগে জেলা পার্টির সিল্কের ব্যানার পত্‌পত্‌ করে হাওয়ায় উড়ছিল। তাতে লেখা ছিল, 'দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এক হও।'

'লাল কাপড়ের টুকরোটা সগর্বে দুলছিল এদিক থেকে ওদিক। দেখে শরীরের মধ্যে শিহরণ জাগছিল। ব্যাণ্ডে মার্চের সুর বাজছিল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত লাগছিল! এই রেড গার্ডদের মধ্যে কতজন আছে যাদের লুসিক শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করেছে। এই রেডগার্ডদের একটি ইউনিট লুসিকের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল...

'মস্কোর অক্টোবর যুদ্ধে লুসিক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। হেড কোয়ার্টার থেকে খবর দেওয়া নেওয়া করা, প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট সংগঠিত করা, আঘাতপ্রাপ্ত সৈন্যদের শুশ্রূষা করা, ব্যারিকেড তৈরি, জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া, এ-সব কাজই সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করেছে। তবুও তার মনে হয়েছে এ কিছুই নয়, বোধহয় আরও কিছু করা প্রয়োজন। ও শুধু বলত, 'আমি সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গায় কাজ করতে চাই, আক্রমণের প্রথম সারিতে থাকতে চাই, জয়ের স্বাদ সবচেয়ে আগে পেতে চাই!' এই নির্ভীক মেয়েটি অস্ত্রোঝেন্‌কায় যুদ্ধরত রেডগার্ডদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব নিয়েছিল। দুবার ও এই যুদ্ধক্ষেত্রে খবর পৌঁছে দেবার পর তৃতীয় বার যাবার সময় কমরেডরা ওঁকে বার-

বার নিরস্ত করতে চেয়েছিল। বলেছিল, 'শত্রু এতদিনে তোমাকে খুব ভাল করে চিনে ফেলেছে।' কিন্তু লুসিক শোনেনি সেকথা। একেবারে যু'দ্ধর মাঝখানে যাবার জন্য লুসিক এগিয়ে গেল। সাদা সৈন্যরা কাছেই একটা বাড়িতে মেশিনগান্ নিয়ে তৈরি ছিল। লুসিককে দেখা মাত্র ওরা গুলি ছোঁড়ে। লুসিক মারা যায়। ঘটনাটা ঘটে ১লা (১৪ই) নভেম্বর ১৯১৭ সালে, বেলা ১টায়। প্রতিবিপ্লবী শক্তির পরাজয় ঘটে ও সোভিয়েত ক্ষমতা দখল করে পরের দিন ২রা (১৫ই) নভেম্বর। লুসিক লিসিনোভা যার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করল তার জয় হোল। মস্কোর মালায়া সেরপুকোভা রাস্তা, যেখানে ২৮নং ক্যান্টিনে বলশেভিকরা মিলিত হোত, সেটার নাম পাল্টে লুসিকের নামে রাখা হয়েছে—লুসিনোভস্কায়া স্ট্রীট।'

এখুনি সূর্য উঠবে

লুসিক রিসিনোভা

'এখুনি সূর্য উঠবে, কুঁড়িগুলো ফুটবে
আর শীতের শেষ সন্দেহকে
সরিয়ে দেবে যেন ঝেঁটিয়ে,
স্বয়ং জীবন।'

৯ই মে, ১৯১৭

প্রিয় আনেদ, (লুসিকের বোন)

মানসিক অবসাদ যখন নেমে আসে তখন তোমার কথা সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। এখন সেরকম একটি মুহূর্ত। তবে কি জান আমার একটি বড় সান্ত্বনা আমার কাজ। যখন দেখি আমার প্রচার একটি অচেতন মানুষকে শ্রেণী সচেতন করে তুলছে তখন আমার শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। নতুন উদ্যমে বেরিয়ে পড়ি প্রচার অভিযানে। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের সব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এনে দেয়। মনে রাখতে হবে যারা আমাদের, অর্থাৎ বলশেভিকদের পাশে নেই, তাদের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আনেদ, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কি শক্তি, কি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই শ্রমিকশ্রেণী। ভাবছ আমিও বুঝি সেইসব ভাবপ্রবণ মেয়েদের মত যারা আবেগের বশে চোখে জল নিয়ে স্বাধীনতা আর "গরীব শ্রমিকের" কথা বলে। না, সেরকম ব্যাপার নয়। আমি আমার কাজের মধ্য দিয়ে ওদের চিনেছি, জেনেছি। ওরা সেই শ্রেণীর মানুষ ভবিষ্যৎ যাদের কব্জায়, যাদের শক্তি ধীরে ধীরে জেগে ওঠার মুখে। আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি ভাল আছি। অনেক পাল্টে গেছি আমি। হয়ত আরও পরিবর্তন হবে। যাইহোক, এখন বেরোতে হবে। যদিও বাইরে হিমেল হাওয়া বইছে। জানালার বাইরে শুনতে

পাচ্ছি শিলাবৃষ্টির মাতামাতি। একটা গভীর অথচ উদ্দাম, বিষণ্ণ অথচ প্রাণোচ্ছল আওয়াজ ভেসে আসছে। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। সূর্য উঠবেই—নতুন জীবনের গান গেয়ে।

ভালবাসা সহ

লুসিক

আনেদ, মনে রেখো আমি পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছি।

২০ মে, ১৯১৭

প্রিয় গোলিয়া, (লুসিকের বোন)

যাক্ শেষ পর্যন্ত তোমার চিঠি পেলাম। এত চিন্তা হচ্ছিল যে ভাবছিলাম একটা টেলিগ্রাম করব কি না। কিন্তু মা আবার চিন্তা করবেন। যাইহোক, তোমার চিঠি পেয়ে যে কি আনন্দ হচ্ছে। এখানে একটি মেয়ে গীটাব বাজিয়ে গান করছে। ওর গলাটা সত্যিই সুন্দর। ও গাইছে "পুরনো সে দিনের কথা"। আগেব দিনগুলো মনে পড়ছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমার এখানকার জীবন নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। গতকাল রাত বাবোটার সময় দুজন কমবেড আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলে মিলে রেড স্কোয়ার তারপর চার্চ অফ দা সেভিয়ার দেখতে গেলাম। মস্কোর সে রাতে গম্ভীর ক্রেমলিন দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু কবে দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম শান্ত মস্কোভা নদী। সে এক অদ্ভুত রাত। কোদজোরির রাতের থেকেও যেন সুন্দর। এই বদ্ধ ঘবে পড়াশোনা করতে মন আব চাইছে না। বাতাসে বসন্তের আভাস পাচ্ছি। জীবনকে যেন বয়ে আনছে বসন্ত। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও কি এক দুঃখ ঘিরে বেখেছে সবকিছুকে। ভোরের আলো ফুটতে আমরা যখন সফর শেষ কবে ফিরছিলাম তখন এই দুঃখের কথা, পার্টির কাজ, সৌন্দর্য ও আরও কত কিছু নিয়ে কথা বলছিলাম। গত এক ঘণ্টা

ধরে আমার ঘরে প্রায় ১০ জন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। শুরকা গীটার বাজাচ্ছে, উলকা আর কাতউখা গান করছে। ভেরা ক্রমাগত তর্ক করে চলেছে। রুবেল ওর চুল ধরে টানছে, সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ছে ওদের কাণ্ড কারখানা দেখে। আমি বিছানার ওপর বসে তোমাকে চিঠি লিখছি।

এ রাতটা এমন অদ্ভুত যে মনে হচ্ছে মরে যাই। আমাদের সবাই কাল জারিতসিনো চলে যাচ্ছে। আমার ছোট্ট ছেলেটার* কথা যে কি ভীষণ মনে পড়ে কি বলব। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমি ওকে আন্তর্জাতিক গাইতে শিখিয়ে দেবো। ওকে একটা পাকা বলশেভিক করে তুলব। সকলকে আমার অফুরন্ত ভালবাসা দিও।

তোমার লুসিক

*লুসিকের বোনের ছেলে।

আমার মিষ্টি আনেদ,

এমন বসন্ত আর কখনও আসেনি আমার জীবনে। পুরনো সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলে এ যেন এক নতুন দিন নিয়ে আসবে। অন্ধকারকে ভেঙে খান্ খান্ করে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। আমার অনুভূতি তোমাকে হয়ত ঠিক বোঝাতে পারব না। এই মোহময় বসন্ত আমার জীবনে এক অদ্ভুত উষ্ণতা এনে দিয়েছে। মনে হচ্ছে বসন্তের মত আমার জন্যেও যেন এক বৃহৎ, মহৎ কিছু অপেক্ষা করে আছে। আনেদ, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, যা কিছু অনিশ্চিত দোদুল্যমান তাকে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলা। আমার নিজের মধ্যে এক শক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছি। এ শুধু আমার একার নয়। সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আছে এই একই ক্ষমতা। ওরাও নতুন দিন গড়ার কাজে ব্যস্ত। জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত সব কিছুকে নিজের করে নিতে চাই। আগের মত শুধু আবেগসর্বস্ব নেই

আমি। এখন সমস্ত কিছু নিরপেক্ষ মন নিয়ে নিরীক্ষণ করি, যাচাই করি। তার পর গ্রহণ করি। জান, একটা ব্যাপার আমাকে প্রায়ই চিন্তিত করে। অনেক কিছু এমন অজানা অচেনা থেকে যায় কেন? কিছু কিছু জিনিস এমন রহস্যের আবরণে ঢাকা কেন? গত কয়েকদিন ধরে প্রকৃতির সঙ্গে এক অদ্ভুত একাত্মতা বোধ করছি। মনে হচ্ছে প্রতিটি ধূলিকণার অন্তঃস্থল পর্যন্ত যেন দেখতে পারছি। তবুও রহস্যের যেন সীমা নেই। সব কিছুর হদিশ পাচ্ছি না।

আমাদের প্রতি শ্রমিকদের ব্যবহার আমাকে নতুন করে উৎসাহ দিচ্ছে। "বিপ্লবী" ছাত্র ও শ্রমিক যারা আগে আমাদের কাজে সঙ্গ দিচ্ছিল না তারা সকলে এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে আমাদের পথ সঠিক। আমাদের বন্ধুত্ব অনেক গভীর অনেক দৃঢ় হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যেবেলা এক মহিলা শ্রমিক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। কত কিছু নিয়ে যে কথা হল আমাদের। এ ধরনের সাক্ষাৎ সব সময় এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

বাড়িতে লেখা চিঠি

বিপ্লবী বাহিনী বর্তমানে পেত্রোগ্রাদের কাছে করনিলভের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করছে। মস্কোর বিপ্লবী বাহিনীকে তাদের সাহায্যে পাঠানো হয়েছে। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। কিছুতেই ঘুম আসছেনা। শ্রমিকদের সকলকে সতর্ক করা হয়েছে। ওরা শহরে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে সব জায়গায় ব্যারিকেডের সামনে লড়াই করতে প্রস্তুত। হাতিয়ার যা লুকানো ছিল সবই এখন খোলাখুলি ভাবে দেওয়া নেওয়া হচ্ছে। আমার জানলার ঠিক নীচ দিয়ে একটার পর একটা বিপ্লবী

ইউনিট্ বিপ্লবের গান গাইতে গাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছে। ওরা হল অজেয় শক্তির অধিকারী। প্রকৃত বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

ভালবাসা নিও

লুসিক

(প্রতিবিপ্লবী জেনারেল কোরনিলভ যখন পেত্রোগ্রাদে সৈন্য সমাবেশ করেন, মস্কো ও পেত্রোগ্রাদের শ্রমিকরা এগিয়ে আসেন শহর রক্ষার জন্য। বলশেভিকদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় রেডগার্ডদের ইউনিট। সেই সময়ে এই চিঠিটি লেখা)

৩০ আগষ্ট, ১৯১৭

আমার প্রিয় আনিক্, (ছোট বোন)

আমি এখন যাচ্ছি। লিলি ব্রাউনের 'নারী প্রসঙ্গে' বইটা পড়ছিলাম। খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। কিন্তু তেমন টানেনি আমাকে। যদি কখনো সুযোগ পাও তাহলে কোল্লোসতাই-এর লেখা 'নারী প্রশ্ন—সামাজিক ভিত্তি' বইটি অবশ্যই পোড়ো। আমি যখন প্রথম বইটি পড়ি আমার খুব ভাল লেগেছিল। এক অদ্ভুত নিশ্চিন্ততা এনে দিয়েছিল। আমাদের চেতনা সত্যিই বিপ্লবী। লাল সৈন্য তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন। তার শিক্ষণের একাংশ হচ্ছে এই ক্যান্টিনের ভেতরে।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭

প্রিয় মা,

তুমি যদি জানতে তোমার কথা কী ভীষণ মনে পড়ে! এই মুহূর্তে তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে করছে। কেমন আছ জানিও। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম থিয়েটারের উদ্বোধনের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আশানুরূপ হয়নি ঠিকই কিন্তু অফুরন্ত আনন্দ পেয়েছি। আমাদের দলের সবাই ছিলাম। আমরা একটা মিছিলও বের করেছিলাম। অর্কেস্ট্রায় যখন আন্তর্জাতিক গানটা হচ্ছিল

তখন সবাই মিলে চিৎকার করে বলে উঠেছিলাম, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক দীর্ঘজীবী হোক', 'যুদ্ধ নিপাত যাক'। উপস্থিত সকলের খুব ভাল লেগেছিল। এখন এ পর্যন্তই থাক।

অনেক আদর নিও

তোমার লুসিক্

১৩-২৪ অক্টোবর, ১৯১৭

আমার প্রিয় আনিক্,

গত দু'দিন হল একটু ভাল বোধ করছি। আমি খুব খুশী মনে আছি। জীবনের সব কিছু আমাকে আনন্দ দেয়। আমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। ওরা সকলেই এত ব্যস্ত অথচ একটা সময়ও যায়নি যখন আমি একা পড়ে থেকেছি। প্রায় প্রতিদিনই ওরা কোকো, রুটি, কফি, মাখন, চীজ, এমন কি রাতের খাবার পর্যন্ত এনেছে আমার জন্য। মাঝে মাঝে এত অস্বস্তি লাগত। ডাক্তার যখন বললেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ তখন আমাকে পায় কে! বসন্তের হাওয়া এসে ছুঁয়ে যাচ্ছিল আমাকে। গাছের সোনালী পাতা, পেঁজা তুলোর মত বরফ, সূর্যের উষ্ণ আলো—সব কিছু এত সুন্দর। মনে হচ্ছে ওরা সবাই জানতে পেরেছে আমি এখন সুস্থ।

হুর্‌রে! সোভিয়েতরা বোধহয় কালই পেত্রোগ্রাদ দখল করবে ......জানি আজ না হয় কাল এক ভয়ঙ্কর রক্ত বন্যা বয়ে যাবে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে বুর্জোয়াশ্রেণী কখনই শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়না। সুতরাং যুদ্ধ প্রোলেতারিয় বিপ্লবের এক অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। এইভাবে বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক বিপ্লব একদিন সংঘটিত হবে।

বোঝাতে পারব না কি ভীষণ ভাল লাগছে এসব ভাবতে। জয়ের আনন্দে আমি বিভোর। তুমি তো জান অনেক দুঃখ, অনেক ভয়ঙ্কর সময় সামনে রয়েছে কিন্তু তবুও সেটা অদ্ভুত সুন্দর।

আমাদের জীবনই যে এরকম। এখানে আমরা সবাই একই সূত্রে বাঁধা, একই ভবিষ্যতের চিন্তায় মশগুল।

তোমার লুসিক

মিষ্টি আনিক্,

তোমার মানসিক অশান্তির ব্যাপারটা আমি বুঝি। আমিও গত কয়েক মাস আগে তোমার মতোই মানসিক অবস্থার কবলে পড়েছিলাম। কিন্তু সেটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠেছি। বোধহয় চিরকালের জন্যেই। আনিক্, তোমাকে একটা কথা বলি। আমার কি মনে হয় জান, এই দুঃখের প্রয়োজন আছে, 'সব কিছুর জন্য এই দুঃখ' সমস্ত সৎ মানুষের, সমস্ত সৎ যোদ্ধার এক বিশ্বাসী বন্ধু। সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন যারা দেখে তাদেরই এই দুঃখের প্রয়োজন আছে। যেদিন থেকে আমি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি সেদিন থেকেই আমার মানসিকতাব পরির্বতন ঘটেছে। আমি এই "বেনামী" দুঃখকে হারিয়েছি। আমার কথা একটু বলি। ইলেকশানের জন্য ট্রেনিং শেষ করে এখন একটা চাকরি করছি। দিনে পাঁচ ঘণ্টা কাজ করি কমিসারিয়েতে। সবচেয়ে আনন্দের কথা সন্ধ্যেগুলো আমি মুক্ত, বই পড়ব, স্টাডি ক্লাস নিতে পারব আরও কত কিছু যা আমি করতে চাই। আমি ভাল আছি। শুরকা আর আমি কাল পড়তে পড়তে তুর্গেনিভের 'শালিক পাখি' বলে একটা গদ্য কবিতা পড়লাম (অবশ্যই পড়বে)। মনে হল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া যেন সমস্ত দেহ মন ভরিয়ে তুলল। তুমি একটুও মন খারাপ করো না। তোমার যৌবন তোমাকে বাঁচার শক্তি যোগাবে।

ভালবাসা সহ

লুসিক্

মাকে লেখা চিঠি

অবশেষে ঘরে ফিরেছি। আজ সারদিন শুধু ঘুরে বেড়িয়েছি। একটু পরেই ঘুমোতে যাব। এখন অনেক রাত। বাইরে বরফ

পড়ছে। আমার খুব ভাল লাগছে। আমার একটা খারাপ ব্যাপার হচ্ছে আমি বড় বেশী আশাবাদী, নার্ভের ওপর বড় বেশী চাপ পড়ে।

ক্রেমলিনে আমাদের সৈন্যরা সব তৈরী। আজ রাতেই হয়ত যুদ্ধ হবে। কারা জয়ী হবে কে জানে।

মা, আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি খুব সাবধানে থাকব। কোন বিপজ্জনক জায়গায় থাকব না। আমি হয় হাসপাতালে তা না হলে সোভিয়েতে কাজ করব। লড়াই এর ইউনিটে তো একবারেই থাকব না। আমি রাস্তায় অহেতুক বেরোই না সুতরাং চিন্তার কোন কারণ নেই। এখন কারখানার কোনো মিটিঙয়ে পর্যন্ত আর যাব না। কারণ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আমার শরীর এখন ভাল আছে। আজ এ পর্যন্ত থাক। অনেক আদর নিও। এখন আবার কিছু কাজ করতে হবে। তারপর সোজা বিছানায়।

তোমার লুসিক

আমার কথা ভেবে মন খারাপ করো না।

(মস্কোয় অক্টোবর যুদ্ধ চলার সময় চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন কিন্তু চিঠি পোস্ট করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়)

অনুবাদ ।। মালা ভট্টাচার্য

উল্লুবি বুইনাক্স্কি

উল্লুবি বুইনাক্স্কি পনের বছর বয়সে এক মার্ক্সবাদী দলে যোগ দেন। মহান অক্টোবর বিপ্লব ও পরে গৃহযুদ্ধের সময় এই নবীন কমিউনিস্ট ককেশাসের দাঘেস্তানে পার্টি সংগঠনের এক স্বীকৃত নেতা হয়ে ওঠেন। সে সময় সোভিয়েত রাশিয়া তার চারদিকেই সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী ও বিদেশী হস্তক্ষেপকারীর দল তখন দাঘেস্তানে সক্রিয়। ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে তিনি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির গোপন আঞ্চলিক কমিটি ও দাঘেস্তানের সামরিক কাউন্সিল তৈরি করেন। এর থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আট হাজার সৈন্যের এক গোপন শক্তিশালী বিদ্রোহী লাল ফৌজ এবং প্রতি-বিপ্লবী সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য তৈরি করা হয় একটি পরিকল্পনা। কিন্তু একটি গুপ্তচর বলশেভিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বুইনাক্স্কি ও তাঁর পরিচালিত দাঘেস্তান আঞ্চলিক কমিটির প্রতিটি সভ্যকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লুবি বুইনাক্স্কি এক প্রতিবিপ্লবী সৈন্যের গুলিতে প্রাণ হারান। তাঁর বয়স তখন তিরিশও হয়নি।

বুইনাক্স্কির প্রিয়তমা তাতু বুলাচ ছিলেন 'ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ' ও দাঘেস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্য। ১৯২০ সালে তিনি বাকুর ইস্টার্ণ ইউথ লীগের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

আমার তৃতীয় সূর্য তাতু

উল্লুবি বুইনাকৃস্কি

'আমার হয়তো প্রাণদণ্ড হবে
কিন্তু আমি ভীত নই।
আমি তোমাকে ভালবাসি।'

১৯১৯

আমার প্রিয় কমরেড তাতু,

…আমাদের এই ঈশ্বরের কৃপাধন্য 'রাষ্ট্রে' সব কিছু যে ঠিকঠাক চলছে না সেটা সবাই জানে। বাইরে নানা রকম উড়ো খবর আর কথা শোনা যাচ্ছে……এ বিষয়ে তুমি কি ভাবছ তা জানতে বেশ কৌতূহল হচ্ছে। সত্যিই আমাকে সামলানো মুশকিল। একটা কিছু করতে শুরু করলে তখন সেটা ছাড়া আর অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করা বা কাজ করা আমার স্বভাবে নেই। আমাদের সংগ্রাম শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সারা দুনিয়া এই আগুনের আঁচ পাচ্ছে। এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে এই আগুনের তাপ পোঁছয়নি।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমি উৎসুক হয়ে আছি জানার জন্য যে, যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, না তার থেকেও বড় কিছু—তার হৃৎস্পন্দন কি আমার হৃৎস্পন্দনের তালে তালে স্পন্দিত হচ্ছে! যদি সম্ভব হয় তবে তোমার চিন্তা ভাবনা, আশা অনুভূতি, যা কিছু তোমাকে উৎসাহ দেয় তোমার মনকে আঁকড়ে ধরে রাখে, তা এক কলম লিখে জানিও।

উল্লুবি

…তুমি কাজ শুরু করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছ শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে! এটা সত্যিই আনন্দের কথা।

……শুরাতে থাকার সময় যদি কিছু কাজ করতে সফল হয়ে থাক তবে এগিয়ে যাও। কিন্তু মনে রেখো আমরা বলশেভিকরা প্রতিবিপ্লবীদের কাছে কোনো কিছু চাই না। ওদের আমরা নিজেদের ইচ্ছে মত চালিয়ে নিই'। চালাকি যদি ঠিকমত করা যায় তবে তা গ্রহণযোগ্য। আরও ভাল হবে যদি তুমি ওদের সম্পর্কে কিছু জানতে পার।

কাজের ব্যাপারে বলি, এর থেকে ভাল অবস্থা আর কিছু হতে পারে না। তোমার পবিত্র আগুনের মত যৌবন, স্বয়ংসিদ্ধ। একে বেঁধে রাখতে পারে এমন শক্তি কোথাও নেই। কারণ তোমার যৌবন বাধা বিপত্তি সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যাবার শক্তি ধরে। তুমি এখন পাকা বলশেভিক হতে চলেছ। তাব আর বেশী দেরি নেই। কিন্তু প্রিয়তমা, তুমি হয় পথ সম্বন্ধে ভুল করছ, তা না হলে গুলিয়ে ফেলছ। প্রথমটা হলেই ভাল। আমার তো মনে হয় যে তুমি একসময় পাকা বলশেভিক ছিলে। এখন—এ কী ভয়ঙ্কর কথা! কী অভাবনীয়— তুমি শুধু শুধু নিজেকে অপবাদ দিচ্ছ। সুতরাং আর একটি পদক্ষেপ দরকার। ব্যাস, তাহলেই তুমি আমাদের। তুমি যে কাজ করছ তা করা উচিত, তা আমাদের বলতে পার এবং তা প্রয়োজনীয়। এই মুহূর্তে যে-যৌবন শান্ত তা কোন যৌবনই নয়, তা বার্ধক্যেরই সমান। যদি কোন সন্দেহ থাকে, যদি কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করে কালো মেঘটাকে সরিয়ে দেব। তুমি আমাদের কাজে অংশ নাও। অন্ততঃ একজন আন্দোলনকারী হিসেবেই শুরু কর। তুমি হবে আমাদের প্রথম পাহাড়ী মহিলা আন্দোলনকারী। তোমাকে অবশ্যই পরিষ্কার লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। আর চাই সাহস, অফুরন্ত সাহস……..

তুমিই তোমার ভাগ্য নিয়ন্তা। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা পবিত্র উজ্জ্বল। আর তা তোমাকে কোন ভাবেই কোন ঋণের বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলবে না। তোমাকে চিঠি লিখছি আর এক

কমরেডের সঙ্গে অন্য এক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি। চিঠির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কি করব উপায় নেই। সারা দিনে নিজের সময় বলতে এক মুহূর্তও পাইনি। সব কিছু তোমার ও'পর নির্ভর করছে, আমার প্রিয় তাতু। আগের চিঠিতেও বলেছি, এখনও বলছি, তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তোমার পবিত্র বিবেক যা বলতে চায় তাই লিখতে পার। তুমি নিশ্চয় বুঝবে আমার চোখে তুমি কত বড়। তুমি যদি চাও, আমার ভালোবাসাকে গোপন করতে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করব। তুমি তো জান আমার ইচ্ছা-শক্তি অপরিসীম। তোমার প্রতি আমার বাহ্যিক ভালবাসা এবং গভীর শ্রদ্ধাটুকু থাকবে। আমার দিক থেকে এ ব্যাপারে কখনোই এতটুকু ইঙ্গিত থাকবে না যাতে তুমি অসুবিধায় পড়ো। আমার প্রতিবাদ কখনোই তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলবে না, প্রিয়তমা তাতু।

যাই হোক, এ কথা বলতেই হবে যে আমার এই এতদিনকার জীবনে তুলনামূলক বিচারে আমি হয়তো বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি কিন্তু তা বলে কখনোই ভালবাসায় পড়ার বা এই ধরনের কিছু নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করার সময় পাইনি। সে সময় ছিলনা এবং সেরকম কোন সুযোগ এলেও সব সময়েই এড়িয়ে গেছি, আগেভাগেই ঘোষণা করে দিয়েছি যে এসব ব্যাপার আমার জন্য নয়। সত্যি কথা বলতে এর জন্যে কয়েক জন সত্যিকার ভাল মানুষও আহত হয়েছেন।

দাঘেস্তানে আমার কাজ শীগগিরই শেষ হবে এবং আমি আবার পাখীর মতো মুক্ত হব। পৃথিবীটা বিশাল এবং যার জন্য আমি এত চেষ্টা করেছি সেটা এক দিক থেকে সত্যি হয়ে উঠছে—রাজনীতিতে আমাদের জয় হবেই এবং হয়তো অন্যান্য বিষয়েও আমি কৃপাধন্য হব। ব্যক্তিগত সুখকে আমি কোনদিন আমার লক্ষ্য বলে স্থির করিনি, ভাগ্য যদি স্থির করে এর কোন প্রয়োজন নেই তবে তাই হোক। তাতু, তুমি প্রায়ই বলো তোমার দেশের মানুষকে তুমি

কতখানি ভালবাস। আমি মনে করিনা একথা বলার মানে হচ্ছে তুমি অন্য দেশের মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নও। খেয়াল করে দেখো একথা আমি সব সময়েই বলেছি।

আমার মিষ্টি মেয়ে তাতু, বিশ্বাস করো এমন একটা সময় ছিল যখন আমার দেশের লোকেদের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আমাকে রাতের পর রাত ঘুমোতে দেয়নি। প্রথমতঃ, একথা আমি বলতে পারি যে আমার দেশের মানুষের প্রতি আমার এই ভালবাসা কতটা খাঁটি তা কথায় প্রকাশ করা যাবে না, আর দ্বিতীয়তঃ, এই ভালবাসা খুব অদ্ভুত কারণ এই ভালবাসা আমার দেশের মানুষদের যারা প্রতিবেশী তাদের ক্ষতি তো করেই না, বরং উপকারেই লাগে। আমার বিশ্বাস, আমি নিশ্চিত এবং এ ছাড়া অন্যভাবে আমি ভাবতেও পারিনা যে তুমিও নিশ্চয় তোমার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে নও। আমি আরো স্পষ্ট করে বলছি যে এই গ্রীষ্মকালের পর আমি হয়তো আর দীর্ঘকাল দাঘেস্তানে আসব না। সংগ্রাম শেষ হবার পর, তোমার উত্তর পাবার পর আমার আর কোন বন্ধন থাকবেনা। এখানে আমার কোন পিছুটান নেই—পরিবার না, বন্ধু না, কিছুই না। আমি এক নিঃসঙ্গ শিকারী যার না আছে ঘর না আছে আস্তানা। এমন একজন বন্ধু থাকা দারুণ ব্যাপার যার কাছে তুমি তোমার সব দুশ্চিন্তা, গোপন কথা, তোমার মনের মধ্যে যা কিছু আছে—কিচ্ছু চেপে না রেখে সব সঁপে দিতে পাবো। আমার তেমন কোন বন্ধু নেই।

জানো তাতু, আমার প্রিয়তমা তাতু, আমি যখন হাসি বা কারুর সঙ্গে গম্ভীর ভাবে কথা বলি তারও মধ্যে কখনো কখনো নিঃসঙ্গতা ও বেদনা আমায় এমন ভাবে পীড়িত করে যে খুশী হওয়া আদৌ আমার পক্ষে সম্ভব কিনা জানিনা। তার মানে আমার অনন্য তাতু, এক কথায় 'আমি' হচ্ছি 'আমি' এবং এই হচ্ছে অ-স্থ। এখন আমায় স্বীকার করো বা বরবাদ করো, যা তোমার ইচ্ছে।

আমাকে যদি আরেকটা আঘাত পেতে হয়, সেটাও আমি গোপন করতে পারব—

প্রিয়তমা তাতু,

পরিস্থিতির কি অভাবনীয় পরিবর্তন। হ্যাঁ, এখন যে কোন কিছুই ঘটা সম্ভব। চমৎকার গন্ধে ভরপুর আমার 'পাথুরে খুপরী'-টার মধ্যে বসে তোমাকে লিখছি।

চিঠিব মাধ্যমে তোমাকে আমাব অন্তরের আকুলতাগুলোর কথা জানানোর সুযোগ পাবার আগেই আচমকা এই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল, এখন বসন্ত কাল, সব কিছুই প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে। এখন পূর্ণ গতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ···অথচ ঠিক সেই সময়েই আমি নিঃসঙ্গ কারাবাস করছি। এখানে সূর্য নেই······বাতাসেব স্পর্শও কদাচিৎ মেলে।

তুমি কেমন আছ? আমার আদরের মিষ্টি-মেয়ে তাতু, এ কথা সত্যি যে কোন কিছুরই সবটুকু খারাপ নয়। দীর্ঘকাল যাবৎ পড়াশোনা করার সুযোগ মেলেনি আমার, আর এখন, আমার এই নিঃসঙ্গ অবসবে আমি আমার সব সময়টুকু পড়াশোনা করেই কাটাচ্ছি।

তোমার উল্লুবি

পুঃ—'যদি আমাকে মরতেই হয় তবে আমি চিৎকার করে বলবো ·····সোভিয়েত শক্তি দীর্ঘজীবী হোক আর দীর্ঘজীবী হোক আমার অবাক-করা সূর্য · তাতু।'

প্রিয়তমা তাতু,

আমার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে আমি যতখানি সম্ভব ভাল কাজে লাগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কেউই বলতে পারবে না,

বলতে অন্তত স্পর্ধা করবে না যে আমি অসৎ ছিলাম, কিংবা তারা আমাকে কোন রকম দোষারোপ করতেও সাহস পাবে না। এটাই যথেষ্ট। কি চেয়েছিলাম আমি জীবনে? বিশ্বাস করো, সুখ কাকে বলে আমি জানতাম না। এমন কি একটা শিশুও যা বোঝে তাও না। আর এখন, জীবনের শেষের দিকে দেখতে পাচ্ছি আমি যেন আমার সূর্যের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছি, স্বচ্ছ নীল আকাশ আমার দিকে তাকিয়ে যেন মৃদু মৃদু হাসছে। আর সে নির্মল হাসি তোমার, তোমারই তাতু! কী সুন্দর করেই না তুমি আমার চিঠির উত্তর দিয়েছ ......'কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি'। যা আমি চেয়েছি এতদিন তার সবটুকুই এর মধ্যে মুখর হয়ে আছে। এরপর থেকে আমি খুবই খুশী ছিলাম। কিন্তু বিচ্ছেদ, চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ তোমাকে আমাকে অতি দ্রুত গ্রাস করে ফেলেছে। কেন, কেন এমন হল তাতু? এমন তো হবার কথা ছিলনা।

চিরদিন তুমি যেমন নির্ভীক আর উদ্যমী ঠিক তেমনই থেকো। একথাই ভেব, তুমি তরুণ, জীবনও তরুণ এবং পৃথিবীর লড়াই এখন তুঙ্গে। আর একথা কখনো ভুলনা তাতু, সমুদ্র উপকূলে আমিই একমাত্র নুড়ি নই। দৃঢ় হও। মাথা উঁচু রেখে এগিয়ে যাও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। যদি তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে আমার জন্যে একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেলনা—এমন সুযোগটুকুও দিও না যাতে আমাদের শত্রুরা আমাদের উপহাস করার স্পর্ধা পায়। যদি তুমি তোমার অনুভব আর চিন্তা নিয়ে আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে চোখে জল এননা তাতু—কোন শত্রুর কাছেই তোমার দুর্বলতা যেন ধরা না পড়ে। বরং তোমার চোখের তারায় ঝলসে ওঠে যেন সেই ক্রোধের আগুন যে আগুনের ঝলসানির মুখে পড়ে তারা অপরাধীর মতো কুঁকড়ে যাবে।*

উকিল বলেছেন সরকারের অনুকম্পা পাবার ইচ্ছে থাকলে আমি আবেদন করতে পারি। প্রিয়তমা তাতুশা, তুমি কি কল্পনা করতে

পার সরকারের অনুকম্পা পাবার জন্যে তোমার উল্লুবি ক্ষমা প্রার্থনা করছে? কক্ষণো না। আর সেই জন্যেই, প্রিয়তমা আমার, আগামী দিনের দিকে তাকাও, বেঁচে থাক তুমি আমাদের দেশের অবহেলিত মানুষের মঙ্গলের মুখ চেয়ে। কখনো যেন বোকার মতো কোন কিছু করে বসো না।

বিদায়, বিদায় আমার তাতুশা, যতখানি দূরে আছি ঠিক ততখানিই কাছ থেকে তোমাকে আমার আদর জানাচ্ছি……

জীবনের চলার পথ খুশী মতো বেছে নেব
প্রাণ যা চায় তাই করে যাব চিরদিন
অবশ্যই এ এক মহান অনুভব… ..
তবু…ফল মেলে সামান্যই……

যে পথকে বেছে নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি, আমার তাতু… প্রিয়তমা তাতুশা, সেই পথকেই তুমি ভালবেস।

তোমার উল্লুবি

…আর, যদি তুমি ভালবাস
তবে, তোমার সবটুকু উজাড় করেই ভালবাস

এ কথা কি সত্যি তাতু? এ কি তাই যা সত্যি হওয়া উচিত? আমি কিন্তু মনে করি আমাদের কালে এর প্রয়োজনীয়তা পালটে গেছে……। আমার কি এই প্রাচুর্যের গর্ব করার অধিকার আছে যা দিয়ে আমি বলতে পারি আমি সব কিছুই করতে পারি, এমন কি যা আমার বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত, তাও? না!

অত্যন্ত নিশ্চিত হয়ে একথা বলছি যে, ভালবাসা, তা সে যতই সর্বগ্রাসী হোক তাকে আমার চিন্তার অনুগামী হতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে আমার উচিত, হয় তাকে আমার হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলা আর নয়তো মৃত্যু বরণ করা। একথা পড়তে পড়তে তুমি

হয়তো মুচকে হাসবে, বলবে, 'বুঝেছি ! সাহসী হবার চেষ্টা করছ, অর্থাৎ বাছা আমার, একটা কিছু গড়বড় হয়ে আছে।' আমি জানিনা তোমার এ ভাবনা সঠিক না ভ্রান্ত। তবে একথা তোমাকে বুঝতেই হবে যে দুজন প্রেমিকের মধ্যে একজনের অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে অন্য জনের প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া উচিত। সময় মতো তারা অবশ্য নিজেদের ভূমিকা বদল করে নিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ সমান ব্যক্তিত্ব নিয়ে দু'জনে পাশাপাশি বাস করা একেবারেই অসম্ভব। আর তুমি তোমার ভালবাসার মানুষের অধীনতা মেনে নিয়ে চলবে এটা এমন কি সাংঘাতিক ব্যাপার? তবে এটা তখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে যখন তুমি একজনের দৃষ্টিভঙ্গির শরিক হতে পার এবং তাকে বুঝতে পার।

বেঁচে থাকার অর্থ নিহিত আছে মানবজাতির কল্যাণের মধ্যে। অবস্থা যদি তেমন হয় তবে কর্কশতা ক্রমশ মিলিয়ে আসবে ও এই সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি ঘটবে। আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে তুমি আমার সঙ্গে একমত। অর্থাৎ, এটাও একটা রণকৌশল। প্রথমে কি করা উচিত পরে কি করা উচিত এবং এখন কি করা উচিত বলে তুমি মনে করছ? এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? কোন পথকে বেছে নেওয়া তুমি কাম্য বলে মনে করো?—সবই অবশ্য'সর্ব সাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কি ভাবছ? তাতু, আমরা যে সময়ে বাস করছি তাতে একজনের ব্যক্তিগত জীবন কোন কোন সময় সমষ্টির স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হওয়া অবশ্যই উচিত তবু কেউই নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করে দিতে পারে না, আর তার কোন প্রয়োজনও নেই। কারণ, আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোয় যদি খুশী হতে না পারি তবে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য যে লড়াই আমার করা উচিত আমি তা কখনই করতে পারবো না। ব্যক্তি জীবনের এই পরিপূর্ণতা এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য সংগ্রাম, এই দুইই পরস্পরের

সঙ্গে যেন একই সুরের মতো মিশে যায়, মিশে যায় গঠনমূলক ভাবে।

দীর্ঘপত্র লেখা আমার ধাতে নেই কিন্তু এখন দেখছি তোমার সঙ্গে শুধু কথার পর কথা বলে যেতে ইচ্ছে করছে। কি করা উচিত বলতো ? আজকাল যেন নিজেকে আমি চিনতে পরি না। ভাবনার অতলে তলিয়ে গিয়ে দেখি সেখানে শুধু মাত্র তুমিই আছ। তোমার ভাবনাতেই আমি আচ্ছন্ন হয়ে আছি তাতু। মৃত্যুর কথা আদৌ আমি ভাবছি না…… ..যদি তুমি জান এমন একজন কেউ তোমার জীবনে আছে যে তোমার অত্যন্ত আদরের, অত্যন্ত ভালবাসার মানুষ, তাহলে মৃত্যু বরণ করাটা এমন কিছু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার নয় কিন্তু তা যদি না হত তাহলে আমার হৃদয়টা একেবারে শূন্য থেকে যেত।

খারকভ পুনর্দখল করা হয়েছে। ইয়েকাতারিনগ্লাভ দখলের জন্য লাল ফৌজ লড়াই করে চলেছে। আশাখাবাদের পতন হয়েছে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী ক্রাস্নোভড্‌কস্‌-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। কলচ্যাক বাহিনীকে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে। বিশৃঙ্খল অবস্থায় তারা পশ্চাৎ অপসরণ করছে। গুজব শোনা যাচ্ছে কলচ্যাক নাকি ধরা পড়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে। আমাদের সৈন্য বাহিনী এখন ম্লাতোসের সীমান্ত অঞ্চলে এসে আস্তানা গেড়েছে। এই বিপ্লবী সংগ্রামকে মদত জুগিয়ে চলেছে ইটালী আর ফ্রান্স। ....আমাদের রাশিয়ানদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ইংরেজ শ্রমিকরাও বেরিয়ে পড়েছে। এত সবের পরেও কি আমি খুশী না হয়ে পারি ?

ওগো আমার প্রিয়তমা তাতু, এক মাত্র তুমিই জান স্বাধীনতা পাবার জন্যে আর কাজ করার জন্যে কি অদম্য বাসনা আমার, শুধু কাজ আর কাজ। ঠিক এই সময়ই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এত দূরে, সব কিছু থেকে দূরে সরে থাকাটা কি নিদারুণ কষ্টকর

ব্যাপার। কিন্তু ঐ অবস্থা বরাবর চলতে পারেনা তাতু···হয় সব কিছু পাব·· নয় তো একেবারে কিছুই পাব না। এই পাথুরে খুপরি থেকে পালাবার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করছি। ইতিমধ্যে আমরা বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে ফেলেছি, আমাদের সেলের জন্য বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সেইটেই হয়েছে সব চেয়ে বড় বিপত্তি।

আমার এই বন্দীত্বটুকু ছাড়া আমি এখন নিজেকে মনে করি এই দুনিয়ার সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। তিনটি সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিতে আমি উত্তপ্ত হয়ে আছি···প্রথম, যে সূর্যকে আমরা সবাই মিলে ভাগ করে উপভোগ করি, দ্বিতীয় সূর্যটি হল আমাদের সোভিয়েত শক্তি, আর শেষেরটি···তোমার প্রদীপ্ত ভালবাসার আলোকছটা···কারণ তুমিই আমার সেই তৃতীয় সূর্য।

যেদিন আমি মস্কো ছেড়ে চলে আসি তুমি আর তোমার মা আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলে। সেদিনকার কথা তোমার মনে আছে কি তাতু? যখন আমি তোমাদের ছেড়ে চলে আসি তোমার চিন্তায় আমার মনটা ভার ছিল। মস্কো থাকার সময়ে এমন একটিও দিন ছিলনা যেদিন আমার হৃদয় তোমার চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকেনি। আমার কাছে তুমি ছিলে সুন্দরী, মিষ্টি মেয়ে (মনে হয় সেটা ছিল '১৫ সাল)। তারপর বিপ্লবের শুরুতে যখন আমি তোমাদের বাড়িতে থাকতাম তোমার মনে আছে কি সোনা, গরম কালটাকে আমি কী ভীষণ পছন্দ করতাম? আর তার ফল কি হল, না মস্কোর প্রচণ্ড ঠাণ্ডার শিকার হতে হল আমাকে! মনে আছে, সে সময় সর্বদাই আমি নিজের সমালোচনা করতাম। সব দিক থেকে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতাম এবং শেষ পর্যন্ত এই বিপর্যয়কর সিদ্ধান্তে এসে পৌছতাম যে আমি এমন একজন মানুষ নই যে তোমাকে সত্যিই সুখী করতে পারে· ·এন.-এর সঙ্গে সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমার যে আলোচনা হয়েছিল সে কথাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। নামোল্লেখ

না করেই বলছি···প্রেম, ভালবাসা নিয়ে আমরা যখন কথাবার্তা বলতাম, আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমি তখন বলতাম যে, যদি আমি দেখি নিজেকে আমি সুখী করতে অসমর্থ এবং আমার ভালবাসার মানুষটিকেও আমি কোন রকম ভাবে সুখী করতে পারছি না তবে সে সম্পর্ক আমি ত্যাগ করবো। কর্তব্যপরায়ণতার কথা সব সময়ই ভেবেছি। এরপরেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি হল : আমাদের মধ্যে কখনোই সেই সমতা ছিলনা। সব সময়ই, যে ভাবেই হোক ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যেন আমি তোমার শিক্ষক আর তুমি আমার ছাত্রী। আর নয়। তাতু, আমি বিশ্বাস করি, আমার চিন্তাধারার মুকুরে বিকশিত হয়ে আমার ভালবাসা নিশ্চয় নতুন রূপ ধারণ করবে। আমার ভালবাসার মানুষের মধ্যেই আমি খুঁজে পেতে চাই আমার বন্ধুকে। তুমি আমার ভালবাসা, তুমিই আমার বন্ধু তাতু।

প্রিয় তাতু,

পেত্‌র স্টেশানের একটা রেলওয়ে কামরার মধ্যে বসে তোমাকে লিখছি। হয়তো আমার ফাঁসি হতে পারে······কিন্তু মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না ·····তোমাকে আমি ভালবাসি তাতু।

উল্লুবি

অনুবাদ ।। রমা ভট্টাচার্য
মালা ভট্টাচার্য

তাকিজি কোবায়াশি

'জাপানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পুলিশী সন্ত্রাসের সর্বশেষ বলি হয়েছেন তাকিজি কোবায়াশি, জাপানী প্রলেতারীয় লেখকদের মধ্যে যিনি অগ্রগণ্য। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তিরিশ বছর। পাঁচ বছর আগে 'দা ক্যানারী বোট' নামে গল্প লিখে তিনি প্রথম সাড়া ফেলে দেন, তারপর একটানা অনেক জঙ্গী গল্প লেখেন, ফলে এই বয়সেই তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। তাঁর লেখা গল্পের মধ্যে আছে: 'মার্চের আঠাশ তারিখ, ১৯২৮', 'অ্যাবসেন্টি ল্যাণ্ডলর্ডস্', 'ফ্যাক্টরি সেলস্', 'দা অরগানাইজার', 'সলিটারি কনফাইনমেন্ট', 'দা ভিলেজ অফ নুমাজিরি', 'পীপ্‌ল অফ্ দা ডিস্ট্রিক্ট' এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'এজ অফ ট্র্যান্সফরমেশান'।

আগেও তিনি কয়েকবার কারাবাসের দণ্ড ভোগ করেছেন কিন্তু বছর খানেক আগে তাঁর বাড়িতে যখন পুলিশ হানা দেয়, তিনি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্ত কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৩এর ২১শে ফেব্রুয়ারি তিনি দুপুর একটা নাগাদ রাস্তায় গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। রাস্তায় প্রায় আধঘণ্টা তিনি পুলিশদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিলেন এবং প্রায় রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় তাঁকে পুলিশ থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জঘন্যতম নির্যাতন শুরু হয়, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মুখ দিয়ে একটা শব্দ, একটা নাম আদায় করা যায় না। তাঁর বজ্র কঠিন ইচ্ছাশক্তি সমস্ত নির্যাতন-প্রতিরোধ করে, তারপর তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তাঁকে মুক্তি দেয়। পুলিশ তাঁর মৃতদেহ একটি হাসপাতালে নিয়ে যায় ও একটি ভুয়া ডেথ্ সার্টিফিকেট তৈরি করে বলা হয় যে ডাক্তার তাঁকে মৃত্যুর আগেও পরীক্ষা করেছেন এবং তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন।

এরপর তাঁর আত্মীয়দের ডেকে মৃতদেহ হস্তান্তরিত করা হয়। কোবায়াশির মা ষাট বছরের বৃদ্ধা ওসাইসান ছিলেন পুত্রের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি বলেন তাঁর ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ধর্মীয় মতে হবে না, একজন শ্রমিকের মতো হবে। কোবায়াশির মৃতদেহ চোখে দেখার পর

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন যে, তাঁর ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়েছে এ তিনি কখনোই বিশ্বাস করবেন না।

কোবায়াশির বন্ধুরা সমস্ত বড় বড় হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাতে পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষা করানো হয়। একটি হাসপাতাল শেষ পর্যন্ত সম্মত হয় কিন্তু মৃতদেহ আনবার পর তারা যেই বুঝতে পারল লোকটি কে, তারাও তখন বেঁকে বসল। স্পষ্টতঃ এরা সকলেই নির্দেশ অনুসারে কাজ করছিল। গত নভেম্বরের পর পুলিশ বিভাগ বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছে কারণ কমরেড ইওয়াতা-র পোস্ট মর্টেমে ইম্পিরিয়াল হস্পিটাল-এর ডাক্তাররা পুলিশের হত্যাকাণ্ডের কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

কোবায়াশির মৃতদেহের ফটো অবশ্য তোলা হয়েছিল। বীভৎস ক্ষতগুলো ছবিতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। কপালের ওপর অগ্নিতপ্ত শলাকা প্রয়োগের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। গলা ঘিরে সরু একটা দড়ির দাগও আছে। কব্জির ওপর গেঁথে বসে আছে হাতকড়ার দাগ। একটা কব্জি তো ভেঙে একেবারে উল্টে গিয়েছে। শরীরের পিছন দিকটা পুরোপুরি ক্ষতবিক্ষত। হাঁটুর ওপর থেকে তাঁর পা দুটো ফুলে উঠেছিল, ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণের জন্য গোলাপী দেখাচ্ছিল। এর পরেও পুলিশরা সন্তুষ্ট হয়নি। তারা তিনশো জনকে গ্রেপ্তার করে কারণ এরা কফিনের পাশে বসে রাত্রে পাহারা দিতে চেয়েছিল এবং অনেক ফুলের তোড়ার শ্রদ্ধার্ঘ্য ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল প্রেরকদের কাছে, যার মধ্যে বুর্জোয়া রাইটার ফেডারেশানের পাঠানো তোড়াটিও ছিল। এর পর আর একটুও বিলম্ব না করে কোবায়াশির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেন কমরেডরা। পনেরই মার্চ ধার্য হয়ে সেই দিন কারণ সেই দিনটি ছিল ব্যাপক হারে কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার শুরু হবার পঞ্চম বার্ষিকী। কোবায়াশি স্বয়ং এই দিনটির কথা তাঁর একটি গল্পে লিখেছেন।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পনেরই মার্চ, প্রায় সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পুলিশ বাহিনী সেদিন 'দা ভিলেজ অফ্ মুমাজারি' নামে কোবায়াশির লেখা একটি গল্পের নাট্যরূপ উপস্থাপিত করতে দেয়নি, সমস্ত অভিনেতাদের তারা গ্রেপ্তার করেছিল। তবু, শ্রমিক ও ছাত্রদের সেদিন তারা ঠেকাতে পারেনি। জাপানের প্রত্যেকটি বড় শহরে শ্রমিক ও

ছাত্ররা সেদিন রাস্তায় নেমে পড়েছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল আর বিলি করেছিল ইস্তেহার, নির্দয় অন্যায় বেআইনী হত্যার প্রতিবাদে।

কমরেড কোবায়াশি জনসাধারণের জন্য তাঁর লেখনীকে যে মহৎ কাজে ব্যবহার করেছেন তারই স্মরণে পনেরই মার্চকে 'সংস্কৃতি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকরা কোবায়াশি স্মরণে ও প্রলেতারীয় সংস্কৃতি প্রসারে প্রত্যেক বছর এই দিনটিকে প্রতিবাদ দিবস হিসাবে পালন করেন।'

উপরোক্ত রচনাটি 'দা ক্যানারী বোট নামে জাপানী গল্প' সঙ্কলনের সংযোজনী অংশ, 'পুলিশী নির্যাতনে তাকিজি কোবায়াশির মৃত্যু'র অনুবাদ। কোবায়াশি যে বছর নিহত হন সেই বছরেই ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স এই গ্রন্থটি আমেরিকায় প্রকাশ করেন। প্রগতিশীল জাপানী কথা সাহিত্যের এই প্রথম ইংরাজী অনুবাদ। 'নগরবাসীর হিতার্থে' গল্পটি ধর্মঘটভঙ্গকারী একজন 'দেশভক্ত' তরুণের কাহিনী। এই ট্র্যাজিডির নায়ক দেশকালের সীমানা পেরিয়ে এখনো সক্রিয় তাই গল্পটিও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি লেশমাত্র।

তাকিজি কোবায়াশি

নগরবাসীর হিতার্থে

১

এরকম একটা সময়ে আরিস্যুকের মনে ফুর্তি আর আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার অদম্য বাসনা জাগা একটুও অস্বাভাবিক নয়। অত্যন্ত কঠোর নীতিবান মানুষেব মধ্যেও কখনো কখনো এরকম বাসনা জাগতে দেখা যায়। আব আবিস্যুকে যে এই নীতিবানদেব একজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। 'পবম গৌরবময়' কোন অভিযানে সাফল্য লাভ কবার পব তার নিদর্শন-গুলো লোপাট কবাব জন্য এবা সাধারণত এক আদিম তাগিদ অনুভব করে এবং এদের চেয়ে নীচু দবেব মানুষের মনে সেরকম কোন তাগিদ কখনো উদিত হয় না। কাজেই ভালো মন্দের বিচারের মধ্যে না গিয়েও মোদ্দা কথাটা হল এই যে, আরিস্যুকে তার দু-চারজন ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মাত্র এক পাত্র পান করবে বলে।

'চুলোয় যাক সব কিছু, এমন একটা সময়ে যে কোন মানুষই চাইবে·····' ওর মুখে এ ধরনের অনুভূতির প্রকাশ ঘটা সত্যিই বিচিত্র। যুব সংঘেব একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে টোকিও শহরের চল্লিশ লক্ষ বাসিন্দার জন্য ও কাজ করেছে। গত চারদিন যাবৎ টোকিও শহর চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিল। আর আজই সেই পরম শুভদিন যেদিন পরিবহন ধর্মঘটের ফয়সালা হল। এ-কদিন ওর বারবার মনে হয়েছে, কে যেন হাজার মণ পোড়া ইটের এক বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। 'কেউ-ই বলতে পারবে না যে, আমি আমার ন্যূনতম কর্তব্যটুকু পালন করতে অবহেলা করেছি।' আরিস্যুকের মনে পড়ে যায় গত কদিন কিভাবে কাতারে কাতারে মানুষ এগিয়ে এসেছে ওকে আর ওর বন্ধুদের

ধন্যবাদের অজস্র ধারায় সিঞ্চিত করতে। নিজেকে ওর এক মহানগরীর মহানায়ক বলে মনে হয়েছে তখন।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যস্ত হকারদের ঝন্ঝন্ ঘণ্টাধ্বনি শুনে পথিকরা থমকে দাঁড়াচ্ছে। প্রত্যেকটি সান্ধ্য পত্রিকায় শুধু ধর্মঘটের খবর। অবিমিশ্র এক আনন্দের আতিশয্যে আরিস্থকের চোখে প্রায় জল এসে যায়।

'এস, আর এক গ্লাস বরং নেওয়া যাক। বুঝলে না, প্রত্যেকেরই এখন একটা কিছু করা দরকার।'

বন্ধুদের ঘাড় ধরে আরিস্থকে ওদের জোর করে টেনে নিয়ে চলল শিন্ঝুকের পেছনের বাগানে। তারপর সাকে পানশালার দরজায় ঝোলান পরদাটাকে কাঁধ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে সদর্পে ভেতরে ঢুকল। মত্ত অবস্থায় (যুব সংঘের একজন সৎ সদস্যেরও মাতাল হবার অধিকার আছে) এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে হাত দুটো এলোমেলো দোলাতে লাগল। পা দুটোও টলমল করছে। হঠাৎ থমকে গিয়ে হতচকিত পানার্থীদের দিকে তাকিয়ে আরিস্থকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা শুরু করে দিল—ধর্মঘটের সময় কেমন করে সে মহারাজের মহান সৈন্য বাহিনীর সেবা করেছে তারই কাহিনী। মাংসের পিঠের সঙ্গে সাকে মদে চুমুক লাগিয়ে একজন কর্মী অমনি বলে উঠল—

'তুমি বীর, একজন সত্যিকারের বীর। আজকালকার তরুণদের মধ্যে তোমার মত এমন বীর খুব কমই দেখা যায়। তোমার জন্য, সত্যিই তোমার জন্য আমরা গর্বিত।'

শিথিল দেহভার চেয়ারে এলিয়ে দিতেই হঠাৎ আরিস্থকের মনে হল মাথাটা যেন বন্বন্ করে ঘুরছে। চোখের সামনে কাপ, প্লেট, চেয়ার, টেবিল, বোতল, মানুষের মুখ আর দেয়ালগুলো তালগোল পাকিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে একযোগে ছুটে এসে ওর চোখের ওপর যেন আছড়ে পড়ছে। আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও আরিস্থকে তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি। ওর মনটা হঠাৎ ডুকরে

উঠল, '……এখানে কি এমন একজন নেই যে ওর হাত দুটো ধরে ওকে টেনে তুলতে পারে……' এবার ও পুরোপুরিই চৈতন্য হারাল। শেষ ওর অবস্থা যেটুকু মনে আছে, বন্ধুদের মধ্যে একজন কেউ ওর কাঁধে চাপড় মারতে মারতে চিৎকার করে বলছিল, '……ট্যামানয়, ট্যামানয়ে* যাচ্ছি আমরা, একটা ট্যাক্সি ডাকো। তুমি কি ভাবছ এই মজার হুল্লোড় ছেড়ে এখন আমরা ঘাড় গুঁজে সোজা গিয়ে বাড়ি সেঁধুবো ?'

*ট্যামানয় ও কোমাইডো টোকিওর বারবণিতা অঞ্চল।

২

ধর্মঘট বিভিন্ন ধরনের হয়। কিন্তু আদতে এগুলোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হোকাইডোতে জাহাজের মুটে আর বন্দর কর্মীরা যখন ধর্মঘট ডাকেন তার অর্থ ওটারু শহরে এবার সমস্ত রকম সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে আবির্ভাব ঘটবে যুব সংঘের সদস্যদের এবং 'নগরবাসীর হিতার্থে' তারা তখনই প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দেবে। কি কোরিয়ায়, কি জেন্‌ঝানে, পরিবহন কর্মীদের স্ট্রাইক চলা কালে ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। যুদ্ধের ঘনঘটায় দিকচক্রবাল যখন তমসাচ্ছন্ন সেই সময় যদি গোলা-বারুদ কারখানার কর্মীরা ধর্মঘট ডেকে বসেন তখন অবশ্যই 'দেশের হিতার্থে' (কার দেশ তা আমরা সবাই জানি) ধর্মঘটকারীদের ঠাণ্ডা মেরে যেতে হবে শুধুমাত্র সর্বজনের শুভ এবং মঙ্গলের মুখ চেয়ে। টোকিওর এই মহান শকট ধর্মঘটও তার ব্যতিক্রম কিছু নয়। দু'পক্ষের মধ্যে বিতর্ক বাধার কারণটা যাইহোক না কেন, চল্লিশ লক্ষ নগরবাসী যখন বিপর্যস্ত ঠিক সেই মুহূর্তে কি কেউ এই বলে পুরো ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে পারে যে, 'ওরা যদি লড়াই করতে চায় তো তাই করুক না।' কাজেই পুরো শহরটাই মরণ যন্ত্রণায় শায়িত বৃদ্ধের মতো এখন ছটফট্ করছে।

শিনৃঝুকে স্টেশনের সামনে একটা গাড়ি এসে থামতেই পিপীলিকা বাহিনীর মতো এক ঝাঁক মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ঘিরে ধরল। ন'টা বেজে দশের মধ্যে যাদের অফিসে এসে হাজিরা দেওয়ার কথা জনতার ভিড়ে মিশে গিয়ে ভয়ে উত্তেজনায় তারা তাদের হাতের ঘড়িগুলো খুলে ফেলল। 'এটা কিন্তু জুলুমবাজি। স্ট্রাইক করার স্বাধীনতা নিশ্চয় ওদের আছে, তবে আমি, মনে করি সেটা এমন ভাবে করা উচিত যাতে অন্যেরা বিপন্ন না হয়।'

ইয়েন ট্যাক্সিগুলোর গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাওয়ার দৃশ্যটা উপস্থিত কেরানীকুলের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকল। ওরা আড়চোখে নজর রাখল ট্যাক্সিগুলোর দিকে। ওভারহেড্ থেকে বেরিয়ে আসার পর আর কোথাও যাওয়ার না-থাকায় ওরা হতাশ ভাবে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোন কারণ এবং যুক্তি ছাড়াই এই বোধহয় প্রথম অনুভব করতে শুরু করেছে যে, ড্রাইভার আর কণ্ডাকটারদের কাজটাও একেবারে ফেলনা নয়। এতদিন পর্যন্ত এই সহজ সত্যটা বোঝার জন্যে কারো কোন মাথা ব্যথা ছিল না। আর যদি তা থেকেও থাকে তাহলেও নিজেদের নিয়ে ওরা এতই ব্যস্ত ছিল যে ব্যাপারটা শুধু মামুলি অনুভবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

শত্রুপক্ষের দুর্গের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার বিক্রম নিয়ে হিঙ্গো জেলায় শ্রমিকরা গাড়িগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গাড়ির গায়ে ওদের লেপটে যাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল একটা চুম্বকের থেকে গোছা গোছা পেরেক ঝুলছে·· ··ওই ভাবেই ওরা এগিয়ে চলল। এই চুম্বক শক্তিওলা গাড়িগুলোকে দেখতে পেয়ে পথচারী কয়েকজন শ্রমিক ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'শালা শূয়োর কোথাকার, লজ্জা করেনা, আমাদের মতো খেটে-খাওয়া মজুর, চলেছিস কি না গাড়ি করে? নেমে আয়, নেমে আয় বলছি, শালা বেজন্মারা! হেঁটে চল······'

দিন দুয়েক এই ভাবেই কাটল। তৃতায় দিনে অবস্থাটা কারো

কাছে আর শুধুমাত্র পরিহাসের ব্যাপার থাকলো না। ঠিক এই সময়েই যুব সংঘের সদস্যরা ইউনিফর্মের হাতায় লাল ব্যাজ লাগিয়ে গাড়িতে গাড়িতে টহল দিতে শুরু করল। শুধু আরিস্তকে নয়, ওদের প্রত্যেকেরই গর্বোদ্ধত দৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটা বিষাদের ভাব। শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে যাবার আগে সৈন্যদের চোখে যেমন ভাব ফুটে ওঠে ঠিক তেমনটি। উপস্থিত সব যাত্রীরাই তাদের হাব ভাবে বোঝাচ্ছিল যে ওরা যুব সংঘের সদস্যদের কাজের তারিফ করছে।

এমন কি শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার প্রধানও যুব সংঘ চালিত ওই শম্বুকগতি যানের সামনে অশ্রুমোচন করে বসেন। ওনার এই অপ্রত্যাশিত আচরণ আরিস্তকে আর তার সঙ্গীদের বিস্মিত ও উত্তেজিত করে, গভীর ভাবে নাড়া দেয়। তাই ফলাফলের তোয়াক্কা না করেই ওরা চল্লিশ লক্ষ নগরবাসীর হিতার্থে কাজ করার শপথ নিয়ে ফেলল। সাদা কথায় এর অর্থ করা যেতে পারে যে, কতকগুলো অনভিজ্ঞ লোক না বুঝেই তাদের জীবনটাকে বাজি ধরল। মিয়াজোকাতে গাড়ি চালানোর সময় আরিস্তকে তো নিজেই ব্রেক চাপতে ভুল করায় ওর সামনের গাড়ির পেছন দিকটায় ধাক্কা মেরে কম ক্ষতি করেনি। ওর আর এক বন্ধু তালেগোলে একটা মোটর বাস বাগিয়ে নিয়েছিল। শেষপর্যন্ত বাসটাকে সে টুকরো টুকরো করে ভেঙে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। পরের দিনের খবরের কাগজে তার ছবিও বেরিয়েছে।

যাইহোক দুটো খুব বিশ্রি অভিজ্ঞতা হয়েছে আরিস্তকের, সেদিন ও যখন গাড়ি থামাবে বলে গতি মন্থর করে এনেছে ঠিক সেই সময় জনা তিনেক গাঁট্টা গোট্টা লোকের একটা ছোট দল ওর খুব কাছ ঘেঁষে এগোতে এগোতে ওর দিকে ঘৃণা ভরে তাকিয়ে বলল, 'ঘেয়ো কোথাকার! এর ঠ্যালা বুঝবি একদিন।'

ঘেয়ো! ঠিক ওই মুহূর্তে আরিস্তকে ধরতে পারেনি কথাটার

অর্থ কি। কিন্তু বুঝতে পারার পর ওর মুখটা রাগে একেবারে লাল টকটকে হয়ে উঠল।

পরের ঘটনাটা ঘটে শিমব্যাসী স্টেশানে। কাজ সেরে ওভারহেড ধরতে গিয়েছে। একদল ধর্মঘটী মহিলা বাস কণ্ডাকটার মিছিল করে যাচ্ছিল তখন। দেখ না দেখ একগাদা ইস্তেহার ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে প্রাণের ভয়ে ওরা চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল। একটু পরেই এগিয়ে এল দুজন সাদা পোশাক পরা লোক। এদের মধ্যে একজন একটা মেয়ের ঘাড় ধরে সজোরে তার গালে একটা চড় কসালো। তারপর তার পাছায় মারল লাথি। গজ পাঁচ ছ' এগিয়ে গিয়ে মেয়েটা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। এরপর সেই লোকদুটো মেয়েটার দেহের ওপর চেপে বসল! আরিস্নুকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ইস্তেহারে রেলকর্মীদের কাছে সহানুভূতি সূচক কর্মবিরতির জন্য দাবী জানানো হয়েছিল। মেয়েগুলো বুদ্ধু নয় তো কি?

সে যাই হোক পরের দিন আরিস্নুকে আবার যে কে সেই, টগবগে তাজা তরুণ হয়ে গেল। আরিস্নুকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে এই ধর্মঘটের পেছনে কেউ একজন কলকাঠি নাড়ছে। আর এ কথাও ও ভাল করে জানে যে ইদানীং কিছু অশুভ শক্তি জাপানকে প্রচণ্ড ভাবে চাপ দিচ্ছে।

৩

ট্যাক্সিটা যখন অস্কুশা ব্রীজটা পেরচ্ছিল তখন ওপারে একটা আলো দেখতে পেল বলে মনে হল আরিস্নুকের। তারপর অনুভব করল কিসের যেন একটা তীব্র আকর্ষণ ওকে পাশের বিচিত্র সরু গলিটার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। পরের ঘটনা একটি মেয়ের গা থেকে ভেসে আসা চড়া সেন্টের গন্ধ, আর তারপর তার নাক, চোখ, গাল ও ঠোঁটের নিকট সান্নিধ্য। বিছানায় ওর পাশে যে

মেয়েটি শুয়ে আছে তার ছোট ছোট করে ছাঁটা নরম চুলের স্পর্শ অনুভব করল আরিস্‌কে। এই সেই ট্যামানয়! অথচ কি আশ্চর্যের ব্যাপার, ও কিন্তু এখনও জানে না যে এক করুণ পরিণতি ওর জন্য অপেক্ষা করছে, এইখানেই এই ট্যামানয়েই।

ছোট ছোট চুলওলা মেয়েটা যেই হোক না কেন ওর কাছে ধর্মঘটের ব্যাপারটা বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে না বলা পর্যন্ত আরিস্‌কে যেন আর ওর পাশে শুয়ে থাকতে পারছিল না।

মেয়েটা ওর মুখ থেকে সব শুনে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। আরিস্‌কের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়েছে নিজেকে।

'আমরা মেয়েরা যদি ধর্মঘট করি তাহলে আমাদের বদলি হিসেবে তোমার বোনেদের এনে হাজির করবে বলো? ব্যাপারটা একই নয় কি?'

'বুদ্ধুর মতো কথা বলো না!'

সবই সমান, কথাগুলোর মাথামুণ্ডু নেই কোন। এরপর ছোট চুলওলা মেয়েটা অনেক কথাই বলল যেগুলো আরো বেশী অসঙ্গতিপূর্ণ।

মেয়েটা নাগাড়ে বলে চলে—কি ভাবে শহরের দণ্ডমুণ্ডেরা দক্ষিণপন্থী নেতাদের সঙ্গে আগে থেকে আঁতাত করেছে। তাই বামপন্থীদের (যে কোন ব্যাপারে যারা জ্বলে উঠতে তৈরী) প্রথমে এগিয়ে দিয়ে তার পরে মাঝপথে তাদের থামিয়ে দিয়ে নির্মূল করে দেবার মতলব এঁটেছে। কি ভাবে দক্ষিণপন্থীদের যাট লক্ষ ইয়েন ঘুষ দেওয়া হয়েছে, কি ভাবে একজন প্রখ্যাত নেতা সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায় এক গেইশার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। এবং ওই নেতাই ট্যাক্সিতে বসে প্রচুর টাকা গুণতে গুণতে কিভাবে চিৎকার করে সদম্ভে জাহির করেছে—'হে, হে, ধর্মঘটের চাবিকাঠি আমাদের হাতের মুঠোয়।' মেয়েটা নাগাড়ে বকে চলেছে—'আর, আর এই সমস্ত কিছু ধামাচাপা দেবার জন্যে

এবং জনগণকে সন্দেহ থেকে দূরে রাখার জন্যে শহরের ইলেকট্রিক ব্যুরো এক চাল চেলে নাগরিকদের কাছে আবেদন পত্রটা প্রচার করেছিল। মিটমাটের পর একশ'রও বেশী কর্মী চাকরি খোয়ানোয় ব্যাপারটার সত্যতা যাচাই হয়ে গেছে, আর বাদবাকী যাদের চাকরিতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থা হয়েছে আগের চেয়ে আরো সঙ্গিন। এদিকে দলত্যাগীরা কিন্তু নীট ষাট লক্ষ ইয়েন পকেটস্থ করেছে।' মেয়েটি তারপর প্রশ্ন করে, 'তুমিও নিশ্চয় খুব ভালো কাজেই সাহায্য করেছ, তাই না?'

আমি আগেই বলেছি, আরিস্যুকে একজন ধীর স্থির আদর্শবাদ যুবক। এ ধরনের লোকেরা যখন জান প্রাণ দিয়ে করা নিজের কোন কাজকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে তখন তার ফলটা হয় ভয়ঙ্কর। প্রশ্ন শুনে, আরিস্যুকে একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল।

ট্যামানয় কিংবা কোমাইডোতে এ ধরনের একটা মেয়ের কাছে আসা এমন কোন অসাধারণ ঘটনা নয়। অসাধারণ যা, তা হল ধর্মঘটের ব্যাপারে ওই মেয়েটির বিরামহীন বিশদ বর্ণনা। এরপর মেয়েটি পুরো বিষয়টি সম্বন্ধে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে শুরু করল।

ভোর বেলাতে সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটে গেল। আমি আগেও বলেছি, আরিস্যুকে খুবই নীতিবাগিশ। ও যা ন্যায্য বলে মনে করবে তা করতে গিয়ে সহজ বা দুর্গম যে-পথই বেছে নিতে হোক না কেন সে পথেই ও এগিয়ে যাবে। এর ওপর ও আবার মদ্য পান করেছিল। যাহোক এবার সেই ভয়ংকর ঘটনাটার কথা বলি: বেশ্যা বাড়ির কলঘরে আরিস্যুকে, অর্থাৎ যুব সংঘের সদস্য, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আর একটা কথাই যোগ করা দরকার, এমন আরিস্যুকে আঁরো অনেক আছে।

অনুবাদ ।। রমা ভট্টাচার্য

ম্যাকসিম গোর্কী

শহিদ রচনা সঙ্কলনে ম্যাক্সিম গোর্কীর নাম অনেককেই বিস্মিত করবে। ম্যাক্সিম গোর্কীর সাহিত্যকৃতি ও সাংস্কৃতিক অবদান নিয়ে তাই আলোচনা না করে সংক্ষেপে গোর্কী হত্যার বৃত্তান্ত পেশ করা হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রকাশিত ইতিহাসের পাতায় এখন স্তালিনের নাম যেমন মুছে গেছে তেমনি হারিয়ে গেছে গোর্কী কিরভ প্রমুখের হত্যা বিবরণ। শুধু তাই নয় গোর্কীর মৃত্যুর কারণ হিসাবে ফুসফুসের রোগের কথা বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান ঘটার কথা, যা নাকি তিনি যৌবনকালে যে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তারই জের। অথচ গোর্কী হত্যার বিবরণ, অপরাধীদের স্বীকারোক্তি থেকেই জানা গেছল। ১৯৩৭-৩৮ সালে মস্কোতে কতকগুলি বিচারের অনুষ্ঠান হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের অন্যতম অভিযোগ ছিল—দক্ষিণপন্থী উপদল এবং ট্রটস্কিপন্থীরা সোভিয়েত সরকার এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি সন্ত্রাসমূলক কাজ করেছে এবং কিরভ, মেনঝিন্স্কি, কুইবিশেভ ও ম্যাক্সিম গোর্কী হত্যার জন্যেও তারাই দায়ী। বিচারের সময় ষড়যন্ত্র যখা ফাঁস হয়ে যায় আসামীরা দণ্ড লাঘব হবার আশায় স্বীকারোক্তি পেশ করে এবং তার থেকেই জানা যায় কিরকম নৃশংস সুপরিকল্পিত ভাবে ম্যাক্সিম গোর্কীকে ও তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হয়েছিল। ট্রটস্কিপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের প্ররোচনায় ডিপার্টমেণ্ট অফ পাব্লিক সিকিউরিটির তৎকালীন চেয়ারম্যান হেনরী ইয়াগোদা, ডক্টর লেভিন নামে তাঁর নিজস্ব চিকিৎসককে গোর্কী হত্যার কাজে নিযুক্ত করেন। ট্রটস্কির নির্দেশাবলী বহনকারী সার্জি বেসোনভের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, ১৯৩৪-এ ট্রটস্কি তাঁকে বলেছিলেন, "গোর্কী স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তিনি বিশ্বের, বিশেষভাবে পশ্চিম ইউরোপের জনমত সোভিয়েত গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে প্রভাবিত করছেন। গোর্কীর প্রভাবে পড়ে আমাদের বুদ্ধিজীবী সমর্থকেরা আমাদের ত্যাগ করছে। তাই যেমন করেই হোক গোর্কীকে চিরতরে সরিয়ে দিতেই হবে।" শুধু তাই নয়, প্রবাসী ফ্যাসিষ্ট রাশিয়ানরা ১৯৩৪-এর ১লা নভেম্বর বেলগ্রেড থেকে প্রকাশিত তাদের মুখপত্র 'নেশানাল লীগ্ অফ্ নিউ রিজেনারেশান'-এ লিখেছিল—"যদি স্তালিনকে হত্যা করতে না পার, অন্ততঃ গোর্কীকে হত্যা কর।" এই নির্দেশ অনুসারেই প্রথমে গোর্কীর পুত্রকে হত্যা করা হয় কারণ ইয়াগোদার ধারণা ছিল একমাত্র

পুত্র পেশকভের মৃত্যুতে গোর্কী যে আঘাত পাবেন তা সামলে উঠতে পারবেন না। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ভুল চিকিৎসা ও ভুল ওষুধ প্রয়োগ করে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত পেশকভকে ডঃ লেভিন হত্যা করলেন ১৯৩৪-এর ১১-ই মে। ম্যাক্সিম গোর্কীকেও একই উপায়ে হত্যা করা হয় তবে তার জন্যে ডঃ লেভিনকে প্রায় দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৩৬-এ গোর্কী মস্কোয় থাকাকালীন ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আক্রান্ত হন এবং লেভিন শুরু করেন মৃত্যু চিকিৎসা। সাধারণতঃ এই রোগে যে ওষুধ দেওয়া হয় সেগুলিই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তার পরিমাণ ছিল ভয়ঙ্কর। চব্বিশ ঘণ্টায় তাঁকে চল্লিশটি camphor, দুটি digalen, চারটি caffeine ও দুটি strychnine ইন্‌জেকশান দেওয়া হয়। এবং তার ফল যা হবার তাই হল, ১৯৩৬-এর ১৮ই জুন গোর্কীর মৃত্যু ঘটল। গোর্কী হত্যাকাণ্ডের সমস্ত বিবরণ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল হত্যাকারী ডাক্তার লেভিনের স্বীকারোক্তি থেকে।

গোর্কীর মৃত্যু-কাহিনী ইতিহাস থেকে আজ মুছে ফেলে যারা সর্দিকাশির তত্ত্ব আমদানি করতে চাইছে তাদের অপরাধ নৃশংস হত্যাকারীদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়।

(১৯৬৮-তে প্রকাশিত 'কালপুরুষ' পত্রিকার ম্যাক্সিম গর্কী জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যায় রণজিৎ বাগচীর 'ম্যাকসিম গর্কীর মৃত্যু' প্রবন্ধটি থেকে আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে)

ম্যাকসিম গোর্কী

জীবনের অধিদেবতারা

'চলতি সমাজ-ব্যবস্থার মূল বুঝতে চাও তুমি? তবে এস আমার সঙ্গে সত্যের উৎস মুখে।' হাসতে হাসতে শয়তান আমাকে নিয়ে এল গোরস্থানে।

পুরনো সমাধি স্তম্ভ এবং ঢালাই লোহার স্মৃতি-সৌধের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। শ্রান্ত বৃদ্ধ প্রফেসরের নিষ্ফলা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মত ক্লান্তস্বরে বলে উঠল শয়তান:

'বুঝেছ বন্ধু, তোমার পায়ের নিচে আজ যারা সমাধিস্থ হয়ে আছে তাদেরই তৈরি আইন-কানুনে কিন্তু তোমরা শাসিত হচ্ছো। তোমাদের মধ্যেকার হিংস্র পশুকে বন্দী করে রাখবার জন্য খাঁচা তৈরি করেছিল যারা, সমাজ-যন্ত্রের সেই সব মহারথী মিস্ত্রীদের ভস্ম তুমি দু'পায়ে মাড়িয়ে চলেছ—' বলতে বলতে হেসে উঠল সে—অদ্ভুত সে-হাসি, মানুষের প্রতি ঘৃণার কষাঘাত ফুটে উঠল সে-হাসিতে। তাকিয়ে দেখলাম, তার সবুজ চোখ দু'টোর আনন্দহীন হিম-শীতল দৃষ্টি ভেসে গেল গোরস্থানের দুর্বার ওপর দিয়ে। আমার পায়ে ঠোকর লাগল উর্বরা ধরণীর তাল তাল মাটি; মৃতের পার্থিব জ্ঞান-সমৃদ্ধি সম্বলিত স্মৃতি-সৌধের পাশের সর্পিল পথ দিয়ে হাঁটা অসুবিধাজনক হয়ে উঠল।

'আচ্ছা বন্ধু, যারা তোমাদের সত্তাকে ছাঁচে ঢেলে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তুমি তো মাথা নোয়ালে না?' শরৎকালের স্যাঁতসেঁতে একটানা বাতাসের মত মিইয়ে-পড়া আর্দ্র কণ্ঠস্বর শয়তানের। সে-কণ্ঠস্বর শুনে আমার মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিউরে উঠল, হৃদপিণ্ডে লাগল কাঁপন, একটা তীব্র অস্বচ্ছন্দতায় মোচড় খেয়ে উঠল সমস্ত হৃদয়। গোরস্থানের বিষণ্ন গাছগুলিও যেন নড়ে উঠে তাদের ভিজে শীতল ডাল আমার মুখের ওপর বুলিয়ে দিল।

'প্রবঞ্চকদের প্রতি সম্মান দেখাও বন্ধু! নগণ্য ফ্যাকাশে

চিন্তাধারার মেঘজাল বিস্তার করেছে এরাই, যার কানাকড়ি আয়ত্ত করাই হলো তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তোমার অভ্যাস, তোমার সংস্কার, যা কিছু নিয়ে তুমি বেঁচে আছ, এসব কিছু এদেরই পরিকল্পিত ধাঁচে ফেলে তৈরি হয়েছে। এইসব মৃত মহারথীদের ধন্যবাদ জানাও বন্ধু! কি বিরাট ওয়ারিসী-স্বত্বই না রেখে এসেছে এরা তোমাদের জন্য! —'

শুকনো পাতা ঝরে পড়ল আমার মাথায়, লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ে। কবরের ভুখা মাটি অট্টহাস্যে গোগ্রাসে গিলতে লাগল সেই তাজা খাদ্য : শরতের ঝরে-পড়া শুকনো পাতা।

'এই যে, এখানে যিনি শুয়ে আছেন, জীবিতকালে তিনি ছিলেন একজন দরজী— মানুষের তাজা মনকে কুসংস্কারের ভারী ধূসর কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেওয়ার কাজ ছিল এই মহাত্মার।— এর সঙ্গে কথা বলতে চাও তুমি?'

রাজী হয়ে মাথা ঝাঁকালাম আমি। একটা মরচে-ধরা সমাধি-স্তম্ভের ওপর লাথি মেরে হাঁক দিল শয়তান : 'হে — এই কেতাব-লিখিয়ে, উঠে এস—'

স্মৃতিসৌধ কঁকিয়ে উঠে ফাঁক হয়ে গেল— কানে এসে লাগল একটা ভারী দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ — যেন কাদার গোলা গড়িয়ে পড়ছে নিচে। উইয়ে-খাওয়া থলের মত অগভীর কবরটা খুলে গেল। ঘনান্ধকার স্যাঁতসেঁতে গহ্বর থেকে অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল :

'রাত বারটার পর মৃতকে এভাবে ডেকে কে তোলে?'

'হুঁ! দেখলে, জীবনের রীতি-নিয়ামক যারা, মরে গেলেও তারা কেমন নিজেদের কাছে ঠিক থাকে —' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল শয়তান।

'ও! তুমি প্রভু!' বলতে বলতে একটা কঙ্কাল উঠে বসল কবরের কিনারে। শুধু তার শূন্য করোটিটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল শয়তানকে।

'হ্যাঁ, আমি। আমার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি তোমাদের

দেখাবার জন্য। তোমাদের তৈরি বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে বাস করতে করতে সে কেমন ভোঁতা মেরে যাচ্ছে। তাই এখন এসেছে এর উৎস-মুখে যাতে তার সংক্রমণ থেকে আরোগ্য হতে পারে—'

বিনয়াবনত হয়ে আমি তাকিয়ে দেখলাম সেই ঋষি প্রবরের দিকে। করোটির উপরে একটু মাংসও নেই, কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির ভাব তখনও মুছে যায়নি তার মুখ থেকে। প্রত্যেকটি অস্থিটুকরোর মধ্যে, পরমপূর্ণতালব্ধ অস্থি সমষ্টির অংশ হিসেবে, একটা অনুপম ব্যবস্থার অংশ বিশেষ বলে কেমন আত্ম-সচেতনতার ছাপ রয়েছে।

শয়তান জিজ্ঞেস করল তাকে:

'পৃথিবীতে তুমি কি কি করে এসেছ বলো আমাদের।'

গর্ব ও আড়ম্বরের সঙ্গে কঙ্কালটা তার হাতের হাড় দিয়ে নিঃস্বের ছিন্নবস্ত্রের মত পাঁজরের উপর ঝুলে-থাকা শবাধারের টুকরো ও নিজের দেহের চিমসে মাংসের উপর বুলিয়ে নিল। তারপর গর্বের সঙ্গে কাঁধ বরাবর দক্ষিণ বাহুটি তুলে কোনমতে লেগে-থাকা আঙুল দিয়ে গোরস্থানের ঘনান্ধকারের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগল ধীর নির্বিকার কণ্ঠে:

'শ্বেতাঙ্গরা যে কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে শ্রেষ্ঠ, এই মহান্ চিন্তাধারা আমি দশখানা সুবৃহৎ বই লিখে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছি—'

'অর্থাৎ, সত্যকথায় বলতে গেলে,' ঋষি প্রবরের কথার মাঝে বলে উঠল শয়তান: 'তোমার বক্তব্য যা দাঁড়ায় তা হলো: একজন বন্ধ্যা বয়স্কা কুমারী সমস্ত জীবন ধরে কেবল তার মনের ভোতা ছুঁচ দিয়ে গেঁথে গিয়েছে এঁদো ভাবধারা ভর্তি কতকগুলি কাগজের পর কাগজ। এবং এগুলো সে গেঁথেছে তাদের জন্য যারা পূর্ণ আন্তরিকতার মাঝে সুস্থ স্থির মস্তিষ্কে বসবাস করতে চায়—'

'এভাবে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ ওকে?' ফিস ফিস করে আমি বললাম শয়তানকে। 'ও!—' বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল সে: 'জীবিত অবস্থায়ও তো বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সত্যকথায় কান দেয় না!'

ঋষি বলতে থাকে : 'এ রকম উন্নত ধরনের সভ্যতা সৃষ্টি একমাত্র শ্বেতাঙ্গদের দ্বারাই সম্ভব। আমি প্রমাণ করেছি যে শ্বেতাঙ্গদের চামড়ার রং এবং দেহের রক্তের রাসায়নিক সংযুক্তিই এই সূক্ষ্ম নীতিবোধের মূলে—'

'শোন, শোন, সে প্রমাণ করেছে!' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে শয়তান বলে ওঠে: 'নৃশংসতা করার অধিকারে বিশ্বাস য়ুরোপীয়দের মতো কিন্তু বর্বরদের মনে অত পাকাপোক্ত ভাবে নেই—'

'খৃষ্টধর্ম ও মানবতাবোধ তো সৃষ্টি করেছে শ্বেতাঙ্গরাই—' কঙ্কাল বলে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবদূতের বংশধররা, যারা দুনিয়া শাসন করবে!' শয়তান কঙ্কালের কথার মাঝে বলে ওঠে : 'সেই জন্যেই বুঝি অতি উৎসাহের সঙ্গে এই সভ্যতাকে রক্তের লাল রঙে বারে বারে ছোপ খাইয়ে নিতে হয়—'

আঙুলের হাড়গুলো মটকাতে মটকাতে মৃত ব্যক্তি বলতে থাকে : 'সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তারা, অদ্ভুত যান্ত্রিক আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়েছে তারা…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোটা তিরিশেক ভাল বই এবং মানুষ ধ্বংসের জন্য অগুন্তি বন্দুক—' হাসতে হাসতে বলে শয়তান : 'মানুষের জীবনে এত ভাঙন, এত অবনতি, অ নমন শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ছাড়া আর কোথায় হয়েছে বলতে পার?'

'শয়তান যা বলছে তা কি মিথ্যে?' আমি বললাম।

উখো ঘষা বিষণ্ন কণ্ঠে বিড বিড় করে বলে কঙ্কাল : 'য়ুরোপীয়দের শিল্পকলা উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছে—'

'তাহলে বলো যে শয়তান ভুল বুঝতেই চায়! উঃ, স্পষ্টবাদী হওয়া যে কী ক্লান্তিকর! আমার বিদ্রূপের কষাঘাতের জন্যই যেন মানুষের বাঁচা!…মিথ্যা ও ইতরতার বীজই তো দেখছি দুনিয়ায় সব থেকে ফলপ্রসূ। এই বীজ যারা ছড়ায়, তাদেরই একজন তোমার

সামনে দাঁড়িয়ে। নতুন কিছু এরা কেউই করতে পারে না, পুরনো কুসংস্কারের শবকেই এরা নতুন কথার মারপ্যাঁচে সাজিয়ে তুলে ধরে। এই তো এদের কাজ।···কী হয়েছে এই পৃথিবীতে বলতে পার? বিরাট বিরাট ইমারত গড়ে উঠেছে জনাকয়েকের জন্য, আর বহুর জন্য প্রস্তুত হয়েছে গির্জা, ধর্মমন্দির আর কারখানা। মানুষের মনের জবাই হয় ধর্মমন্দিরে আর দেহের জবাই হয় কারখানায়, যাতে ইমারতগুলো অক্ষত থাকে। মাটির নিচের গভীর গর্ত থেকে মানুষ তুলে আনে সোনা কয়লা—আর এই হীন কাজের বদলে কি দেওয়া হয় তাকে জান? দেওয়া হয় সিশে আর ইস্পাতের মসলা দিয়ে পাকানো এক টুকরো রুটি।'

'তুমি কি সাম্যবাদী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম শয়তানকে।

'আমি চাই মানুষ মিলেমিশে বাস করুক। মানুষ হলো সজ্ঞানসত্ত্ব জীব। তাকে যদি ভেঙে চুরমার করে পরিণত করা হয় দীপশলাকায়, স্বার্থান্বেষী লোভাতুরের হাতের অস্ত্রে যদি সে পরিণত হয়, আমার ভারী বিশ্রী লাগে। গোলাম আমি পছন্দ করি না, গোলামী আমি ঘৃণা করি, এবং এই জন্যেই আমি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম। যেখানে দেবমূর্তি সেখানেই আধ্যাত্মিক গোলামী, সেখানেই মিথ্যার প্রচার। পৃথিবী বাঁচুক--সব কিছু নিয়ে দুনিয়া বেঁচে থাকুক! প্রেম ভালবাসা আসে মানুষের জীবনে ···অন্ততঃ একটিবারও তো আসে, আসে সুন্দর স্বপ্নের মতো··ঐ একটিবারের জন্যও তো আসে মানুষের জীবনে আনন্দ, আসে বেঁচে থাকার পূর্ণ সার্থকতা—'

ঘনকৃষ্ণ পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কঙ্কালটি। তার শূন্য পাঁজরার খাঁচার মধ্য দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে বাতাস বয়ে যায়। শয়তানকে উদ্দেশ করে আমি বলি: 'শীতে কঙ্কালটি কাঁপছে, ওর কষ্ট হচ্ছে—'

'অপ্রয়োজনীয় সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন যে বৈজ্ঞানিক, তাকে

দেখতে আমার ভাল লাগে, বন্ধু। আর এ-কঙ্কাল যে দেখছ, এ তো তার আদর্শের কঙ্কাল…একেবারে মৌলিক জিনিসটি চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। এর পরের কবরটাতে যিনি শুয়ে আছেন, তিনিও ছিলেন আরেকজন সত্যের বীজ বপনকারী। ওঁকেও জাগিয়ে উপরে তুলে আনছি।…বুঝলে বন্ধু, জীবিতকালে এরা সকলেই কিন্তু শান্তি ও নির্বিঘ্নতার পূজারী ছিল। এবং এই উদ্দেশ্যে মানুষের চিন্তাধারা, ভাব-উচ্ছ্বাস, তার জীবন-পথের গতি-নিয়ামক কত সব নিয়মকানুন তৈরি করে এসেছে! মানুষের কত সজীব নতুন চিন্তাধারাকে এরা বিকৃত করে বেশ সুষ্ঠুভাবে কফিনে ভরে কবর-চাপা দেবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আশ্চর্য, মৃত্যুর পর মানুষের স্মৃতিপটে এরা সকলেই বেঁচে থাকতে চায়!…হেই—করোটি-বিশারদ, উঠে এস! একজন মানুষকে আমি নিয়ে এসেছি। ওর নতুন চিন্তাধারাকে কবর-চাপা দেবার জন্যে একটা কফিন চাই।'

এবং আগের মতই কবরের অভ্যন্তর থেকে একটা দন্তহীন কঙ্কাল উঠে এল। তার শূন্য করোটিটা হলদে হয়ে গেছে, তবুও দেখে মনে হয়, একটা আত্মতৃপ্তির ছোঁয়ায় যেন সেটা জ্বল জ্বল করছে। কঙ্কালটার কোনো জায়গায় একটুও মাংস লেগে নেই—অনেকদিন হলো নিশ্চয়ই সে মাটির নিচে শুয়ে আছে। সমাধি-স্তম্ভের পাশে উঠে এসে সে দাঁড়াল। কালো পাথরের গায়ে তার পাঁজরের হাড়গুলো সরকারী দেহরক্ষীর পোষাকের ডোরার মত দেখায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'আচ্ছা, ওর সব চিন্তাগুলো ও রাখে কোথায়?'

'ওর হাড়ের মধ্যে, বন্ধু, ওর হাড়ের মধ্যে! ওদের চিন্তা ভাবনা হলো রাতের মতো—পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওগুলো ঢুকে থাকে!'

শুষ্ক কণ্ঠে কঙ্কাল জিজ্ঞেস করে: 'আমার বই কেমন বিক্রি হচ্ছে, প্রভু?'

'তোমার বইসব শেলফে জমে পড়ে আছে, প্রফেসর।' শয়তান উত্তর দেয়।

একটু ভেবে নিয়ে কঙ্কাল আবার প্রশ্ন করে : 'মানুষরা কী তবে লেখাপড়া ভুলে গেল ?'

'না না, লেখাপড়া তারা ভোলে নি। এখনও নানারকম বাজে জিনিস তারা পরম উৎসাহেই পড়ে থাকে—তবে, আরও ক্লান্তিকর বাজে জিনিসের দিকে তাদের মনযোগ আকর্ষণ করাতে হলে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে, প্রফেসর।'

আমার দিকে তাকিয়ে শয়তান আবার বললে : 'এই যে প্রফেসরকে দেখছ, বন্ধু, জীবিতকালে এ কি করত জান ? মেয়েরা ঠিক মানুষ নয়, মানবেতর জীব—এইটে প্রমাণ করবার জন্য সমস্ত জীবন ধরে সে কেবল মেয়েদের করোটি মেপেছে, একটা দুটো নয়, শ'য়ে শ'য়ে করোটি মেপেছে, একটা একটা দাঁত গুনে গুনে পরীক্ষা করে দেখেছে, কানের মাপ নিয়েছে, মৃত মেয়েদের মগজ ওজন করে দেখেছে। বুঝলে, সমস্ত জীবন ধরে এই একমাত্র কাজই সে করেছে। মৃতের মগজ ওজন করা ছিল প্রফেসরের প্রিয় কাজ। তার সমস্ত বইয়েই এই সবের ছড়াছড়ি দেখবে। তুমি কি প্রফেসরের লেখা কোন বই পড়েছ ?'

উত্তর দিলাম : 'শুঁড়ীখানায় গলি দিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করি না। মানুষ সম্বন্ধে জানতে হবে বই পড়ে—এটা ঠিক আমার জানা নেই। আর বইয়ের মধ্যে মানব-চরিত্র—সে তো সব সময়েই ভগ্নাংশ। আমি আবার অঙ্কে দুর্বল। তবে একটা জিনিস আমি ভালভাবেই জানি এবং তা হলো এই যে শ্মশ্রুগুম্ফহীন মানুষ শাড়ী-গাউন পরা হলেও ধুতি-লুঙ্গী-স্যুট পরা শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত মানুষ থেকে কোন অংশেই ছোট কিংবা বড় নয়…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছে—' বলদামো ও ইতরামো কী আর পরনের বাস আর মাথার দীর্ঘ কেশ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় ?…মেয়েদের

প্রশ্নটা কিন্তু অদ্ভুত ভাবে রাখা হলো—', বলতে বলতে হো হো করে শয়তান হেসে উঠল, যে-ভাবে সে সাধারণতঃ হেসে ওঠে। এবং এই জন্যেই তাব সঙ্গে কথা বলে আমার ভাল লাগে। গোরস্থানে দাঁড়িয়ে এভাবে যে হাসতে পারে সে ভালবাসে জীবনকে, ভালবাসে মানুষকে—সত্যিই ভালবাসে···

শয়তান বলতে থাকে: 'একদল লোক আছে যারা মেয়েদের শুধু স্ত্রী, ক্রীতদাসী হিসেবেই পেতে চায়, মেয়েদের কখনই তারা মানুষ বলে গণ্য করে না। আরেক দল আছে যারা মেয়েদেব কর্মক্ষমতা শোষণ করে, মেয়ে হিসেবে তাদের ব্যবহারও করে এবং এরা বলে যে কর্মক্ষেত্রে পুরুষ থেকে মেয়েরা মোটেই অনুপযুক্ত নয়—সমান ভিত্তিতে তার সঙ্গে অর্থাৎ তাব জন্যে তারা কাজ করবে। কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চিত যে এই দুই দলের কেউই এদের দ্বারা ধর্ষিতা মেয়েদেব কখনও সমাজে গ্রহণ করে না—একবার যখন ছোঁয়া লেগেছে সে-কলঙ্কের দাগ কি আর মোছা যায় কোন দিন? এই হলো এদেব স্থিব বিশ্বাস। ···মেয়েদের নিয়ে সমস্যা সত্যিই চমকপ্রদ। সহজ সবল মিথ্যা কাহিনী সাজিয়ে যখন পুরুষরা আবোল-তাবোল বকতে থাকে, তখন আমার ভারী হাসি পায়—আমার মনে হয় শিশুদেব কলকাকলির কথা।···তবুও আশা থাকে মনে যে সময়ের পদক্ষেপে এই বুড়ো-শিশুরা বড় হয়ে বুঝবে—'

শয়তানের মুখের দিকে আমি মুখ তুলে তাকালাম। আমার মনে হলো যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আকাশ-কুসুম রচনা করার বাসনা তাব নেই। আকাশ-কুসুম না ভেবে আজকের মানুষকে নিয়ে আমিও অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু এই সহজ সুখকর বিষয়ের আলোচনায় শয়তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে আমার এখন ইচ্ছে হলো না। তাই তার কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম:

'একটা চলতি প্রবাদ আছে যে শয়তানের যেখানে যাওয়ার

সময়ের অভাব হয় সেখানে সে পাঠায় মেয়েদের। কথাটার মধ্যে সত্য আছে কী?'

কাঁধ দুটো নাচিয়ে সে বলে: 'তা হয় বটে···ধূর্ত এবং সংকীর্ণ মনের লোক যদি না থাকে চারপাশে যারা—'

'অসৎকর্মের প্রতি শয়তানের স্বাভাবিক প্রবণতা যেন দেখছি না তোমার মধ্যে!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে জবাব দেয়: 'অসৎকর্ম! অসৎকর্ম বলে তো কিছু নেই আজকাল! শুধু অসভ্যতা, শুধু ইতরতা! এককালে এই অসৎকর্মের একটা শক্তি ছিল, সৌষ্ঠব ছিল। কিন্তু এখন! —মানুষ হত্যা করতে হলেও তা করা হয় অত্যন্ত স্থূলভাবে: হাত পা বেঁধে তাকে ফেলে দেওয়া হয় জল্লাদের হাতে। আসল দুর্জনদের কেউ থাকে না সামনে। আর, জল্লাদ তো ক্রীতদাস —ভীতির শক্তির দ্বারা চালিত, পীড়ন-ভয়ে পরিচালিত একটা হাত আর একটা কুঠার মাত্র।...যাদের ভয় করে, তাদেরই এই দুর্জনেরা হত্যা করে ··'

কবরের কিনারে কঙ্কাল দুটো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে···শরতের ঝরা-পাতা ঝরে পড়ে তাদের উপরে, ধীরে ধীরে বেয়ে নামে তাদের হাড়ের গা ছুঁয়ে। পাঁজরের হাড়ের স্পর্শে বিষাদের সুর লাগে বাতাসের গানে, করোটির শূন্য-গর্ভে সে-বাতাস গর্জে ওঠে। চোখের গভীর গর্ত থেকে ঠিকরে বেরোয় স্যাঁতসেঁতে কড়া-গন্ধের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শীতে কাঁপছে কঙ্কাল দুটো। বেদনায় আমার মন দুলে উঠল। বললাম:

'ওদের কবরে ফিরে যেতে বল, বন্ধু, শীতে ওরা কাঁপছে।'

'হা-হা-হা—, গোরস্থানে এসেও দেখছি, বন্ধু, তুমি মানব-দরদী! তবে হ্যাঁ, ওটার উপযুক্ত স্থান গোরস্থানই বটে। এখানে ওর জন্যে কেউ বিরক্ত হয় না। কয়েদখানায় এবং খনিতে, কারখানায়, শহরের পথে ও পার্কে, যেখানে জীবন্ত মানুষের বাস, সেখানেকিন্তু

এই মানবতাবোধ পরিহাসের বিষয় ; শুধু কি তাই, ক্রোধের উদ্রেক পর্যন্ত করে। এখানে এই গোরস্থানে ও-নিয়ে কিন্তু পরিহাস করবার কেউ নেই। কারণ, মৃতরা সকলেই সিরিয়স্। মানবতার উপর বক্তৃতা শুনতে এরা ভালবাসে—এ আমি হলফ করে বলতে পারি—কারণ, এটা এদের মৃত-জাত সন্তান। না, না, এরা কেউ বোকা নয়। মানুষের জীবনে জমকাল পার্শ্ব-দৃশ্য অবতারণা করে যারা মানুষের বিরুদ্ধে তাদের নারকীয় নির্যাতন আড়াল করতে চায়, মানুষের অজ্ঞানতার আড়ালে থেকে যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী শক্তিমান হয়ে উঠে নির্মম হিংস্রতা চালায়, তারা আর যাই হোক্ বোকা নয়···' বলতে বলতে শয়তান হো হো করে হেসে উঠল—স্পষ্টবাদীর কর্কশ হাসি।

অসিতবরণ আকাশের গায়ে তারারা মিটিমিটি চায় গত-আয়ুব কবরের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে নিথর ঘনকৃষ্ণ পাথরগুলো। একটা গলিত পচা দুর্গন্ধ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে··মৃতের নিঃশ্বাস বাতাসে ভর করে ছোটে নিস্তব্ধ রাত্রির কোলে শায়িত ঘুমন্ত পুরীর পথে পথে।

'হ্যাঁ, মানব দরদীদেরও কেউ কেউ এখানে শুয়ে আছে বৈকি। এদের মধ্যে কেউ কেউ জীবিতকালে সত্যি সত্যি বিশ্বস্ত ছিল—জীবনে তো কতরকম অন্তঃবিরোধই রয়েছে এবং এটাও খুব বিস্ময়ের বিষয়ও নয়···এদেরই ও-পাশে যারা বেশ মিলে মিশে পরম শান্তিতে শুয়ে আছে, তারা হলো ঠিক আরেক রকমের লোক, আরেক রকমের জীবন-দর্শন শিক্ষক-যারা হাজার হাজার মৃতের কষ্টে ও পরিশ্রমে তৈরী এই পুরনো মিথ্যার বনিয়াদের নিচে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনার চেষ্টা করেছিল—'

একটা গানের রেশ ভেসে আসে দূর থেকে··গোরস্থানের ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে গড়িয়ে আসে দু'চারটে আনন্দের শব্দ। বোধ হয় কোন দিলখোলা লোক নিজের অন্ধকার কবরের গহ্বরে আনন্দচিত্তে গান গাইছে।

'দেখ, এখানে এই ভারী পাথরের নিচে যে মহা-পণ্ডিতের দেহ পচছে, তিনি জীবিত কালে শেখাতেন যে, সমাজটা হলো একটা বাঁদর কিংবা শুয়োরের বাচ্চার দেহের মতো—তুলনায় ঠিক কোন্‌টা বলেছিলেন, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। এই সমাজের মধ্যে যারা মাথা হয়ে থাকতে চায়, তাদের কাছে এই পাণ্ডিত্যের কিন্তু খুবই প্রয়োজন। এই সমাজের প্রায় রাজনীতিবিদরাই, এবং গুণ্ডাদলের সর্দারদের প্রায় সকলেই এই মতে বিশ্বাসী। যদি সমস্ত কিছুর মাথা হই আমি, ইচ্ছানুযায়ী যখন-তখন আমি হাত উঠাতে প্যারি। মাংসপেশীর স্বাভাবিক প্রতিরোধ আমি অতিক্রম করতে পারি—পারি না? হুঁ!...এইখানে যিনি ধুলোয় মিশে আছেন, তিনি জীবিতকালে বলতেন যে মানুষের ফিরে যাওয়া উচিত সেই সাবেক কালে যখন মানুষ চলাফেরা করত চার অঙ্গের উপর ভর করে, বাঁচত পোকা মাকড় খেয়ে। এই মহা-পণ্ডিতের মতে সেই আদিম যুগই বলে ছিল অত্যন্ত সুখের! সুন্দর দামী পোষাক পরিধান করে, দু' পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে, মানুষের আদিম পুরুষদের মত চুল দাড়ি গজাবার জন্য বক্তৃতা করা—কি বলে, তোমরা যাকে মৌলিক বলো, তাই নয় কি? সঙ্গীত ও কাব্য চর্চা, যাদুঘরে ঘুরে ঘুরে দেখা, দিনে কয়েক শ' মাইল ছুটে ভ্রমণ করা—এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণকে আদিম আরণ্যক জীবনে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেওয়া, হাতে পায়ে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বলা—বক্তৃতা হিসেবে চমৎকার, কি বল!...এই যে এখানে যিনি শুয়ে আছেন, জীবিতকালে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল জনসাধারণকে শান্ত রাখা। সাধারণের দুঃসহ জীবিকা-ব্যবস্থাকে এই মহান্ পণ্ডিতটি ন্যায্য বলে বলতেন কারণ তাঁর মতে অপরাধীরা তো সমাজের অন্যান্যদের মত নয়, তারা হলো দুর্বল চিত্তের মানুষ, একটা অদ্ভুত অসামাজিক প্রকৃতির। সমাজের এই সব স্বভাব-শত্রুরা সামাজিক নীতি ও নিয়মকানুন তো মানে না, সুতরাং এদের জন্যে অতশত কিছু

মানবার প্রয়োজন নেই। তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে, পাপ কার্যের সঙ্গে যারা জড়িত, মৃত্যুদণ্ড তাদের শোধরাবার একমাত্র উপায়। চমৎকার চিন্তাধারা! বন্ধুর অপরাধের জন্য কোন একজনকে দায়ী করা, অপরাধপ্রবণ বলে ছাপ মেরে দেওয়া—একেবারে নির্বুদ্ধি ব্যক্তির চিন্তা নয়। হৃদয়-বিধ্বংসী কুৎসিত জীবন-ব্যবস্থা সমর্থন করাব চেষ্টা করছে এমন লোক দেখা যায় অনেক সময়েই। এদের মধ্যে যাবা আবাব বেশী বুদ্ধিমান তারা তো কাবণ দেখিয়ে আসর জমান।·· অ—, হ্যাঁ, শহুরে জীবন-ব্যবস্থার উন্নতিব জন্য হরেক রকমের চিন্তাধারা সমাহিত বয়েছে এই গোরস্থানে·’

দৃষ্টি প্রসারিত কবে চারিদিক একবার দেখে নেয় শয়তান। মহাশ্মশানের মৌনতা ভেদ করে বিরাট কঙ্কালের আঙুলের মতো একটা শ্বেত গির্জার চূড়া মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নক্ষত্র খচিত ঘনকৃষ্ণ আকাশের নিচে···এই মহাজ্ঞানেব প্রস্রবনেব উপরে ঐ চিমনিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রশস্ত প্রস্তর প্রাচীর···মানুষের যত প্রার্থনা আর নালিশের তীব্র ধূম্র বেরিয়ে যায় ঐ চিমনি দিয়ে। বাতাসে বয়ে আসে পচনের দুর্গন্ধ, গাছের ডালগুলো দুলে ওঠে সে-দুর্গন্ধে, শুকনো মৃত পাতাগুলো ডাল থেকে ঝরে পড়ে নীরবে সমাজ-জীবনের স্বর্গীয় অধিদেবতাদের আবাস-ভূমেব উপরে···

স্মৃতি-সৌধের মধ্য দিয়ে সর্পিল পথ দিয়ে আমার আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে শয়তান বলে: ‘আচ্ছা, এক কাজ করা যাক! মৃতদের নিয়ে শেষ-বিচারের দিনের প্যারেডের একটা মহড়া করা যাক, কি বল! শেষ-বিচারেব দিন একটা আসবে এবং আসবে এই পৃথিবীতেই। সেদিনের সেই দিনটি মানুষেব কাছে সত্যিকারের একটা সুখের দিন হবে। যেদিন সব মানুষ বুঝতে পারবে কী সাংঘাতিক ক্ষতি করছে এইসব শিক্ষক ও সমাজের নীতি-নিয়ামকরা যারা মানুষের জীবনকে টুকরো টুকরো করে পরিণত করেছে তাকে

শুধু মাত্র রক্ত মাংসের দেহে, সেদিন আসবে সেই সুদিন। মানুষ বলতে আজ যা বোঝায়, তা হলো মানুষের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পূর্ণ সত্তার মানুষ আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি এদের কল-কাঠির দৌরাত্ম্যের জন্য। দুনিয়ার পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার স্তূপ থেকে সেই মানুষ উঠে আসবে ; সূর্যের কিরণ সমুদ্র যেভাবে গ্রহণ করে নিজের সত্তার সঙ্গে মিশিয়ে, মানুষও সেইভাবে সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে দ্বিতীয় সূর্যের মতো তার সব উজ্জ্বলতা নিয়ে পৃথিবীর উপর উদয় হবে। সেদিনের অপেক্ষায় আমি বসে আছি। সেই মানুষই আমি সৃষ্টি করব এবং সে-মানুষ একদিন আসবেও !'

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে যেন একটু অহঙ্কারের রেশ ফুটে ওঠে, ভবিষ্যতের বর্ণনা করতে গিয়ে গীতিকাব্যের ভাবধারায় যেন একটু অভিভূত হয়ে পড়লো সে। এরকমটি কিন্তু শয়তানের সচরাচর হয় না। শয়তানের এই বিচলিত ভাবকে আমি ক্ষমা করলাম। আর এই বিচলিত হওয়াটাও কি খুব বিস্ময়ের ? বর্তমানের জীবন-ব্যবস্থা শয়তানকেও দুমড়িয়ে দেয়, চারধারের বিষাক্ত ব্যবস্থা তারও সুগঠিত মনকে কুঁকড়ে খায়। তারপর আর-একটা কথা ··সকলের মাথাই তো গোলাকার, চিন্তাধারাগুলো সব কাস্নি মেরে চলে। আয়নায় নিজের মুখ দেখে তো প্রত্যেকেরই নিজেকে সুন্দর মনে হয়।

কবরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শয়তান হঠাৎ দাঁড়িয়ে রাজকীয় কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে ঃ

'বিজ্ঞ ও সাচ্চা কারা আছে তোমাদের মধ্যে ?'

নিথর নিস্তব্ধ চারিদিক। হঠাৎ আমার পায়ের নিচে মাটি দুলে উঠল, মনে হলো যেন নোংরা তুষার জমে উঠেছে পাহাড়ের চূড়ায়, যেন সহস্র বিদ্যুৎ তাই ফেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে : মনে হলো যেন একটা বিরাট দৈত্য তার গহ্বরের চারিদিক প্রকম্পিত করে নড়ে উঠছে। আমাদের চারধারের সব কিছু যেন নোংরা হলদেটে হয়ে উঠল ; ঝড়ের মুখে শুকনো খড়কুটোর মত গোরস্থানের চারদিক থেকে

কঙ্কালরা উঠে আসতে লাগল ; গোরস্থানের নিথর নিস্তব্ধতা মুহূর্তে শেষ হয়ে চারিদিক ভবে গেল হাড়ের মট মট শব্দে, সমাধিস্তম্ভের ও কঙ্কালগুলোর পবস্পরের হাড় ঠোকাঠুকিব খট খট শব্দে। গোবস্থানের চারিদিকে করোটি উঁচিয়ে বেবোতে লাগল কঙ্কালরা ; পবস্পরকে ধাক্কা মেরে তারা বেরিয়ে আসতে লাগল কবর থেকে। আমার চাবিদিকে কঙ্কালের পাঁজরগুলো ঘিবে ধরল·· সংকীর্ণ খাঁচায় আমি যেন বন্দী। কঙ্কালগুলোব কটিদেশেব ভীতিজনক বেবিয়ে-আসা হাড়েব ভারে তাদের পায়ের নলিগুলো কাঁপছে চারদিকে একটা মূক কর্মব্যস্ততাব আলোড়ন···সবকিছু যেন টগবগ করে ফুটছে···

হিমশীতল অট্টহাস্যে সবকিছু ডুবিয়ে দিয়ে শয়তান বলে উঠল ঃ

'দেখলে, দেখলে ! সবগুলো উঠে এসেছে, একটা কঙ্কালও আর নেই·· এমন কি শহরের নির্বোধগুলো পর্যন্ত উঠে এসেছে ! এদের জ্ঞানের ভাবে অসুস্থা বসুমতী তাঁব অভ্যন্তব থেকে সবগুলোকে উগরিয়ে বেব করে দিয়েছেন !'

ক্রমশঃ শব্দ বেড়েই চলে···একটা অদৃশ্য হস্ত যেন ভিজে স্যাঁত-সেঁতে জঞ্জালের মধ্যে কী একটা তন্ন তন্ন কবে খুঁজে বেড়াচ্ছে··

'পৃথিবীতে এত জ্ঞানী ও সাচ্চা লোক বাস কবত, তুমি আগে জানতে ?' পাখা দুটো বিস্তৃত করে শয়তান বলে উঠল। তারপব কঙ্কালদের উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস কবল সে :

'মানুষের উপকার তোমাদের মধ্যে কে সব থেকে বেশী করেছে ?'

বিরাট কডাতে ফুটন্ত তেলে ব্যাঙের ছাতা ফেলে দিলে যেরকম ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয় সেইরকম শব্দ উঠতে লাগল চারিদিক থেকে।

নাকী সুবে একটা কঙ্কাল বলে উঠল ঃ

'অনুগ্রহ কবে আমাকে একটু এগোতে দাও ভাই তোমরা !'

'প্রভু, আমি সেই লোক, আমি সেই লোক ! আমিই প্রমাণ করেছিলাম যে সমাজে একক ব্যক্তি হলো শূন্য, আর কিছু নয়—'

একটু দূর থেকে একটা প্রতিবাদ ভেসে এল :

'উঁহুঁ, উঁহুঁ, আমি তার থেকেও এগিয়ে গিয়েছিলাম প্রভু। আমি বলেছিলাম যে সমস্ত সমাজটাই হলো শুধু শূন্যের যোগফল এবং এইজন্যে জনসাধারণকে সব সময়েই কোন না কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হুকুমে কাজ করতে হবে।'

বেশ জাঁকাল মোটা গলায় আরেকজন চেঁচিয়ে উঠল : 'এবং গোষ্ঠী চালক হলো ব্যক্তি, নেতা—অর্থাৎ আমি।'

'তুমি কেন ?' কয়েকটি সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর একসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল।

'আমার কাকা ছিলেন রাজা !'

'অ ! তাহলে মহামহিমান্বিত হুজুরের কাকার মাথাটাই অকালে কাটা পড়েছিল !'

কোন এক রাজবংশধর গর্বিতকণ্ঠে বলে ওঠে :

'হ্যাঁ, রাজাদের মাথা ঐ ভাবে কাটা যায় বৈকি।'

'ও হো ! আমাদের মধ্যে তবে একজন রাজা আছেন ! কোন্ গোরস্থান এরকম রাজার গর্ব করতে পারে ?' আনন্দ-বিহ্বল ফিসফিসানি শোনা যায় একটি কঙ্কালের মুখ থেকে।

ন্যুব্জ মেরুদণ্ডের একটা কঙ্কাল জিজ্ঞেস করে :

'আচ্ছা, রাজারাজড়াদের হাড়ের রং বলে নীল হয়—?'

'শোন বলছি—' পা ঝুলিয়ে বসেছিল একটা কঙ্কাল, সে বলতে শুরু করল। পিছন থেকে আরেকটা কঙ্কাল চেঁচিয়ে উঠল :

'বাজারের সব থেকে ভাল পায়ের কড়া সারাবার মলম আমি আবিষ্কার করেছিলাম।'

'আমি ছিলাম একজন স্থপতি—' আর-একটা কঙ্কাল বলে উঠল আর-এক কোণ থেকে। একটা বেঁটে মোটা কঙ্কাল তার মোটা মোটা আঙুলের হাড় দিয়ে সকলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠে :

'হে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভাইসব ! তোমাদের নীতিবোধের চিকিৎসক

কে ছিল ভুলে গেলে? ছিলাম আমি। জীবনের দুঃখ দৈন্যের আঘাতে মনের উপরে যে ক্ষত হয় তার উপর সান্ত্বনার মলম প্রলেপ করে দিত কে? এই যে আমি। মনে পড়ে কি ভাইসব?'

বিরক্তি মেশানো কণ্ঠে একজন বলে উঠল: 'দুঃখ দৈন্য আবার কি? ওসব কিছু নেই···ওসব হলো মনের ব্যাপার·· সবকিছু তো শুধু মানুষের কল্পনার মধ্যেই বিরাজ করে···'

'··যে স্থপতি নিচু দরোজার বাড়ির পরিকল্পনা করেছিল ·'

'এবং মাছিমারা কাগজের উদ্ভাবক আমি!' আরেকটি কঙ্কাল বলে।

'হুঁ, যাতে গৃহ-প্রবেশের সময় কর্তার কাছে মাথা নুইয়ে প্রত্যেককে প্রবেশ করতে হয় –' সেই বিরক্তি মেশানো কণ্ঠ বলে ওঠে।

'প্রথম সুযোগ আমি পাব না কেন, ভাইসব! আড়ম্বরপূর্ণ অনিত্য যা কিছু চারিধারের, যা কিছু পার্থিব, তা ভুলে থাকার জন্য মনের খোরাক যোগিয়েছে আমার চিন্তাধারা –'

উখা-ঘষা কণ্ঠে কে একজন গুন গুন করে ওঠে: 'যা আছে—তাই তো থাকবে চিরদিন!'

একটা ধূসর পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল খঞ্জ কঙ্কাল একটা। তার পা-খানা সোজা করে টেনে তুলে সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে:

'ঠিক, ঠিক! কোন সন্দেহ নেই তাতে!'

গোরস্থান যেন হাটে পরিণত হয়ে গেল। পসরা বিকিকিনির হৈ-হুল্লোড় চিৎকার শুরু হয়েছে চারিদিকে। এ যেন চাপা-চিৎকারের পঙ্কিল নদী বয়ে চলেছে, যেন স্থূল অহঙ্কার ও দুর্গন্ধ দম্ভের দুকূলপ্লাবী বন্যা এসে নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে · যেন এক পচা দুর্গন্ধ জলাভূমির উপর উড়ছে এক ঝাঁক ডাশ···তাদের ভন ভন শব্দে এবং বোঁ বোঁ গুন্‌গুনানি ও কান্নায় চারিধার মুখরিত···এদের বিষদুষ্ট নিঃশ্বাসে ও নিচের কবরের বিষাক্ত বাষ্পে উপরের বাতাস ভরপুর।

শয়তানকে ঘিরে চারিধার থেকে কঙ্কালরা সব ভিড় করে আসছে··· ওদের দাঁতগুলো কড়মড় করছে, চোখের অন্ধকার গহ্বরগুলো শয়তানের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে আছে···শয়তান যেন লোনা মাংসের কারবারী।···এদের পুরনো স্মৃতি সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠে আসছে, বসন্তের বিষণ্ণ ঝরাপাতার মত যেন ভারী বাতাসে উড়ছে।

সবুজ চোখ মেলে শয়তান তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কঙ্কালদের এই কর্মব্যস্ততার বুদ্ বুদ্ ফাটা, তাকিয়ে দেখে তাদের ঐ হিমশীতল দৃষ্টি পড়ে হাড়ের গাদায় যে ফসফরাসের ঝিকিমিকি উঠছে সেই দিকে।

শয়তানেব পায়ের কাছে যে কঙ্কালটি বসেছিল, সে তার খুলির উপরে হাতের হাড় তুলে বেশ ছন্দোবদ্ধ ভাবে নাড়তে নাড়তে আস্তে আস্তে বলে উঠল :

'প্রত্যেক মেয়েরই এক-একটি পুরুষের আওতায় থাকা উচিত—'

এরই কথার মধ্যে আর-একটি কণ্ঠস্বর অদ্ভুতভাবে মিশে গিয়ে ফিসফিস করে বেরিয়ে এল : 'সত্য-জ্ঞান লাভ করা একমাত্র মৃতের পক্ষেই সম্ভব।'

আরেকটি ফিসফিসানির শব্দ শোনা যায় :

'আমি ঘোষণা করেছিলাম যে বাপ হলো মাকড়সার মত—'

'মানুষের জীবনটাই ভ্রম, শুধু ভ্রম, পূর্ণ অজ্ঞানতার আকর।' আরেকটি কণ্ঠস্বর।

'আমি তিন তিনবার বিয়ে করেছি এবং তিনবারই বৈধভাবে···'

'এবং প্রত্যেকবারই সে বেশ সুষ্ঠুভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করবার চেষ্টা করেছে!'

'হুঁ···এবং প্রতিবারই এক-একটি মেয়েকে নিয়ে—!'

হঠাৎ এই সময়ে একটা হলদেটে শতছিদ্র বিশিষ্ট কঙ্কাল এসে হাজির হলো। শয়তানের চোখ বরাবর তার প্রায়-ক্ষয়ে যাওয়া মুখটা তুলে বলে উঠল :

'আমি মরেছিলাম সিফিলিস রোগে। কিন্তু তা হলেও সামাজিক নীতিনিয়মের প্রতি আমার সম্মানবোধ ছিল। যখন দেখলাম যে আমার স্ত্রী আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আমি নিজে এই ব্যাপারটা তুলে ধরলাম বিচারালয়ে ও সামাজিক বিচার-বুদ্ধির দরবারে। স্ত্রীর এই চরিত্রদোষের জন্য বিচাব হয়েছিল…'

চারিদিক থেকে অন্যান্য কঙ্কালের ধাক্কা খেয়ে সে সরে গেল। চিমনিব ভেতরের বাতাসের গোঙানিব মতো আবার শুরু হলো একসঙ্গে কঙ্কালদের চাপা গুনগুনানি :

'আমি কিন্তু ইলেকট্রিক চেয়াব আবিষ্কার কবেছিলাম। এতে কষ্ট না দিয়ে বেশ সুষ্ঠুভাবে মানুষেব জীবন নিয়ে নেওয়া যায়··'

'মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি বলতাম মৃত্যুর পর তোমার জন্য রয়েছে স্বর্গীয় আনন্দ…'

'সন্তানের জীবন ও খাদ্য দেয় বাপ…বাপ হওয়ার পরেই মানুষ ঠিক পূর্ণ সত্তা পায়, তার পুব পর্যন্ত সে থাকে শুধু পরিবারের একজন হয়ে…'

একটা ডিম্বাকৃতি খুলিওলা কঙ্কালের মুখে তখনও কিছু কিছু মাংস লেগে ছিল। অন্যসব কঙ্কালের মাথার উপর দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল :

'আমি প্রমাণ করেছি কেন শিল্প-কলাকে সমাজের নানা ধরনের জগাখিচুড়ী মতবাদ, মন্তব্য, চলতি অভ্যাস ও প্রয়োজনেব সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে ' '

পাথরেব তৈরি একটা ভাঙা গাছেব স্মৃতি-সৌধের ওপরে পা ঝুলিয়ে বসেছিল একটি কঙ্কাল। সে বক্রোক্তি করে উঠল :

'বিশৃঙ্খলার মধ্যেই মাত্র মানুষের স্বাধীনতা থাকতে পারে—'

'কর্ম ও জীবনে যে লোক ক্লান্ত, তার পক্ষে শিল্প-কলা একটা ভাল ওষুধ…'

দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায় : 'জীবন মানেই কাজ, শুধু কাজ, এ কথা আমিই বলেছিলাম ··'

'বুঝলে হে, বই হওয়া উচিত ওষুধের দোকানের সুন্দর ছোট ছোট বড়ির বাক্সের মত।'

'কাজ করবে সকলেই কিন্তু সেইসব কাজের তদারক করার জন্য তাদের সকলের উপরে থাকা উচিত কিছু লোকের···'

'শিল্প-কলা হওয়া উচিত সংগতিপূর্ণ এবং নিঃস্বার্থ। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে আমি চাইব শিল্প কলার কাছে বিশ্রামের সঙ্গীত···'

শয়তান বলে ওঠে: 'কিন্তু আমি চাই সেই শিল্প-কলা যা শুধু সৌন্দর্যের উপাসনাই করে, অন্য কোন দেবীর পূজারী সে নয়। আমার ভাল লাগে যখন দেখি এই শিল্প সচ্চরিত্র যুবকের মত অমর অক্ষত সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখে। সেই আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য দেখতে চেয়ে জীবনের উপর থেকে চক্‌চকে আবরণ উন্মোচন করে দেখে যে, যে অনাবৃত জীবন দাঁড়িয়ে আছে সামনে তা হলো এক স্মরাতুর লম্পটের ···তার সমস্ত দেহটার উপরে দগদগে ঘা, দেহের ত্বক কুঞ্চিত – এ চিত্র দেখে তখন কেমন একটা উদ্দাম ক্রোধ, সৌন্দর্যের প্রতি উদগ্র অনীহা, জীবনের পাকের প্রতি তীব্র ঘৃণা জেগে ওঠে—হ্যাঁ, আমি চাই এই চিত্র, আমি চাই শিল্প-কলার কাছে এই জিনিসই। ··জান তো একজন সত্যিকারের কবির বন্ধু হলো শয়তান ও নারী –'

গুমটি-ঘরের ঘণ্টার বিলাপ উচ্চৈঃস্বরে গোঙাতে গোঙাতে গড়িয়ে চলে নির্জীব শহরের উপর দিয়ে, বিরাট পাখীর স্বচ্ছ ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার মত সে-বিলাপ অন্ধকারে অতীন্দ্রিয়। ঘুমন্ত প্রহরী হয়তো অলসভার শিথিল হাতে ঘণ্টির দড়ি ধরে টান দিয়েছে। ঘণ্টার কাংস্য আওয়াজ গলে গলে বাতাসে মিশে গেছে। কিন্তু এর শেষ রণন মিলিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে রাত্রির সজাগ সতর্ক ঘণ্টা স্পষ্ট ও তীব্রভাবে বেজে ওঠে। আর্দ্র বাতাস মৃদু কম্পনে শিউরে ওঠে আর কম্পমান ঘণ্টার গুন গুন শব্দের থমথমানির মধ্যে শোনা যায় হাড়ের মড়মড়ানী ও কঙ্কালের চাপা শুকনো কলকাকলি।

আবার শুনতে পাই সেই স্থূল অসহনীয় নিন্দাবাদ, সেই চটচটে এঁটেল ইতর কথাবার্তা, সেই জাকজমকপূর্ণ ভণ্ডামীর প্রগলভতা, সেই বিরক্তিপূর্ণ আত্মম্ভরিতার নির্লজ্জ লম্বা বক্তৃতা। সেইসমস্ত চিন্তাধারা যার মধ্যে শর্হবে লোকদের বাস করতে হয়, একে একে সবগুলো আওড়ানো হলো কিন্তু হলো না তার একটাও যা নিয়ে সত্যি সত্যি গর্ব করা যায়। মানুষের মনকে, মানুষের সত্তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে যেসব মরচে-ধরা শৃঙ্খল, সেগুলো সব কান-ঝালাপালা শব্দে ঝনঝন করতে লাগল কিন্তু মানুষের জীবনের সেই অন্ধকার বিদূরিত করবার জন্য যে আলো জ্বলে থাকে তার বর্ণনা একটিবারও হলো না।

আমি শয়তানকে জিজ্ঞেস করলাম: 'আচ্ছা. বীর যোদ্ধারা সব কোথায়?'

'তারা তো বিনয়ী ব্যক্তি, তাদের সমাধির কথা তো কেউ মনে করে রাখে না। জীবিতকালেও তারা অত্যাচারিত হয়, মরার পরেও এইসব কঙ্কালরা তাদের চূর্ণ করে দেয়।' পচনের তৈলাক্ত দুর্গন্ধের মধ্যে পোকার মত এদের কর্কশ স্বর আমাদের ঘিরে ধরেছে। তা সরিয়ে দেবার জন্য ডানা নাড়তে নাড়তে শয়তান উত্তর দিল।

একজন মুচী বলল যে, মুচী-সম্প্রদায়েব মধ্যে সেই সর্বপ্রথম চোখা-মুখো বুটের পরিকল্পনা করেছিল যার জন্য জুতো প্রস্তুত-কারীদের সকলেরই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। হাজার রকমেব মাকড়সার বর্ণনা দিয়ে যে-বৈজ্ঞানিক বই লিখেছিলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে দাবী করতে লাগলেন এই বলে যে, তিনিই হলেন বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ। নকল দুধের আবিষ্কারক যিনি তিনি দ্রুত-গুলিবর্ষী বন্দুকেব নির্মাতার প্রচার-মুখর বক্তৃতাকে থামিয়ে দিয়ে, তাকে ধাক্কা মেবে সরিয়ে দিয়ে ক্রোধে কাঁদতে শুরু করলেন। সাপের ফণার মত হাজার হাজার পিচ্ছিল সূক্ষ্ম দড়ির বাঁধন তাদের মগজের উপর যেন আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসতে লাগল। এবং হাজার মৃত,

তাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, নীতিবাগীশদের মতো বক্তৃতা শুরু করে দিল, জীবনের কয়েদখানার অধিকর্তাদের মতো নিজেদের কর্মকুশলতার বাণী শুনিয়ে আত্মবিনোদন শুরু করল।

শয়তান গর্জে ওঠে: 'হয়েছে, হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে! আর না ···তোমাদের এই বকববানি শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি . গোরস্থানের এই মৃতদের দেখে এবং সুষুপ্ত জীবিতদের গোরস্থান-শহরের সবকিছু দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।···হ্যাঁ, তোমরা সত্যের রক্ষক যারা, এবার সব কবরে ফিরে যাও দেখি—'

রাজার আদেশের সুর শয়তানের কণ্ঠস্বরে, যে-রাজা তার নিজের ক্ষমতায় নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

শয়তানের হুকুম শুনে ধূসর ও হলদে বস্ত্রগুলো ঘূর্ণীর-মধ্যে-পড়া রাস্তার ধুলোর মত উড়তে উড়তে গড়াতে গড়াতে হিসহিস শব্দে ছুটে চলল যার যার কবরের দিকে। অন্ধকার চোয়াল ব্যাদান করে কবরগুলো কঙ্কালগুলোকে মুখের মধ্যে গিলে নিয়ে হা বন্ধ করে দিল। একটা শব্দ উঠল প্রতিটি কবর থেকে, অলস ককানো শব্দ, পেটপুরে খাওয়ার পর শুয়োর যেরকম শব্দ করে সেইরকম। যে খাদ্যগুলো উগরিয়ে দিয়েছিল তাই আবার গিলে খেয়ে নতুন করে হজম করার কাজ শুরু করল পৃথিবী। মুহূর্তে সবকিছু মুছে গেল এবং স্মৃতিসৌধগুলো নড়েচড়ে আবার নিজ নিজ স্থানে শক্ত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ভারী ভিজে হাতের চাপের মত কেমন একটা দম-বন্ধ করা দুর্গন্ধ তখনও আমার গলায় চেপে বসে আছে।

হাঁটুর ওপর কনুই রেখে একটা স্মৃতিসৌধের উপরে শয়তান বসে তার কালো হাতের লম্বা আঙুল দিয়ে মাথা টিপতে থাকে। চারদিকের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে স্মৃতিসৌধ এবং সমাধিগুলোর উপর তার দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে···উপরের আকাশে তারারা জ্বল জ্বল করে; সেখানকার ঘন অন্ধকারও পাতলা হয়ে আসছে ··ঘণ্টার ধীর ধ্বনি সেখানে গিয়ে পৌঁছোয়···ঘুম থেকে জেগে ওঠে রাত্রি···

শয়তান ধীর কণ্ঠে বলে : 'দেখলে তো বন্ধু! কেমন বিপজ্জনক চট্‌চটে, বিষাক্ত, ছাতা পড়া বলদামোর উপর অকৃত্রিম ভণ্ডামো ও আঠালো অন্ধ ইতরামোর কাঠামোর মধ্যে তৈরি হয়েছে মানুষের মনকে আবদ্ধ করে রাখবার নিয়মাবলী, তৈরি হয়েছে একটা খাঁচা যার মধ্যে তোমরা সকলে বন্দী হচ্ছো বলির পাঁঠার মত...। মানুষের মনের মন্থরগতি এবং ভয় হলো ধর্মযাজকের পরিচ্ছদের উপরের নমনীয় দড়ির মত। তোমাদের কয়েদখানার খাঁচাকে এই দিয়েই আবদ্ধ করে রাখে। তোমাদের জীবনের সত্যিকারের অধিদেবতারা কারা জান? এই মৃতরা। জীবন্ত লোকেরা তোমাদের শাসক হলেও, তারা আসলে কিন্তু মৃতদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত। পার্থিব অভিজ্ঞানের গোমুখী হলো এই সমাধিস্থান। কিন্তু আমি কি বলি জান! আমি বলি যে, তোমাদের সাধারণ জ্ঞান-অভিজ্ঞান হলো ফুলের মতো; এবং এসব জন্মায় যে-মাটির উপরে সে-মটি উবরা হয় মৃতদেহের রস গ্রহণ করেই। মাটির নীচে মৃতদেহগুলো তো অতি শীঘ্রই পচে যায়। তবুও এইসব মৃতদেহেব অধিকারীরা জীবিতদের মনের কন্দরে চিরদিন বেঁচে থাকার কামনা করে। মৃত চিন্তাধারার শুকনো চূর্ণগুলো অতি সহজেই জীবতদের মগজ প্রবেশ করে থাকে। সেইজন্যেই, বুঝলে বন্ধু, তোমাদের সামাজিক অভিজ্ঞানের প্রচারক পণ্ডিতমশাইরা সর্বসময়েই মানুষের সত্তার অনিত্য সম্বন্ধে গাল ভরা বক্তৃতা কবে থাকেন।

শয়তান তার হাতটা উর্ধ্বে তুলে ধরে . তার সবুজ চোখ দুটো হিমশীতল নক্ষত্রের মত আমার মুখের উপর স্থির হয়ে থাকে।

'খেয়াল কবেছ কি বন্ধু, এই পৃথিবীতে সব থেকে তৎপরতার সঙ্গে কোন্ জিনিসটা প্রচার করা হয়ে থাকে? অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত নিয়ম বলে কোন্ জিনিসটার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘোষণা কবা হয়ে থাকে? সেটি হলো মানুষের জীবনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে রাখা ...একদিকে সাধারণের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা জিইয়ে রাখার

আইনী ব্যবস্থা রাখা, আর একদিকে সকলের আত্মার একাত্মতার উপর জ্ঞানের ধারা-বর্ষণ করা ··যারা শাসকগোষ্ঠী তাদের ইচ্ছানুযায়ী জ্যামিতিক নক্সায় যাতে এইসব একঘেয়ে আত্মার-ঐকাত্ম্যে-বিশ্বাসী সব মানুষের মনকে সাজিয়ে ফেলা যায়। এই সব ভণ্ডামিপূর্ণ উপদেশামৃত শিক্ষা দেয় গোলামী জীবনের তিক্ততা ভুলে গিয়ে মনিব গোষ্ঠীর হিংস্র কপটতার সঙ্গে সমঝোতা করতে; এদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিবাদ যাতে ভাষা না পায় তার জন্যই এই হীন চক্রান্ত। কি বলবে একে? মানুষের মুক্ত জীবনী শক্তিকে মিথ্যার গম্বুজের নিচে সমাহিত করে রাখবার হীন পরিকল্পনা ছাড়া এ আর কিছুই নয়···'

ঊষার ক্ষীণ আলো দেখা যায় দিকচক্রবালে। সূর্যের আলোর আশায় নক্ষত্ররা সব নীরবে আকাশের কোলে পাণ্ডুর হয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু শয়তানের চোখ দুটো যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'কি শিক্ষা পেলে মানুষ তার জীবন আরও সম্পূর্ণ, আরও সুন্দর করতে পারে?···সকলের একরকম অবস্থা এবং মনের উন্নতির বিভিন্ন ব্যবস্থা—এ হলেই দেখবে মানুষের জীবনে প্রস্ফুটিত হবে ফুল···পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধের রস পান করে বেড়ে উঠবে সেই ফুলের দল। উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠবার জন্য পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ ও সহৃদয় বন্ধুত্বই হবে এই রসপ্রস্রবনের মূলাধার। তখন দেখবে শুধু আদর্শ, শুধু চিন্তাধারা নিয়ে কত হৃদ্যতামূলক আন্দোলন···মানুষ থাকবে সব সময়েই সুহৃদ, বন্ধু হয়ে। তোমার কি মনে হয় এই ভবিষ্যৎ চিত্র অবাস্তব?— আমি কিন্তু বলি যে এইটেই ঘটবে!···'

পুব দিগন্তে তাকিয়ে শয়তান আবার বলে: 'দিন হয়ে এলো।··· মানুষের মনে যখন রাত্রির অন্ধকার, সূর্যের আগমনে কি তার জীবনে আনন্দ আসবে না? দিবসের আনন্দ উপভোগ করতে পারে কই মানুষ—প্রায় সকলেই তো ব্যস্ত থাকে জীবিকা অন্বেষণের চেষ্টায়···।

কেউ কেউ চেষ্টা করে এই প্রচেষ্টার কথা যত কম করে সম্ভব প্রকাশ করতে ; কেউ কেউ একাকী ঘুরে বেড়ায় মুক্তির সন্ধানে জীবনের এই হৈ-হুল্লোড় গোলমালের মধ্যে···কিন্তু এটা তাদের জীবিকা সংগ্রহের কঠিন বাস্তব সংগ্রাম থেকে পালিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই নয়। দুঃস্থ, আশাহত, একাকী জীবনের তিক্ততা তারপর তাদের চালিত করে এই অসঙ্গত সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে। এবং এইভাবে অনেক ভাল ভাল সাচ্চা লোক জঘন্য মিথ্যার দহে ডুবে যায়—প্রথমে শুরু করে না-বুঝেই, নিজেদের সঙ্গেই যে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাও তখন তারা ধরতে পারে না। কিন্তু এ অজ্ঞানতা কত দিন?···তারপরে বেশ বুঝে সুঝে স্থির মস্তিষ্কে নিজেদের পূর্ব বিশ্বাস ও আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে···'

উঠে দাঁড়ায় সে। তার বিরাট ডানা দুটো মেলে দাঁড়ায়।

'আমিও, বন্ধু, বিবাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খার পথে যাব···'

এবং, তাম্রঘণ্টার বিষণ্ণ ঢংঢং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, শব্দের রণন মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সে উড়ে গেল পশ্চিমের দিকে···

আমার এই স্বপ্ন কাহিনী আমি গল্প করলাম একজন আমেরিকানের কাছে। অন্যান্য আমেরিকানদের থেকে তাকে একটু বেশী মানব-গুণ বিশিষ্ট বলে আমার ধারণা হয়েছিল। আমার কাহিনী শুনে বসে বসে সে কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর একটু হেসে আনন্দের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল :

'বুঝেছি, বুঝেছি! শয়তান হলো কোন শবদাহ-কলের চুল্লী কোম্পানীর এজেন্ট! হুঁ, নিশ্চয়ই তাই! তার বক্তব্য থেকে শব যে দাহ করা দরকার এটাই বেশ পরিষ্কার ফুটে বেরিয়ে আসে।··· কিন্তু তোমাকে মানতেই হবে যে অত্যন্ত উপযুক্ত এজেন্ট সে! তার কোম্পানীর জন্যে সে মানুষের স্বপ্নে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছে···! সত্যিই উপযুক্ত এজেন্ট···'

অনুবাদ ।। পার্থকুমার রায়

র‍্যালফ্ ফক্স

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে স্পেনের মাটিতে ফ্যাসিবাদকে রুখবার জন্য র‍্যালফ ফক্স, কড্‌ওয়েল, জন কর্নফোর্ড, জেমস লার্ডনার ও আমাদের আরো বহু চেনা-অচেনা ভাই প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন গ্রাৎসিয়া লোরকা। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটার ফ্রাঙ্কো হরণ করেছে তাঁদের জীবন। কৃষ্ণ ধর 'স্পেনের সেই অগ্নিক্ষরা দিন' সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো··· স্পেনের গণতন্ত্রের জল্লাদ। এই গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের কয়টি বছর, গণতন্ত্রের শ্মশানবন্ধুদের সেই উন্মত্ত নৃত্য, স্পেনের মাটিতে রক্তের দাগের অশ্রুমাখা ইতিহাস এখনো মুছে যায়নি।···নন্-ইণ্টারভেনশানের ছদ্মবেশের আড়ালে ফ্রাঙ্কোর দস্যুদলকে পরোক্ষে সহায়তা করেছিল ইয়রো-মার্কিন শক্তির দল। সেই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে যৌবনের পতাকা উড়িয়ে, মুক্ত মানুষের জয়গানে স্পেনের আকাশ বাতাস মুখরিত করে উপস্থিত হয়েছিল ইণ্টারন্যাশানাল ব্রিগেড। নাৎসী শক্তিতে বলীয়ান ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াল ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসী, চীনা, জার্মান ও পোলিশ তরুণের দল। এদের কেউ শিল্পী, কেউ সাহিত্যিক, কেউ বা সদ্য কলেজে-পড়া আদর্শবাদী যুবক। সকলেই কাঁধে নিল বন্দুক। গণতন্ত্রের জন্য মহা আহবে প্রাণ দিতে। যুদ্ধের শিক্ষাও নেই সকলের, সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, রসদের যোগান দেবার মতো ক্ষমতাও তখন ছিল না রিপাব্লিকান সরকারের। তবু প্রাণের অদম্য ইচ্ছা-শক্তিতে, শান্তি ও গণতন্ত্রের পবিত্র সংগ্রামে, স্পেনের মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল:

Hold, Madrid, for we are coming,
I.B. men be strong·········
Side-by-side, we'll battle on-ward,
Victory will come!

···এক গভীর সংকটে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড স্পেনের মানুষকে সাহস দিয়েছিল, হেসে, গান গেয়ে প্রাণের অফুরন্ত যৌবন-প্রেরণার সুগভীর বিশ্বাসে। সে কষ্টের তুলনা নেই। ইণ্টারন্যাশনাল

ব্রিগেড স্পেনের মানুষের কাছে তখন একটি প্রতীক, পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংকল্পের একটি সিম্বল। পুরনো ভাঙাচোরা ট্রেনে, দশজনের জায়গায় কুড়িজন এক একটি কামরায় গাদাগাদি করে বসে, চাঁদের আলোতে গান গেয়ে, জলপাইয়ের অরণ্যের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে গেল ফ্রণ্টের দিকে। মাদ্রিদ আর কতদূর! গীর্জায় গীর্জায় স্পেনের মানুষ প্রার্থনা করত, প্রতি স্টেশনে এসে জানাত বন্ধুত্বের সম্ভাষণ: দরিদ্র, ক্ষুধার্ত গ্রাম্য শিশুরা এসে ভিক্ষা চাইত এক টুকরো রুটি, এক টুকরো সিগারেট।…এর পরিবর্তে তারা দিত কমলালেবু, বড় টসটসে পাকা কমলালেবু। সৈনিকরা তাদের ওপর রুটি আর সিগারেট বৃষ্টি করত। সেই বিষণ্ণ, ক্ষুধার্ত শিশু আর নারীদের দেখে সৈনিকরা উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠত:

Arise, ye prisoners of starvation!

স্টেশনে সমবেত জনতা মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে সুরে সুর মেলাত, জাগো অনশন-বন্দী যত, জগতের নিপীড়িত ভাগাহত। ট্রেন ছাড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের সেই গান, ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, মুখর করে রাখত প্রতিটি স্টেশান।…প্রাণচঞ্চল যৌবনের উত্তাপে, আদর্শের উজ্জ্বল প্রেরণায় লিঙ্কন ব্রিগেডের প্রতিটি স্বেচ্ছাসৈনিক সেদিন স্পেনের অপরিচিত প্রান্তরে স্পেনের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, রক্ত দিয়ে রুখতে ফ্যাসিজমের বিরাট দানবকে। কারণ তারা জানত ফ্যাসিজম থেকে পশ্চাৎপসরণ অসম্ভব।…অনেকেই প্রাণ দিলেন, কিন্তু পশ্চাৎপসরণ করেন নি কেউ। ছাউনিতে বসে এরাই গীটার বাজিয়ে কখনও গেয়েছেন:

Give me a home, Where the buf-falo roam,
Where the deer and the ant-elope play,
Where sel-dom is heard, a dis-couraging word,
And the skies are not cloudy all day.

এই স্বস্তি, শান্তি ও সুখ, এদের একার কামনার নয়, পৃথিবীর অগণিত মানুষের।" ('পরিচয়', ১৩৬৭, শ্রাবণ)

র‍্যালফ ফক্সের জন্ম ১৯০০ সালের মার্চ মাসে ইংল্যাণ্ডের হ্যালিফ্যাক্স-এ। অক্সফোর্ডে ছাত্র থাকাকালীন রুশ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সমাজের, আন্দোলনকে

তিনি গভীর মনোযোগে অনুধাবন করেন। অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে ১৯২০ সালে সোভিয়েত রাশিয়া সফরে যান। পরবর্তীকালে সমালোচক ও সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর অন্যতম প্রধান রচনা 'নভেল্ অ্যাণ্ড দা পীপল্' ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বাঙলায় এই গ্রন্থটির একটি তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ক্যাপটেন ইউথ (নাটক), পীপল্ অফ দা স্টেপ্‌স্, স্টরমিঙ হেভেন, লেনিন—এ বাওগ্রাফি, জেঙ্গিস খাঁ ইত্যাদি।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক বাহিনীর ইঙ্গ-আইরিশ শাখার রাজনৈতিক কমিশনার হিসাবে স্পেনের রণাঙ্গনে, করডোভার কাছে, লোপেরা নামে একটি গ্রামে জার্মান বিমানের আক্রমণে তিনি নিহত হন।

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত র‍্যালফ ফক্সের রচনার অনুবাদক, কবি প্রাবন্ধিক ও রাজনীতিক সরোজকুমার দত্ত সম্ভবতঃ সত্তরের দশকে রাষ্ট্রশক্তির গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন। সরোজ দত্তের জন্ম যশোরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম এ পাশ করার পর তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দেন সাংবাদিক হিসাবে। প্রফুল্ল রায় সম্পাদিত অগ্রণী পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় তাঁর 'ছিন্ন কর ছদ্মবেশ' লেখাটি প্রকাশিত হয়, তারপর দ্বিতীয় বর্ষে লেখেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। ১৯৪২ সালে প্রফুল্ল রায়ের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা বের হলে কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'অরণি' প্রকাশিত হয়। সরোজ দত্ত তখন অরণির একজন নিয়মিত লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে তিনি রমাঁ রলাঁর I Will Not Rest-এর অনুবাদ করেন 'শিল্পীর নবজন্ম' নামে। বইটি সাড়া জাগায়। ১৯৪২ সালে প্রগতি লেখক সংঘ থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন গড়ে ওঠে। সরোজ দত্ত ছিলেন এই সংগঠনের অন্যতম একজন সংগঠক। ১৯৪৪ সালে যুগান্তর এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় শ্রমিক কর্মচারী এবং সাংবাদিকদের সম্মিলিত ইউনিয়ন গঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সরোজ দত্ত, সন্তোষ দেব, ফুলেন পাল ও হরিপদ চৌধুরী। ১৯৪৬ সালের ধর্মঘটে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই ধর্মঘট শুরু হবার মাত্র দু চারদিন পূর্বে তিনি শ্রীমতী বেলা

দেবীকে বিবাহ করেন। তখন দেশবিভাগ এবং দাঙ্গা চলছে। এই সময় ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ইন্দোচীনে মুক্তি যুদ্ধ চলছিল।

'রয়টার' নামে সংবাদসংস্থা মুক্তিযোদ্ধাদের তখন 'Bandit' বলে অভিহিত করে। অমৃতবাজার, ও যুগান্তর-এর মালিকও বলে এদের 'Bandit' বলেই লিখতে হবে। নোটিশ বোর্ডে সার্কুলার ঝোলানো হয়। কর্মীরা সেই সার্কুলার ছিঁড়ে ফেলে। তারা লিখতে চায় 'দেশপ্রেমিক'। মালিককে শেষপর্যন্ত মাথা নত করতে হয়। এরপর মালিক পক্ষ শ্রমিক এবং কর্মচারীদের উচিত পাওনা না দিয়ে উল্টে আক্রমণ শুরু করে দেয়। ইউনিয়ন প্রতিবাদ করে। পত্রিকার ছ'জন কর্মীকে সাসপেণ্ড করা হয়। অমৃতবাজার ও যুগান্তরের এক হাজার কর্মী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। প্রেসের সাধারণ কর্মচারী থেকে সরোজ দত্তের মতো নিপুণ সাংবাদিককেও সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। পরে বহু লোকের চাকরি যায়, সরোজ দত্তও তাঁদের মধ্যে একজন। এর পরে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'সত্যযুগ' প্রকাশিত হয় কিন্তু সরোজ দত্ত এখানে আর যোগ না দিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যান। এই সময়ে তিনি 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯৫০ সালে 'স্বাধীনতা' পুনর্বপ্রকাশিত হলে তিনি এই পত্রিকায় যোগ দেন। পার্টি ভাগের পর (১৯৬২) জেল থেকে বেরিয়ে তিনি 'দেশ হিতৈষী'-তে লিখতে শুরু করেন। নকশালবাড়ির ঘটনার পর 'দেশব্রতী' প্রকাশিত হয়। 'দেশব্রতী'-র সম্পাদক ছিলেন সুশীতল রায়চৌধুরী কিন্তু এই পত্রিকা পরিচালনায় সরোজ দত্তের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। সম্প্রতি সরোজ দত্তের একটি কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

এশিয়ার স্বপ্ন

র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স

রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, আমি আবার লোহার পাহাড়ে উঠিয়াছি। অন্ধকার, মাথার উপর মখমলের মতো আকাশে অসংখ্য তারার বুটি। পায়ের নীচে অস্পষ্ট ভূভাগ ও জলরাশির মধ্যে রহস্যময় বহু পথরেখা কোন অজ্ঞাতে বিলীন হইয়াছে বুঝিবার উপায় নাই। আবার সাগরের কূল বাহিয়া রাইম হ্রদ ও কামিস্‌লি বাসের বুকের উপর, অক্ষাত্রিসের বদ্বীপ ঘিরিয়া যেন এক ত্রস্ত নিস্তব্ধতার রহস্য-যবনিকা নামিয়াছে।

কবরগুলি ঘিরিয়া যে মাটির দেয়াল উঠিয়াছে তারই পশ্চাৎ হইতে কে যেন বাহির হইয়া আমার খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল নীল অনন্তের দিকে, যেন সে উহার সবটুকুই নিঃশব্দে আত্মসাৎ করিয়া প্রত্যাসন্ন প্রভাতের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিতে চাহে। লম্বা খালাৎ-পরিহিত তাহার দীর্ঘ-দেহে সম্রাট সুলভ শক্তির সুষমা, এক কটি হইতে একখানি বাঁকা তরবারি। তথাপি মনে হইল, তাহাকে চিনি। লুব্ধ নির্নিমেষ নেত্রে সে চাহিয়া রহিল, আমার মনে পড়িল জুডিয়া পাহাড় সম্বন্ধে রেনানের একটি কথা। রেনান বলিত জুডিয়া-পাহাড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া চারিপার্শ্বের সমতল ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে মনের মধ্যে আসে পৃথিবীর বিশালত্বের অনুভূতি আর বুকের মধ্যে আসে এই পৃথিবীকে করায়ত্ত করিবার দুর্বার বাসনা। আমার মনে হইল লোকটির মধ্যে এই অনুভূতিই আসিয়াছে। স্থির করিলাম, লোকটির সঙ্গে আলাপ করিব। মনে মনে বুঝিয়াছিলাম, লোকটি কোনাট ছাড়া আর কেহই নয়। নিকটে গিয়া সম্ভাষণ জানাইলাম—'আমন'। পরিচিত অবিচলিত কণ্ঠে লোকটি প্রতি সম্ভাষণ জানাইল, 'আমন'।

সাহস করিয়া ডাকিলাম, 'কোনাট'। ডাক শুনিয়া লোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু একি, কোথায় কোনাট। কোনাটের পরিবর্তে

আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্‌। মহাতেজা তেমারলিন্‌, যিনি এশিয়াকে আপনার স্বপ্নের আদর্শে নতুন ভাবে গড়িয়াছিলেন।

তৈমুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখানে কি করছ?'

'এ বিষয়ে আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি না তৈমুর। বিকালের গরমেঃএখানে নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি, তুমি তোমার ঐ নির্নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে অসীমের কবল থেকে কি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছ?'

'একটি নারীমূর্তি, যে নারীর প্রতি আমি অবিচার করেছি।'

'আমিও খুঁজে বেডাচ্ছি আমারই নিগ্রীহিতাকে', গভীর কণ্ঠস্বরে চমকিয়া ফিরিতেই দেখি আক্‌বালা। সেই খর্বাকৃতি, বলিষ্ঠ শ্রম-সহিষ্ণু আক্‌বালা। কিন্তু সেও নিকটে আসিতে আর আক্‌বালা রহিল না, দেখা দিলেন তেমুজ্জিন, জগৎসম্রাট জেঙ্গিস্‌ খান।

তৈমুর বলিয়া চলিল, 'আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমার মহিমময়ী পত্নী বিবি হানিমের ছায়াকে। আমি তখন পশ্চিমে সুলতান বাহাজের সঙ্গে লড়াইয়ে মেতে, পদানত করে চলেছি রোমের অধিবাসীদের। বিবি হানিম তখন আমার প্রতি ও আমার খ্যাতির প্রতি অক্ষয় অর্ঘ্য নিবেদনের উদ্দেশ্যে এক মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। সে মসজিদের প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের তোরণ হবে দীর্ঘতম ও সুন্দরতর, কারণ তখন আমার খ্যাতি ও হানিমের সৌন্দর্যের তুলনা তখনকার জগতে অমিল। তার এই স্বপ্নকে রূপ দিতে সমরখন্দে এল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ স্থপতি, এক তরুণ আরব। বিস্মিত জনসাধারণের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে, স্বর্গের তোরণ দ্বারের মতো অতুলনীয়, অপার্থিব সৌন্দর্যে এই মসজিদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। বিবি হানিমের হুকুমে তৈরী তৈমুরলঙ্গের খ্যাতিস্তম্ভ এই মসজিদের সৌন্দর্য-ব্যাখ্যা চলল দিন রাত। কেউ দেখে গেল নির্বাক বিস্ময়ে, কেউ বলল তৈমুরলঙ্গের রক্তাক্ত দিগ্বিজয়ের কোনো

স্মৃতিসৌধ এর পূর্বে আর এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য লাভ করেনি। কিন্তু নির্মাণ কাজ এত ধীরে ধীরে এগুতে লাগল যে, বিবি হানিমের ভয় হল পাছে আমার ফিরবার আগে তৈরী শেষ না হয়। প্রতিদিনই তিনি তরুণ শিল্পীকে ডাকিয়ে দ্রুত সমাপ্তির তাগিদ দিতেন, কিন্তু সে শুধু তৃষ্ণার্ত দুই চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলত, জগতের শ্রেষ্ঠা মহিষীর হুকুমেও সৌন্দর্য বিকশিত হবে না। শেষে একদিন অধীর হয়ে তিনি বললেন, বলো, বলো হে সৌন্দর্যস্রষ্টা কার হুকুমে তোমার সৌন্দর্য দ্রুতবিকাশের পথে ছুটবে? শিল্পী জবাব দিল, একমাত্র প্রেমের হুকুমে। মহিষী বুঝলেন। অন্তরে অন্তরে তিনি অনেক দিন থেকেই বুঝেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমার স্বামী ফিরবার আগে মসজিদ তৈরী শেষ করতে কী চাও তাহলে তুমি? শিল্পী জবাব দিল, ওই অধরে একটি চুম্বন মাত্র। অস্থিরা মহিষী তার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন বটে, কিন্তু সেই চুম্বনের আগুন বিবি হানিমের ওষ্ঠাধরে দাহচিহ্ন রেখে গেল, আর সেই তপ্ত আলিঙ্গন থেকে তিনি ফিরে এলেন জীবন্মৃত অবস্থায়।

'আমি যখন ফিরে এলাম, তখন মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। সমগ্র জগতের সাথে আমিও নির্বাক বিস্ময়ে এই সৌন্দর্য দেখলাম, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আমারও মনে হল এই উন্মত্ত সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে তৈমুরের দিগ্বিজয় নয়, অন্য কিছু আছে। পত্নীর ওষ্ঠাধরের দাহচিহ্নে সহজেই বাকী কাহিনীটুকু পড়ে ফেললাম, মুক্ত তরবারি হাতে ছুটলাম তরুণ স্থপতির সন্ধানে। আমার শহর সমরখন্দকে বহু নিচে রেখে, সাদা পাহাড় চূড়ার মুখোমুড়ি দাঁড়িয়ে তারই হাতে গড়া মসজিদের শিখরে সে পালিয়েছিল। খোলা তলোয়ার হাতে আমাকে আসতে দেখে সে একটা বুনো চিৎকার দিয়ে ঝাঁপ দিল শূন্যে, সে চিৎকার আনন্দের, না ভয়ের না ভালোবাসার জানি না, কারণ সবজান্তা আল্লা তাকে মাঝপথে লুফে নিয়ে একটি ঘুঘু পাখী করে উড়িয়ে দিলেন।'

জেঙ্গিসের ছায়ামূর্তি কথা বলিল,—'কি করলে তখন তুমি, তৈমুর? আল্লার এই বিচিত্র লীলায়ও কি তোমার উন্মত্ত হৃদয় শান্ত হল না?'

মাথা নাড়িয়ে তৈমুর জবাব দিলেন, 'না, তোরণ দ্বারের সেই জমাটবাঁধা সঙ্গীতকে আমি ভেঙ্গে নতুন করে, আরও দীর্ঘ আরও সুন্দব করে, আমাব খ্যাতির উপযোগী করে মসজিদ গড়লুম। কিন্তু সে সৌন্দর্য আব ফিবে এলো না। নারী মহিমাব উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতাকে আমি নিজেব হাতে ছিঁড়ে ফেলেছি। আমারই মহিমময়ী পত্নীর প্রতি এই আমার অবিচারেব কাহিনী।'

জেঙ্গিস খাঁ আমারই পাশে বসিযা রাত্রিব অন্ধকাবের মধ্যে দুই হাত প্রসারিত করিযা বলিয়া উঠিলেন, 'আমিও সৌন্দর্যেব পায়ে পাপ কবেছি, যদিও তোমাব মতো এতো সাংঘাতিক পাপ নয়, তবু এ পাপের স্মৃতি অহবহ আমাকে বেদনা দিচ্ছে, পায়ের তলায় ফুটে থাকা ছোট কাঁটাব মতো। আল্লাব আদেশে নিজের মর্জিমতো দুনিয়াকে আমি গড়ে ছিলাম, এবং তোমার কাজের মতো, এ কাজও চিরদিন টিকবে, তবু ঐ একটা সামান্য স্মৃতির তাড়নায় আমি কিছুতেই স্বস্তি পাইনে।'

তৈমুর বললেন, 'শোনাও তোমার কাহিনী।' পশ্চিমে রাইম হ্রদের তীরে বহুদূরব্যাপী পর্বতশ্রেণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জেঙ্গিস্‌ খাঁ বলিতে লাগিলেন. 'ঐ পাহাড়ের ওপারে খোবাস মিঞাকে তখন সবে মাত্র পরাজিত করে আমি সমরখন্দে তাঁবু গেড়েছি। আমার ছেলে জাউজি সুলতানের কতকগুলি তরুণী-গায়িকাকে বন্দিনী করে আমাকে উপঢৌকন দিয়ে গেল। কেন্দ্‌ জেন্দ্‌ কীজা নামে তাদের একজন ছিল অসামান্যা সুন্দরী। নারীসৌন্দর্যের উপাসক আমি কোনদিনই না, তবু আমাকেও স্বীকার করতে হল যে দেহসুষমায় মালভূমির কৃষ্ণসারও এর কাছে লজ্জা পাবে। আমার পাশে বসেছিল সমরখন্দের চোখের চিকিৎসক জিন। সে আমার

দুরারোগ্য এক চোখের ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছিল। তার লোহার ফ্রেমে-আঁটা চশমার আড়ালে দুই চোখে একটা কুৎসিত লালসা জ্বলে উঠল। কামাতুর বৃদ্ধ তখন আমার কাছে এই মেয়েটিকে ভিক্ষা চাইল। কৃতজ্ঞ আমি তৎক্ষণাৎ সে ভিক্ষা পূরণ করলাম। মেয়েটি তখন ঘৃণাভরে একবার তার দিকে তাকাল, তারপর পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল বৃদ্ধ সুলতানের বিশ্বাসঘাতক উজীর মিধাম-ইল-মুলুকের ঘরে। তিন চারদিন সে সেখানে রইল। সুলতানের কথা, তার তরুণ ছেলেদের কথা, তার অস্তমিত গৌরবের কথা বলত সে সেই বিশ্বাসঘাতক উজীরের সাথে। তার সাথে সুরা ও সম্ভোগে দিন কাটাত। জিন্ করল আমার সাহায্য প্রার্থনা। আমি জোর করে মেয়েটিকে তার হাতে সঁপে দিলাম ও মিধাম-ইল মুলুকের তৃষিত রক্ত থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিলাম।

'সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য কদর্য বার্ধক্যের সাথে সুন্দর তারুণ্যকে আমি এইভাবে অশুভ বন্ধনে বেঁধেছিলাম। মালভূমির কোনো ঝোপের ভিতর চলতে গিয়ে পায়ে বেঁধা সামান্য কাঁটার মতোই এ ঘটনার স্মৃতি, এখনো অহরহ আমার বুকের মধ্যে বেঁধে।'

তাঁহাদের কাহিনী শেষ হইয়া গেলে আমরা তিনজনে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রাত্রির পানে তাকাইয়া স্থির হইয়া রহিলাম। দুঃখভারাক্রান্ত এই দুই সম্রাটের নিকট একটি প্রশ্ন করিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম: 'শুধু কি এইটুকুতেই তোমাদের আত্মার শান্তি নষ্ট হইয়াছে? নরহত্যা, নগরধ্বংস, যুদ্ধের সংহারলীলা এ সবের জন্য কি এতটুকুও মন খারাপ হয় না? কেবল কি দুটি সুন্দরী নারী নিগ্রহের স্মৃতিই তোমাদের দেহান্তরিত আত্মাকে রাত্রির অন্ধকারে অস্থির করে তুলেছে?'

জেঙ্গিস খাঁ কথা কহিলেন না, উত্তর দিলেন তৈমুর, 'সৌন্দর্যের কাছে আমি যে পাপ করেছি, কেবল তার জন্যই আমার অনুশোচনা। যে হত্যা এবং ধ্বংসের জন্য তুমি আজ আমায় তিরস্কার করছ, তার

জন্য আমার বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই, বরঞ্চ আছে আনন্দ, কারণ শিল্পে, স্থাপত্যে, কথার চাতুর্যে অনেকে মিলে যা করেছে, তার অনেক বেশী করেছি আমি এই তরবারি দিয়ে।'

'কিন্তু সংখ্যাতীত নিহতের ছায়ামূর্তি কি তোমাদের তিরস্কার করে না? মানুষকে হত্যা করে মানুষ তার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে এই কি সুবিচার।'

অধীর হইয়া জেঙ্গিস খাঁ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—'বোকার মতো কথা বলছ তুমি। যে কাজ আমি করে এসেছি সে পাকা কাজ, তার জন্যই জীবন দ্রুততর চলতে শিখেছে। কারা, এই মৃতেরা? এদের কেউ কিম্বা সকলেই যদি বাঁচত তা হলে জগত কি আরো ভালভাবে আরো সুষ্ঠুভাবে চলত? হয়ত তাদের ভেতর কেউ ছিল সাধু, কেউ ছিল জ্ঞানী। কিন্তু জীবনের সৃষ্টিশক্তি অফুরন্ত, সাধু-জ্ঞানীর অভাব কোনো দিনই হয়নি। শিল্পী ও কারিগরকে আমি চিরদিনই বাঁচিয়ে এসেছি। বাকির অভাবে জগতের বিশেষ কিছু যায় আসে না। ধরো কালই মহামারীতে যদি তোমার দেশের শিল্পী কারিগর বাদে আর সবাই শেষ হয়ে যায়, তাদের অভাবে জগত এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকবে?'

উত্তর দিলাম, 'হয়তো না, জীবন কতটুকুই বা, আর এই সামান্য জিনিসটুকুর ব্যবহারই বা কজনে করে।'

'ঠিক বলেছ তুমি। তাদের মাটি হিসেবে ব্যবহার করে এই যা আমি গড়ে তুলেছি, তা আল্লার কাজ। আমি এশিয়াকে দিয়েছিলাম শান্তি, দিয়েছিলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের শক্তি, প্রাচ্যকে সম্মিলিত করেছিলাম পাশ্চাত্যের সাথে, পাশ্চাত্যের কেউ যদি আমার মতো দেখতে পারত তাহলে এই সম্মেলন আর ভাঙত না।'

তৈমুর বললেন, 'আমিও ঈশ্বরের কাজ করেছিলাম। ইসলামের রক্ষানায়ক, ধর্মের তরবারি আমি, আমিই ইসলামকে এশিয়ার সর্বশক্তিমান করেছিলাম। তার সমগ্র সৌন্দর্যের জন্মদাতা আমি।'

যারা তাকে ঘৃণা করে তারা তাকে চেনে না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বন্ধু, ইসলাম কি সুন্দর নয়? এশিয়ায় তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে আমি কি অপরাধ করেছি?'

বললাম, 'ভালোই করেছ। তোমাকে উপলক্ষ্য করে আল্লার হাত দুর্বার বেগে কাজ করে গেছে। বিরাট দিগ্বিজয়ী তোমরা দু'জন তোমাদের স্বপ্নকে রূপ দিতে গিয়ে কোনো দ্বিধা, কোনো সংকোচকে মনে স্থান দাওনি। যে সৌন্দর্যকে সকলেই ভোলে, তোমরা বিজয়ী হয়েও তাকে ভোলোনি। তোমরা আমার প্রণাম গ্রহণ কর।'

তৈমুর হাসিলেন, 'যাকে সবাই ভোলে তাকে ভুলিনি বলেই আমরা দিগ্বিজয়ী। দিগ্বিজয়ী আর্টিস্ট।—কিন্তু ও কে?'

পাথরের উপর লাঠির শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলাম একখানি লোহা বাঁধানো লাঠিতে ভর দিয়ে ফেডর ইগন্যাটিক্ আমাদের দিকেই আসিতেছে; তাহার পিছনে আসিতেছে আর একজন, তার মুখ দেখিয়াই অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিলাম। একি স্টেকভ্, সে তো জাগানভের অনিষ্ট করতে পারে। রিভলভারটি তুলিয়া লইলাম। স্টেকভ্ একটি হাত তুলিয়া কঠিন কণ্ঠে আদেশের সুরে বলিল, 'রেখে দাও রিভলবার, যাকে ভাবছ আমি সে নই।' সত্যই তো স্টেকভ্ আর নাই, তাহার দেহ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার মুখ আরো পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, এবার আর সন্দেহ নাই, ইনি ভ্লাদিমির লেনিন। ইতিমধ্যে জাগানভেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, অদ্ভুত পোশাক দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনি আইভান দি টেরিব্‌ল্।

আইভান বসিয়া পড়িয়া সম্রাটদ্বয়কে তীক্ষ্ণভাবে দেখিতে লাগিলেন। 'এখনো আছ এখানে, পুরানো শত্রুরা। আমিই রাশিয়ার প্রথম অভিষিক্ত জার, আমিই তোমাদের বংশধরদের হাত থেকে কাজান ও আস্ত্রাখান ছিনিয়ে নিয়েছিলাম।'

জেঙ্গিস হাসিলেন মাত্র, তৈমুর সালাম করিয়া কহিলেন, 'সে আমার পরের আমল হে, রাশিয়ার প্রথম জার। অত সহজে আমার

জায়গা আমি ছাড়িনি। আমার দিগ্বিজয়ী রূপ তোমার মস্কোর ডিউক ভালোভাবেই জানত!'

একটু নির্মম হাসিয়া জেঙ্গিস বলিলেন, 'আমার জারজপুত্র জাউজি তোমার নারীদের শয্যাসঙ্গিনী করেছিল, কোথায় ছিলে সেদিন, হে সাদা জার!'

আইভান বলিলেন, 'তার শোধ আমরা নিয়েছি। প্রাচ্যের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যকে আমি জাগিয়ে তুলেছিলাম। রাশিয়াকে একটা জাতিতে পরিণত করে তার সীমান্তরেখা এশিয়ার বুকের উপর বহু দূর বিস্তৃত করেছিলাম। আলেকজান্দারের পর প্রাচ্য অভিযানে আমি পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ নায়ক। তোমাদেব চীনের প্রাচীর পর্যন্ত আজ আমাদের দখলে।'

এমন সময় দলের মধ্যে লেনিন আসিযা দাঁড়াইলেন। তাহার মুখ আগুনের মতো উজ্জ্বল। 'আজ আমরা এক। বাশিয়া আর রাশিয়া নয়, আইভান যে কাজ শুরু কবেছিলেন, আমি তা সমাপ্ত করেছি। আজ পুব ও পশ্চিম সম্মিলিত হয়েছে মস্কোতে। এক দিকে হিন্দুকুশ ও অন্যদিকে চীনের মহাপ্রাচীর পর্যন্ত এই মালভূমি আজ স্বাধীন। প্রতীচ্য আবার জেগে উঠেছে। আমাদের চারজনের জীবন বৃথা যায়নি।'

লেনিনের চোখে তখনো যেন স্টেকলভের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। আমি বলিলাম, 'ভ্লাদিমির ইলিচ, তোমাকে চিনতে পারিনি, ভেবেছিলাম কোনো চোর কি দুর্বৃত্ত। তোমার কাজে তুমি এই চোর দুর্বৃত্তদের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছ। তুমি যা বলেছ তা যদি মেনে নি, তাহলেও কেমন করে তুমি এই দিগ্বিজয়ীদের পাশে দাঁড়াও। তোমার পশ্চাতের ইতিহাস-পথ হত্যা ও দুর্ভিক্ষে দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাদের আমি বুঝতে পারি, তাদের ছিল সৌন্দর্যের স্বপ্ন, আর সাথে ছিল ঐ স্বপ্ন সফল করবার শক্তি। কিন্তু তোমরা? সেই জার্মান ইহুদির ধর্মবাণী!'

গর্বোন্নত কণ্ঠে লেনিন উত্তর দিলেন, 'এই তো জীবনের বাণী। উৎপাদন ও সংহার নিয়েই জীবন। জীবনের গতিরূপ, উৎপাদনের গতিরূপ। জীবন প্রেম, উন্মাদনা ও সৃষ্টি, এই মালভূমির মতোই জীবন বিপুল, অনন্ত প্রসার, অনন্ত প্রাণবান ও অনন্ত বিচিত্র। বেঁচে থাকতে হলে চাই দিগ্বিজয়, চাই সংগ্রাম, চাই উৎসব, চাই দুঃখ, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে খুঁজতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে। সম্ভোগলালসা, পাপ, প্রেমের সঙ্গে এদেরও প্রয়োজন, জীবনের পক্ষে নিদ্রার প্রয়োজনের মতো, বড় কম নয়। এরাও উৎপাদনের উপকরণ, তাতে লজ্জার কিছু নেই, কারণ এরাও অস্তিত্বের মহিমার অংশভুক্ত, পরিবর্তনশীল রূপ ও গতিতে এদেরও বিশিষ্ট দান আছে। মানব ও যন্ত্রের সম্মেলনে উৎপাদন, মানব ও মানবীর সম্মেলনে সন্তান। প্রেমের মতো কর্ম ও কামনায় জীবন সৃষ্টি। আমি সংগ্রাম করেছি উৎপাদনের শক্তিকে মুক্ত করতে, কর্মকে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিতে। এই আমার বাণী, হোক না তা জার্মান ইহুদির মুখনিঃসৃত, এই তো ঈশ্বরের বাণী।'

জেঙ্গিস বলিলেন, 'সম্পূর্ণ সত্যি। মানুষের মতো, মালভূমির সন্তানের মতো কথা।'

তৈমুর পূর্বদিকে মুখ ফিরাইলেন, এক এক করিয়া তারাগুলি অস্ত যাইতেছে। পূর্বাকাশে প্রত্যাসন্ন উষার শ্বেত আভাস। 'রাত্রি শেষ হয়ে এল, যাবার আগে চীৎকার করে আমি জগৎকে এই কথা জানিয়ে যেতে চাই, এই মালভূমি—যেখানে বসন্তে ফোটে ফুল, নিদাঘে জ্বলে অগ্নিশিখা আর শীতে আসে তুষারের নিঃসাড়তা, এই মালভূমিকে আমি ভালবাসি।' আইভান ও জেঙ্গিস তৈমুরেরই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন, 'আমিও,' 'আমিও'।

লেনিন বলিলেন, 'আমি এই মালভূমির সন্তান।' সার্পেন্টাইনের পিছন হইতে সূর্য উঠিল, আমি একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অনুবাদ ॥ সরোজকুমার দত্ত

"জেম্স্ ফিলিপ লার্ডনারের জন্ম শিকাগোয়, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮-ই মে। চারভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর পিতা রিঙ লার্ডনার প্রখ্যাত আমেরিকান ছোট গল্পকার। নিউ ইঅর্কের গ্রেট নেক-এ একটি স্কুলে জেম্স্ লার্ডনারের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তারপর তিনি ম্যাসাচুসেট্স্-এর অ্যাণ্ডোভারে ফিলিপ্স্ একাডেমিতে প্রবেশ করেন। আমেরিকার সবচেয়ে খ্যাতনামা প্রিপারেটরি স্কুলের মধ্যে অন্যতম এই ফিলিপ্স্ একাডেমি। ১৯৩১ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ উজ্জ্বল ছাত্র, বিশেষ করে ইংরাজী ও উচ্চ গণিতে। তাছাড়া তিনি কলেজের রাগবী, ল্যাক্রোসে ও মুষ্টিযুদ্ধের টিমের খেলোয়াড় ছিলেন। ১৪৫-পাউণ্ডের শ্রেণীতে তিনি আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ান হন। থার্ড ইয়ারে, দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করার পর, তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে নিউ ইঅর্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন কাগজে সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিতে চলে আসেন। তাঁর বড় ভাই জন্ তখন এই কাগজে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছিলেন। তিন বছর পর জেম্স্ এই কাগজের ইউরোপিয়ান সংস্করণের কাজ করবার জন্য বদলি হন। তার এক বছর পরে তিনি স্পেনে যান। তিনি বিয়ে করেননি এবং সংবাদপত্রের কাহিনী ছাড়া কিছু লেখেননি। র‍্যালফ ফক্স, কড্ওয়েল ও কর্ণফোর্ডের মতই স্পেনের রণাঙ্গনে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।"

জেম্স্ ফিলিপ লার্ডনারের এই পরিচয় ও নিচের চিঠি ক'টি পাঠিয়েছেন রিঙ লার্ডনার, জুনিয়ার, জেম্স্-এর পরের ভাই। ঔপন্যাসিক রিঙ লার্ডনার, জুনিয়ার, পেশায় স্ক্রিপ্ট রাইটার এবং 'হলিউডের সেই দশজনদের' একজন, যাঁদের কমিউনিস্ট বলে আমেরিকা বিরোধী ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

কারণ, আমার বিশ্বাস

জেম্‌স্‌ লার্ডনার

বার্সিলোনা, ৩রা মে, ১৯৩৮

মামণি,

এই চিঠিটার জন্ম এপ্রিল মাসের দশ তারিখে। তখনও পর্যন্ত ভেবেছি খবরটা তোমাকে সইয়ে সইয়ে দেব। সে সুযোগ আর এলোনা। শুনলাম বলার অনেক আগেই তুমি সব জানতে পেরেছ। চিঠিটা লিখতে দেরী হওয়ার পিছনে আরো একটা কারণ আছে। আসলে প্রতিদিনই ভাবছি আর এক দিন দেরী করলে বোধ হয় তোমাকে জানাতে পারব আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, কোথায় থাকব, কী করব এ সব। কিন্তু আজ পর্যন্ত জানি না প্রকৃত অবস্থাটা কি। যাইহোক, আর আধ ঘণ্টা বাদে সমুদ্রের উপকূলের সাত মাইল দূরে বাদালোনায় যাবার জন্য রওনা দেব। ওখানে সদ্য তৈরী পাঁচমেশালি একটা আন্তর্জাতিক ইউনিটে যোগ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে গোড়ার কথাগুলো শিখব। মনে হয় শেখানোর মাধ্যমটা ফরাসীই হবে। নতুন কোনো খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জানাব।

এই বাহিনীটা খুব বাছাই করা লোককে নিয়ে তৈরী। এদের সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে আমাকে অন্তত বারো দিন এর কাছে ওর কাছে, এ অফিস থেকে সে অফিস চরকির মত ঘুরতে হয়েছে। নানা রকমের জ্ঞানের মুখোমুখি হতে হয়েছে। বেশীর ভাগ লোকই আমার বাহিনীতে যোগ দেওয়াটা কোনো কাজের নয় এই কথাই রঙ বেরঙের বিভিন্ন ভাষায় মাথায় ঢোকাতে চেয়েছে। সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণভাবে আমার। অনেক বিচার বিবেচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমনকি ভিনসেণ্ট (জিমি) শীয়ন্, আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুও এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে নি। তাহলেই বোঝ কি কঠিন আমার সঙ্কল্প। আমার চরিত্রের এই

দিকটা যদি তোমার অজানা থেকে থাকে তাহলে আজ সেটা বোধহয় উপলব্ধি করতে পারবে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতে এটা খুবই ভাল কথা যে আমি ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই। তবে সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত। এ বিষয়ে কেউ কোন সাহায্য করতে পারে না। জানিনা তুমি যুদ্ধের খবর কতটা রেখেছ। আমার ধারণা আমাদের বিপদকে তুমি বড় বেশী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখছ। ম্যাপের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়াকে নেহাতই একটা বিন্দুর মতো দেখায়। মনে হয় অনায়াসেই এটাকে মেডিটেরিনিয়ানের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়। আসল ঘটনাটা কিন্তু একেবারে উলটো। একই ভাবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ দেশকেও কেড়ে নিতে পারে এমন কোন শক্তি নেই। এরা যে গভীর এক বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে লড়াইয়ে নেমেছে। শত্রুপক্ষে কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যায়।

গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার চিন্তা ভাবনা এত গোলমেলে যে তা ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অসম্ভব। আশা করি আমাদের কাজে তোমার পূর্ণ সমর্থন আছে। তুমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে তোমার বন্ধুদের বোঝাতে যে সত্যিই আমি মূর্খের মতো কিছু করছি না। যদিও ওরা আমায় বোকা ভাবলে আমার কিছু যায় আসে না। তবুও আমাদের কাজ সম্পর্কে আমেরিকার প্রতিটি মানুষের মতামত নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি কেন আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে নাম লিখিয়েছি তার কতকগুলো কারণ লিখে একটা লম্বা ফর্দ তৈরি করেছি। মনে হয় কারণগুলো মোটামুটি ঠিক। নিজেকে জানার তাগিদেই হয়েছে এটা। তোমাকে ফর্দটা পাঠাচ্ছি। পড়লে হয়তো বুঝতে পারবে কোনগুলো জোরাল। আর কোনগুলো নিতান্ত দুর্বল।

আমি আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে যোগ দিতে চাই—

কারণ আমার বিশ্বাস ফ্যাসীবাদ একটা মিথ্যে এবং এর মূল

শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। একমাত্র গণতন্ত্র—কমিউনিজমই সঠিক পথ।

কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিরপেক্ষতা আইন সংশোধনের ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে।

কারণ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমি আরও সক্রিয় ফ্যাসীবাদ-বিরোধী হব।

কারণ আমি পৃথিবীর সবকিছু থেকে জানার ও শেখার অদম্য ইচ্ছে অনুভব করি। তাই এই বয়সে যুদ্ধকে কোনোমতেই উপেক্ষা করতে পারি না।

কারণ আমি বহু কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাব যাদের সঙ্গ আমার ভাল লাগে ও যাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

কারণ আমি মানসিকভাবে অত্যন্ত অলস। আর সেইজন্যই শারীরিক পরিশ্রম করাটা নিতান্তই প্রয়োজন।

কারণ আমার জীবনে এমন কিছু অভিজ্ঞতা দরকার যা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমার দুর্ভাগ্যজনক আত্মসচেতনতাকে কমিয়ে দেবে।

কারণ আমি বিশেষ করে হেরাল্ড ট্রিবিউন ও সাধারণ ভাবে খবরের কাগজে কাজ করে ক্লান্ত বোধ করছি।

কারণ আমি বিশ্বাস করি যে এতে আমার আত্মা শান্তি পাবে।

কারণ প্যারীতে যে মেয়েটি থাকে তার উপলব্ধি করা দরকার যে তার অস্তিত্বের জন্য আমার উপস্থিতির প্রয়োজন নেই।

কারণ আমি অনেক লোককে মুগ্ধ করতে চাই। বিল* তাদের মধ্যে একজন।

* ('এই 'বিল' হচ্ছি আমি। আমার নাম আর আমার বাবার নাম এক বলে বাড়িতে আমাকে এই নামে ডাকা হত। বয়সে আমি জিমের চেয়ে মাত্র

কারণ আমার আশা, আমার লেখার জন্য, এই ধরো একটা নাটকের জন্য কিছু মালমশলা প্রয়োজন।

কারণ আমি স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ দুটো ভাষাই ভালভাবে আয়ত্তে আনতে চাই।

কারণ আমি জানতে চাই ভয় পেলে কেমন লাগে আর অন্য সবাই বিপদের মুখোমুখি কেমন ব্যবহার করে।

কারণ পড়াশুনা করার সুযোগ পাব। আরও বড় কারণ নেক্‌টাই পরতে হবে না।*

কারণ আমি চাই খুব সুস্থ সবল সুন্দর স্বাস্থ্য ফিরে পেতে।

আমার নিজের ধারণা, প্রথম চারটে ও নবম কারণটি, বিশেষ করে প্রথমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেটা ঠিক করার দায়িত্ব সম্পূর্ণই তোমার। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার বিপক্ষেও কতকগুলো যুক্তি খাড়া করেছি। তার মধ্যে একটা, আমি সাংঘাতিক ভাবে আহত হতে পারি। অন্যটা, তোমাকে দিনের পরদিন দুশ্চিন্তার কবলে ফেলে রাখতে পারি। তোমার জন্য দুঃখ বোধ করছি। এর কোনটাই আমাকে আটকে রাখার পক্ষে জোরদার নয়। তুমি হয়তো শুনলে সান্ত্বনা পাবে যে আমি এখনও হিংসা, নিষ্ঠুরতা, দুঃখকষ্ট, মনে প্রাণে ঘৃণা করি। এই যুদ্ধে যদি টিকে যেতে পারি তাহলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে পরের বার আর কোন বিপজ্জনক ভূমিকায় নামব না।

তুমি যদি এখনও আমাকে তোমার ছেলে হিসেবে মনে কর তাহলে মাঝে মাঝে দু একটা চিঠি লিখো বা এটা সেটা পাঠিও। আমার বর্তমান ঠিকানা সম্ভবত আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের নামেই হবে। তবে কিছুদিনের জন্য শীয়নদের ঠিকানায় দিলে আরো সহজ হবে।

পনেরো মাসের ছোট। জিমের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৩৭-র ফেব্রুয়ারিতে। ও তখন লস্ এঞ্জেলেসে আমার বিয়েতে এসেছিল। * তখন আমি রাজনীতি নিয়ে জিমের চেয়ে অনেক বেশী চিন্তাভাবনা করতাম এবং স্পেনের যুদ্ধ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাই নিয়ে অনেক কথা বলেছিলাম।'—রিঙ লার্ডনার, জুনিয়র)

খাদ্যবস্তু খুব সানন্দেই গ্রহণ করবো, যেমন ধরো মিল্ক চকোলেট বা কিসমিস। অথবা ধরো টিনের খাবার যা তৈরি করতে ঝামেলা পোয়াতে হবে না।

ভালবাসা নিও

জিম

('এই চিঠিটা লেখার সাড়ে পাঁচ সপ্তাহ আগে লার্ডনার প্যারি ছেড়ে যায়। স্পেনের সীমান্তে যাবার সময় ট্রেনের কামরায় তার সঙ্গী ছিলেন—আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও ভিনসেন্ট শীয়ন্। ভিনসেন্ট শীয়নের খ্যাতি সে সময় আর্নেস্ট হেমিঙওয়ের চেয়ে কিছু কম ছিল না। ১৯২০ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিদেশী সংবাদদাতা রূপে তিনি কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে 'পারসোনাল হিস্ট্রি' নামে একটি বইয়ে তিনি মরক্কো, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লেখেন এবং বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়। লার্ডনার সীমান্ত ঘুরে এসে নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের জন্য কিছু গল্প লেখে। সে গল্পগুলিকে, ওরই ভাষায়, পত্রিকার সম্পাদক একেবারে কসাইয়ের মতো জবাই করেছিল। এটা তার আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে নাম লেখাবার আগের কথা।'—রিঙ লার্ডনার, জুনিয়র)

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

মামণি,

বার্সিলোনা থেকে চলে আসার পর কত কিছু যে ঘটে গেছে কী বলব। ছোট্ট করে বলতে গেলেও মহাকাব্য হয়ে যাবে। ঠিক এই মুহূর্তে বিস্তারিত ভাবে সবকিছু লেখারও সাড়া পাচ্ছি না। পরে একসময় সব বলব। গত সপ্তাহ থেকে আমরা সবাই মোটামুটি নিষ্ক্রিয়ই বলা যায়। ভালই হয়েছে। কাজ করার উৎসাহও ঠিক তেমন ভাবে পাচ্ছি না। আপাতত: আমার একটু সর্দি হয়েছে, পেটেরও একটু গণ্ডগোল আছে মনে হচ্ছে। তবে জ্বর-টর কিছু নেই। শরীর বিগড়ে যাবার যথেষ্ট কারণ আছে। গতকাল যে ভাবে জ্যান্ত শুয়োরের মত অন্য সকলের খাবার সাবাড় করেছি! আজ বোধহয়

তার জের চলছে। আসলে এই গোলাগুলির কবল থেকে মুক্ত হলেই দেখবে আমাদের সকলেরই শরীর আবার তাজা হয়ে উঠেছে।

এখন তো যেখানেই যাই সেখানেই নিজেদের বাঁচানোর তাগিদে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজে লেগে যেতে হয়। একবার আস্তানা তৈরি করে ফেলতে পারলে—ব্যাস্‌, মোটামুটি নিশ্চিন্ত। এক আধবার সোজাসুজি গোলাগুলি এসে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে সেটা খুবই বিরল।

এই তো কিছুদিন আগে আমাদের কোম্পানি একেবারে বে-আবরু এক পাহাড়ে পজিশন্‌ নিল। চারিদিকে ঘিরে ছিল ফ্যাসিস্ট বাহিনী। ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন রাত। আমরা চারজন সঙ্গে সঙ্গে শাবল নিয়ে হেঁইয়ো মারো বলে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে লেগে গেলাম। প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে ওই পাথুরে মাটির ওপর কোদালের কোপ বসিয়ে নিজেদের মাথা গোঁজার জায়গা তৈরি করে ফেললাম। দিনের আলো ফোটার একটু পরে দেখলাম আমরা মাথা নীচু করে গর্তের ভেতরে অনায়াসে থাকতে পারি। আমরা ওখানে ঢোকার একটু পরেই ল্যাণ্ড মর্টার বর্ষণ শুরু হল। সারাদিন ধরে চলল ওদের তাণ্ডবলীলা। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে যে অক্লান্ত পরিশ্রম আমরা করলাম তার উপযুক্ত পুরস্কার এই একটুখানি নিরাপত্তা। চিঠিতে বোধহয় খুশীর ছোঁওয়া পেলেনা। পরের বার আরও ভালো করে লিখতে চেষ্টা করবো।

ভালবাসা নিও—

জিম

('প্রথম ও এই শেষ চিঠি লেখার সময়টুকুর মধ্যে লার্ডনার ট্রেনিং নিয়েছে। জুলাই-এর এব্রো অভিযানে সাংঘাতিক ভাবে সে আহত হয়। কিন্তু বার্সিলোনার হাসপাতাল থেকে সরকারী ভাবে ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফিরে আসে। সেই তার শেষ যুদ্ধ। ২২শে সেপ্টেম্বরের রাতে প্রহরায় গিয়ে আর ও ফিরে আসেনি। পরের দিনই আন্তর্জাতিক ব্রিগেডকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বরাবরের জন্ত সরিয়ে আনা হয়।' রিঙ লার্ডনার, জুনিয়র)

রুপার্ট জন কর্নফোর্ড

১৯১৫ সালে কেমব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন কর্নফোর্ড। কবি হিসেবে তাঁর মা ফ্রান্সেস ক্রফ্‌টস কর্নফোর্ডের খ্যাতি ছিল। তাঁর বাবা ছিলেন প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ। পরিবারের এই সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে কর্নফোর্ডের জীবন শুরু। তিনি কলেজ জীবনেই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩৩-এ তিনি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ ভর্তি হন এবং 'স্টুডেণ্ট ভ্যানগার্ড' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। পরিবহন শিল্পের অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য 'লেবার রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট স্টাডি গ্রুপ'-এর তিনি ছিলেন সেক্রেটারী। ১৯৩৫-এর মার্চ মাসে ইয়ঙ কমিউনিস্ট লীগের সদস্যপদে তিনি ইস্তফা দেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির পুরোদস্তুর সভ্য হবার পর। 'হোয়াট কমিউনিজম্ স্ট্যাণ্ডস ফর' নিবন্ধটি এই বছরেই লেখেন। তাঁর সন্তান জেম্‌স্ এই বছরেই ভূমিষ্ঠ হয়। ১৯৩৬-এ 'কমিউনিজম ইন্ দা ইউনিভার্সিটি' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। এই বছরেরই জুন মাসে বি. এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাশ পান, ইতিহাসে ডিস্টিংশান সমেত। ১৯৩৬-এর ১৮ই জুলাই স্প্যানীশ গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং তিনি ৮ই আগস্ট বার্সিলোনা অভিমুখে রওনা হন। আরাগঁ ফ্রণ্টের সারাগোসায় গিয়ে পৌছন ১১ই আগস্ট। জন কর্নফোর্ড ছিলেন প্রথম ইংরাজ যিনি ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে প্রথম সৈন্যদলে নাম লেখান, তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি। স্পেনে তিনি পের্‌ডিগুয়েরা ও হুয়েস্কা আক্রমণে অংশ নেন। ৮ই থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর অসুস্থ অবস্থায় সেরাইনেনা-র হাসপাতালে কাটিয়ে ১৩ই সেপ্টেম্বর বার্সিলোনা ফিরে আসেন ও ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডে পৌছেই ইণ্টারন্যাশানাল ব্রিগেডের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ শুরু করেন। ৪ঠা অক্টোবর ২১ জন ইংরাজ স্বেচ্ছাসেবক সমেত প্যারি যাত্রা করেন। সেখান থেকে মারসেইল হয়ে, অ্যানারকিস্টদের একটি জাহাজে চড়ে আলিকাণ্টে (Alicante) ও তারপর আলবাসিটেতে এসে ইণ্টারন্যাশানাল ব্রিগেডে যোগ দেন। ৮ই নভেম্বর মাদ্রিদে আসেন এবং আরাভাকা ও কাসা ভ ক্যাম্পো আক্রমণে অংশ নেন। বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলায় দুর্ঘটনাক্রমে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং তারপর ইংরাজ বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে আবার কাসা ভ ক্যাম্পোয় কার্যভার গ্রহণ করেন। ৮ই ডিসেম্বর শারীরিক

অবস্থা আবার খারাপের দিকে যাওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। ১৪ই ডিসেম্বর বোয়াদিলা ডেল মন্টে-তে আসেন, ফ্যাসিস্টশক্তি তখন পিছু হটে আসে। ১৭ই ডিসেম্বরের পর একুশ জন ইংরাজের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল মাত্র ৫ জন। এরপর তাদের অ্যালাবাসিটেতে ফিরিয়ে আনা হয়, ফোরটিন্থ ব্রিগেডের মার্সেইল ব্যাটেলিয়নের ইংরাজ ভাষাভাষী এক নম্বর কোম্পানিতে যোগ দেবার জন্য। মাদ্রিগুয়েরাস্-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর ২৪শে ডিসেম্বর তিনি করডোবা ফ্রন্টে প্রেরিত হন। ২৬শে ডিসেম্বর লোপেরা নামে একটি গ্রামে পৌছন এবং ২৭শে অথবা ২৮শে ডিসেম্বর যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। ২৭শে ডিসেম্বর ছিল তাঁর ২১ তম জন্মদিন।

এই সুদর্শন স্পষ্টভাষী আদর্শনিষ্ঠ তরুণ কিংবদন্তী হয়ে ওঠেন—ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিরোধের এক প্রতীক। স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লেখা তাঁর কবিতাগুলি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে অনুভবের নিবিড়তায়। ব্যক্তি মানুষের স্পর্শে সামাজিক মানুষের আদর্শ সেখানে আরো মহান, আরো মূল্যবান এক সম্পদ, যাকে জীবনের বিনিময়েই বুঝি শুধু আহরণ করা সম্ভব।

ফ্রণ্টের চিঠি

রুপার্ট জন কর্নফোর্ড

মারগট হাইনম্যানকে। ডায়েরিতে লেখা চিঠি।
আরাগঁ, ১৬—৩০ আগস্ট ১৯৩৬

প্রিয়তমা আমার,

ঠিক এই মুহূর্তে আমি ফ্রণ্টে বেকার অবস্থায় সমস্ত দিন কাটাচ্ছি। (কেন, সে কথা একটু পরেই বলবো) আর তাই তোমাকে এই দীর্ঘ পত্র লেখার সুযোগ মিলেছে। যদি এখানে এত গরম না হত তাহলে আমি আমার ভাবনা—চিন্তা আর অনুভূতিগুলোকে বাছাই করার একটা চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা পারছি না, তাই যা মনে আসছে ঠিক সেই ভাবেই লিখছি……

মারা যাবার একটা আশঙ্কা আছে। পরিসংখ্যানগত ভাবে খুব বেশী নয় কিন্তু তা হলেও তা থেকেই যায়। প্রথমতঃ, আমি এখানে রয়েছি কেন? রাজনৈতিক কারণগুলো তো জানই। তাছাড়া একটা ব্যাক্তিগত কারণও আছে। সতের বছর বয়স থেকে আমি এক ধরনের বন্দী অবস্থায় ছিলাম। আমার সমবয়সীদের আমি ঈর্ষা করতাম তাদের হাঘরের মতো ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা আছে দেখে। এবং কিছুটা এই কারণেই আমি প্রথম নিজেকে স্বনির্ভর বলে অনুভব করার পরই এখানে চলে এসেছি। কিন্তু আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাকে আর কখনো অহেতুক ছেড়ে আসব না। হতে পারে যে পার্টি আমাকে হয়তো পাঠাবে, কিন্তু এবারের পর আমি যখনই সুযোগ পাব তোমার সঙ্গে থাকব। আমি আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত মন ও সমস্ত শরীর দিয়ে তোমাকে ভালবাসি। তোমার প্রতি আমার ভালবাসা আমার সব অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত এবং একদিক দিয়ে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

যাইহোক, এসব কথা এখন থাক। এই মুহূর্তে আমি আরাগঁ-তে

আছি, যুদ্ধক্ষেত্রে, একটা পাহাড়ের মাথায়। আমার চারিদিকে বৃত্তাকার পাথুরে পাহাড়, সবুজ ঝোপে ঢাকা ও খুবই অনুর্বর। মাঝে মাঝে দু' একটা মাঠ। দু' কিলোমিটার দূরে শত্রুদের দখলে একটা গ্রাম। পাঁশুটে পাথরের চাঁইয়ের মাথায় একটা বড় গীর্জা। শত্রুদের চোখেই দেখা যায়না। মাঝে মাঝে এক একটা যা রাইফেলের শব্দ শুনি। এক দমকা মেশিন গানের গুলি। একটা কি দুটো এরোপ্লেন। মাঝে মাঝে বহুদূর থেকে আমাদের পক্ষের বন্দুকের শব্দ শোনা যায়। থাকার মধ্যে শুধু এক উত্তপ্ত সূর্য। এত গরম যে আমি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছি। খুবই কম খেতে পারি আর কাজ প্রায় করতেই পারি না। কিছুই করার নেই। আমরা প্রায় সারাদিন শুয়ে বসেই কাটাই। রাত্রে দু' ঘণ্টার প্রহরা—গত রাত্রে কিছু মাইল দূরে সারাগোসার পিছনে আলোর ঝিকিমিকি দেখে খুব ভাল কেটেছে। খোলা জায়গায় পাথরের ওপর একটা কম্বল নিয়ে ঘুমোই—গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কম্বল ভেদ করে গায়ে লাগবার মতো নয়। এখানে আমাদের কতদিন থাকতে হবে জানিনা। এবারে ঝামেলার কথাটা বলি। আমি ফ্রন্টে চলে এলাম আর রিচার্ড পিছনে পড়ে রইল। আমার পার্টি কার্ডের জোরে আমি দলভুক্ত হয়েছি। এখানে ভাঙা ভাঙা ইংরেজী-জানা ইতালীর এক ছোট্ট কমরেড ছিলেন। এখন তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে পড়ে আছি শুধু আমি আর আমার একমাত্র যোগাযোগ আছে ভাঙা ভাঙা ফরাসী-জানা এক তরুণ ক্যাটালোনীয় কমরেডের সঙ্গে। আর সেই জন্যেই শুধু নিসঙ্গ নয় নিজেকে কিছুটা অপ্রয়োজনীয় বলেও মনে হচ্ছে। যাইহোক এটা আশা করা যায় না যে এখানে আসা পর্যন্ত যে রকম নিখুঁত ভাবে সব ঘটছিল এখনও তাই ঘটবে। কখন বা কি ভাবে ফিরে যাবো তা সঠিক ভাবে না-জানার ফলেই এই একাকীত্ব, এই স্নায়বিক উদ্বেগ। আর এখনো গোলাগুলির মধ্যে পড়ার অভিজ্ঞতা না হওয়ায় অবধারিত ভাবেই আমি বেশ ভগ্নোদ্যম। এমন কি

আমার প্রেস টিকিট ব্যবহার করেও বাড়ি ফিরে যাবার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু এখানে যুদ্ধ করতে এসে একটু একা লাগার জন্য ফিরে যাওয়া ভীষণ ভাবেই হাস্যকর হবে। সুতরাং আপাতত সারাগোসার পতন, তা যখনই হোক না কেন, সেই পর্যন্ত এখানে আছি……

…সকালে—সেটা ছিল রবিবার—রোদের তাপ শুরু হবার আগে, শত্রুদের শহর পোর্ডিগুয়েরার ঘণ্টাধ্বনি ভীষণ ধীর আর করুণ শোনাচ্ছিল। কেন জানিনা এই ঘণ্টাধ্বনি আমাকে এমন অবসন্ন করে দিল, জীবনেও আমার সে রকম হয়নি। যাইহোক, এখন আমি মানিয়ে নিয়েছি। গত রাত থেকে আমরা আমাদের আরো আরামের ব্যবস্থা করেছি—ঘুমোবার জন্যে ছোট্ট একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে তাতে খড় বিছিয়ে দিয়েছি। যতক্ষণ আমি কোন কিছু করছি, তা যতই উদ্দেশ্য হীন হক না আমার বেশ লাগে। কর্মহীন অবস্থাই আমার স্নায়ু-গুলোকে কুরে কুরে খায়। কিন্তু গত রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। ছোট বেলায় যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন আমার চেনাশোনার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক ছিল রাগবি দলের ক্যাপ্টেন—'ডি' নামে একটা হাঁদা। আমি তার সঙ্গে একটা ডর্মিটরিতে শুতাম আর তাকে ভীষণ ভয় পেতাম। তার কথা আমি বহু বছর ভাবিনি। কিন্তু গত রাতে স্বপ্নের মধ্যে একেবারে স্পষ্ট দেখলাম তার সঙ্গে আমি লড়াই করছি এবং পিছু হটছি না। এটা বোধহয় একটা শুভ ইঙ্গিত। আমি জানিনা কতদিন এই পাহাড়ের ওপর থাকবো। তবে ক্রমশ আমি খাপ খাইয়ে নিচ্ছি…

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব বলতে সত্যি সত্যি কি বোঝায় তা যে কেউ বার্সিলোনায় গেলে বুঝতে পারবে। সব ফ্যাসীবাদী ছাপাখানাগুলোকে দখল করা হয়েছে। মিলিশিয়া কমিটিগুলোর হাতে আসল শাসন ক্ষমতা। ফ্যাসিস্তদের ব্যাপারে সত্যিই একটা ভয় আছে। কিন্তু তা এই মূল সত্যটিকে বদলায় না যে এই

জায়গাটা স্বাধীন—আর সর্বদাই তার স্বাধীনতার ব্যাপারে সচেতন। রাস্তায় সর্বত্র সশস্ত্র শ্রমিক আর মিলিশিয়ার লোক। অনেকেই এখন যেসব কাফেতে বসে আছে সেগুলো আগে বুর্জোয়াদের দখলে ছিল। চৌরাস্তার দিকে মুখ করে রয়েছে বিরাট হোটেল কোলন, যেটা এখন ইউনাইটেড সোস্যালিস্ট পার্টি অফ্ ক্যাটালোনিয়ার দখলে। আরো নীচে, ব্যাঙ্ক অফ্ স্পেনের উল্টো দিকের বাড়িটায় হচ্ছে অ্যানার্কিস্টদের সদর দফতর। র‍্যাম্বলাতে মারকুইসদের প্রাসাদে কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতর। কিন্তু কেউ কোন উত্তেজনা অনুভব করছে না। জনগণের অধিকাংশই অ্যানার্কিস্ট সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং তারা তাদের স্বাধীনতাকে উপভোগ করছে। রাস্তাগুলোয় সারাদিন লোকে গিজগিজ করে আর রেডিও অফিস-গুলোর চারদিকে বিরাট ভিড় থাকে। কিন্তু সেখানেও উত্তেজনা বা হিস্টিরিয়ার মতো কিছুই নেই। মনে হচ্ছে যেন লণ্ডনের সশস্ত্র শ্রমিকরা রাস্তাগুলোকে দখল করে রেখেছে। এটা নিশ্চিত যে তারা রাস্তায় মস্‌লি বা 'অ্যাক্‌শন'-বিক্রেতাদের সহ্য করবে না। তার মানে এই দাঁড়ায় না যে শহরটা সত্যিকারের অর্থে মুক্ত নয়। এটা খাঁটি সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব, উপচে পড়া সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাকে সমর্থন করছে। কমিটিগুলো এখনো সোভিয়েত ধরনের হয়নি। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বা কারখানা হিসেবে নয়, এগুলো গঠিত হয়েছে সংগঠনগুলির প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। তার জন্যে এর ভিত্তি কিছুটা সঙ্কীর্ণ, কিন্তু খুব বেশী নয়, কারণ এখানকার একটা বিরাট অংশ সংগঠিত।

যুদ্ধে যাচ্ছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে শেষে করবার মতো কিছু পেলাম। যদি যোদ্ধার মতো নাও পারি কমিউনিস্টের মতো যুদ্ধ করব। আমার সব ভালবাসা। স্যালুট! জন

এ অবধি চিঠিটার অবস্থা খুব দুঃখজনক। কারণটা এই: আমি

বেরিয়ে এসেছিলাম ক'দিন থাকবার বাসনা নিয়ে, কয়েকটা গুলি ছুঁড়বো, তারপর বাড়ি চলে যাবো। ব্যাপারটা শুনতে খুব ভাল লাগত কিন্তু বাস্তবে এরকম কিছু করা যায় না। গৃহযুদ্ধ নিয়ে খেলা করা যায় না। সাবধানে, যাতে মারা না পড়তে হয়, এমন ভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এটা উপলব্ধি করতে বেশী সময় লাগেনি যে, হয় এখানে মন প্রাণ দিয়ে থাকবো অথবা সরে যাবো। এই সমস্যা এড়াতে আমি চেষ্টা করেছিলাম। তারপর এত একা আর খারাপ লেগেছে যে আমি বার্সিলোনা ফিরে যাবার একটা পাস যোগাড় করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার হয়েই সমস্যাটার সমাধান করে ফেলা হয়েছে অন্যভাবে। যাইহোক একবার যখন যোগ দিয়েছি এরমধ্যে থাকতেই হবে, সে আমার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক। তাছাড়া সত্যিই তো আমার বেশ ভাল লাগছে। গতকাল আমরা আক্রমণ করতে বেরিয়েছিলাম, আর যুদ্ধের সম্ভাবনাটা ছিল ভীষণ উদ্দীপনাময়। সেইজন্যেই পাতার ওপরে ওই বার্তাটা দেখেছ। কিন্তু শেষে আমরা কিছু না করেই ফিরে এসেছি। আমি কিন্তু খাপ খাইয়ে নিচ্ছি, কথাবার্তার দু' একটা টুক্‌রো বুঝছি আর সুখী বোধ করতে শুরু করেছি। আমার মনে হয় আমি খুব ভাল যোদ্ধা হব। এখানে এসেছি বলে আমি খুশী বোধ করছি। সম্ভবত দু'মাস থাকতে হবে আর অনেক অনেক কিছু শিখতে পারব। অক্ষত অবস্থায় ফেরবার সম্ভাবনা শতকরা সত্তর ভাগ আর জীবন্ত ফেরবার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ— তার মানে অবস্থাটা মোটের ওপর চলনসই আর যদি তা নাও হত তাহলেও আমাকে থাকতে হবে।

সব মিলিয়ে আমি মানসিক দুর্যোগের সবচেয়ে খারাপ দিনগুলোকে কাটিয়ে উঠেছি। অবশ্য শারীরিক কষ্ট স্বীকারের পরীক্ষা হবে আগামী দিনে। কিন্তু আমার মনে হয় আমি সহ্য করতে পারব। আমার কি রকম বোধ হচ্ছে, বোঝানো বেশ কঠিন। আমি যেন আমার ব্যক্তিত্ব, স্বয়ং আমাকে আমি যেন ঘোষণা করতে

পারছি। জানো, বহুদিন ধরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি ভীত উদ্বিগ্ন হয়ে। আর যা আমাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে জনস্রোত থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে, তা যেন মুছে গিয়েছিল। আমি যেন এক এমন নিঃসঙ্গ মানুষ, যে কখনো আতঙ্কিত, কখনো গৃহকাতর, উদ্বিগ্ন, শান্ত, ক্ষুধার্ত, নিদ্রাতুর ও স্বস্তিহীন। আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, আমার যত শক্তি, আমার বিশ্লেষণী ক্ষমতা, এতদিন সব লুকিয়ে ছিল। এখন সব কিছু পাল্টে যেতে শুরু করেছে। আমি কিন্তু খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। প্রথম যখন লড়াই শুরু হবে তখন হয়তো আবার আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। কিন্তু এখন, আমি, জন কর্নফোর্ড, মাটির তলা থেকে বাইরে বেরোতে শুরু করেছি, নিজেকে চিনছি, ও নিজেকে উপভোগ করছি, এবং এই অনুভব ভাল লাগছে।

সৈন্য দলটা পেশাদার আর অপেশাদার সেনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। কোন চিৎকার নেই, অভিনন্দন দেওয়া নেই। যখন কাউকে কিছু করতে বলা হয়, সে সেই কাজটা করে বটে কিন্তু কোন বাড়তি উৎসাহ দেখায় না। অফিসাররা সর্ব সম্মতি ক্রমে নির্বাচিত হয় আর তাদের মান্যও করা হয়। সৈন্যদলের প্রায় অর্ধেকের ওপর ইউনিফর্ম পরে। নীল আর বাদামী আলখাল্লা আর শার্ট। বাকীদের মোটামুটিঃ কোন বর্ণনা দেওয়া যায় না। আমি নিজে কালো কর্ডের একটা মোটা ট্রাউজার পরি (বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে)। গায়ে থাকে একটা নীল শার্ট আর আলপাকার সেই কোটটা। পায়ে দড়ির শুকতলাওলা চটি। অসংখ্যবার দোমড়ানো পুরনো সমব্রেরো, একটা টুপি, একটা কম্বল আর কার্তুজের বাক্স (এক সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা), যার মধ্যে একটা বাড়তি শার্ট, একটা ছুরি, দাঁতের ব্রাশ, এক টুকরো সাবান আর চিরুণির জায়গা আছে। একটা বড় টিনের মগও আছে বেল্টের সঙ্গে বাঁধা।

যেটা নতুন তা হল নিরাপত্তাহীনতার একটা বোধ। আমার কাছে এই বোধ নতুন হলেও শ্রমিকরা স্কুল ছাড়ার দিন থেকেই এটা অনুভব করে। এর আগে আমার সব কাজের পটভূমিতে ছিল এক সচ্ছল আর নিরাপদ আশ্রয়, আর ছিল আমার এমন সব বন্ধুরা প্রয়োজন বোধ করলেই যাদের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারি। এখানে আর তা হবার নয়। আমাকে সম্পূর্ণ নিজের ওপর নির্ভর করতে হয়। প্রথম দিকে ব্যাপারটা খুব কঠিন বলে মনে হত আমার। কিন্তু এখন বুঝি আমি চালিয়ে নিতে পারব।

…গতকাল আমি প্রথম গুলিচালনার মুখোমুখি হলাম। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ব্যাপারটা এরকম, সন্ধ্যে বেলা আমরা জানতে পারলাম যে আমরা একটা অতর্কিত আক্রমণ করতে যাচ্ছি। সেই সন্ধ্যাতেই প্লেসিনেবা(লেরিডা)-তে একদল ইতালীয়ান এসে পৌঁছেছে। আমরা পিছনের অঙ্গনে একটা আগুন জ্বেলেছিলাম। আমাকে একটা মুরগি ছাড়াতে দেওয়া হয়েছিল। তারপর দলের নেতা, যে এত দিন দিব্যি বাড়িটাকে একটা আঁস্তাকুড় হয়ে উঠতে দিয়েছিল সেই হঠাৎ উঠে পড়ে লাগল সব কিছু গোছগাছ করবে বলে আর অতি অসাধারণ খাবার বানিয়ে ফেলল। এই প্রথম আমরা পরিষ্কার টেবিল-ক্লথ আর পরিষ্কার কাঁটা-চামচ সহযোগে খেলাম। খাওয়া দাওয়ার পর একটা সিগারেট শেষ করলাম। যে কথাবার্তা আমি একবর্ণও বুঝিনা সেটাও এখন দিব্যি কান পেতে শুনে যাই।

আমাদের জিনিসপত্র সব একজায়গায় করা হল, তারপর মার্চ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দুয়েক আমাদের একটা স্কোয়ারে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর আমি দু' দুবার ফুটপাথেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—কেননা সেদিন সকালেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, বলতে গেলে কিছুই যখন ঘটছে না আর রাতে এত ঘুম হচ্ছে তখন আমি আর কিছুতেই দিনের বেলা

ঘুমবো না। এর কিছুক্ষণ পরেই আমরা যাত্রা করলাম। আবার রাস্তায় থামলাম এবং আবার রাস্তাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমাদের দলের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথাটা তখনও আমার মনে হয়েছিল। প্রত্যেকে ফিস্‌ফিস্‌ করছে, একে অন্যকে চুপ করতে বলছে। সব মিলিয়ে তাতেও গণ্ডগোল কিছু কম হচ্ছিল না। অবস্থাটা বেশ ভাল লাগছিল আমার। খুশী হয়ে উঠেছিলাম। একটু পরে রাস্তাটা ছেড়ে আমরা পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে পড়লাম। মিহি ধুলোয় ভর্তি রাস্তাটা পায়ের তলায় এতক্ষণ নরম ঠেকছিল।

আরাগনের উঁচু আলওলা ছোট ছোট টুকরো টুকরো ক্ষেত পেরিয়ে সারারাত ধরে আমরা পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটলাম। প্রথমে বার বার আমার পা হড়কে যাচ্ছিল আর হোঁচট খাচ্ছিলাম, কিছুক্ষণ বাদে আমিও একরকম তালে তাল মেলাতে শুরু করলাম। তারপর আকাশে ক্রমশ আলো ফুটতে শুরু করল এবং বুঝতে পারলাম এটা কোনমতেই নৈশ আক্রমণ নয়। এই সময় অনেক নীচে বাঁদিকে সারাগোসার আলোগুলোও দেখতে পেলাম। তারপর আমরা অল্পক্ষণের জন্য থামলাম আর আমাদের এক কমরেড অনেক মাইল নীচে পোর্ডিগুয়েরার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ধারণাই করতে পারেনি যে আমরা এত উঁচুতে উঠেছি। এতক্ষণে আমি চালটা বুঝতে পারলাম। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে রাত্তির বেলা যাত্রার ফলে আমরা শত্রুদের ঠিক পিছন দিকে এসে পড়েছি—সেবাস্তিয়ান, এক মোটা রুমানিয়ান, এই পাহাড়ে চড়ার সময় অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে এবার ‘মাইস্টার সিঙ্গারস্‌’ থেকে একটা গান গাইবার চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু সুরটা আমি ধরতে পারলাম না। তারপর আমরা নীচে নেমে গেলাম। আমাদের বাছাই করে কয়েকটা দলে ভাগ করা হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোল-মালের মধ্যে সেই দল আবার ভেঙে দেওয়া হল। পাহাড়ের চুড়ো থেকে...তখন ৫।৬ টা হবে, পুরোপুরি দিন শুরু হয়ে গেছে, আমরা

পোর্ডিগুয়েরা দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর আমরা আরো নেমে গেলাম। একটা উঁচু মতো ঢিবি জায়গাটাকে চোখের আড়াল করে রেখেছিল। তারপর আবার এগোনো শুরু হল। আমাদের একটি মাত্র সারি ক্ষেতের নীরস জমির উপর পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ল, আমরা দ্রুতবেগে হাঁটতে শুরু করলাম। সারা রাত্তির ধরে যে কম্বলটাকে বয়ে এনেছি গরমের চোটে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর ঢিপির ওপরে শত্রুদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের অন্য প্রান্ত থেকে আক্রমণ শুরু হবার শব্দ কানে এল। আমরা সামনের দিকে এগোতে লাগলাম, দেখতে না দেখতে গ্রামের থেকে কয়েক শ' গজ দূরে একটা আঙুর ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে হাজির। গুড়ি মেরে এগোচ্ছি। জীবনে এই প্রথম মাথার ওপর দিয়ে গুলি চলে যাবার শব্দ শুনলাম। এই সময়ই আমাদের ভেতরকার সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাহীনতা ধরা পড়ছিল। বাঁ দিক থেকে গ্রামের বাড়িগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছিল, কিন্তু ডান দিকের গুলো একটা ঢিবির আড়ালে ঢাকা ছিল, শুধু গীর্জার মিনারটাই দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আমার এটা পরিষ্কার মনে হল যে আমাদের ডানদিকেই আক্রমণ করা উচিত। কেননা, সেই দিকেই শত্রু পক্ষের মেসিন গানটা রয়েছে, যেটা আমাদের পাল্টা আক্রমণ রুখছে। কিন্তু সে রকম কিছু হলনা। আঙুর ক্ষেতের সামনে দিয়ে আমাদের একটা দল হেঁটে গেল, নিজেদের বেশ ভাল করেই গোপন করে অলিভক্ষেতের নীচে গিয়ে ঘাপটি মেরে রইল। অলিভ ক্ষেতটা পেরোলেই গ্রাম। আরেকটা দল চলে গেল বাঁদিকের বাড়ি-গুলোকে আক্রমণ করার জন্যে, বাড়িগুলো অবধি পৌঁছেও গেল তারা। তখনো কে হারছে কে জিতছে সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলনা। তারপর আমাদের আক্রমণের অপরিকল্পিত প্রকৃতিটা আমি বুঝতে পারলাম। আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম, তাদের আঙুর ক্ষেতে ডেকে পাঠান হল। আঙুর ক্ষেতে বসে

আমি কাঁচা আঙুর চুষে চুষে খেতে শুরু করলাম। তেষ্টা যে তাতে মিটল তা নয়, কিন্তু একটা টক স্বাদ মুখে রয়ে গেল। তখন আমি দেখলাম যারা বাঁদিকের বাড়িগুলো দখল করেছিল, তারা দলে দলে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তখনো পর্যন্ত আমার এতটুকু দুর্ভাবনা হয়নি। হয়তো তখনো পর্যন্ত কেউ আহত হয়নি তাই। মাউজার বন্দুকের পিছু ধাক্কা এত অল্প দেখে আমার অবাক লাগছিল। এটা এর আগে ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি—কিন্তু তা সত্বেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিলাম না। তখনো পর্যন্ত কোন শত্রুকে দেখতে না পাওয়ায় আমি শুধু দরজা আর জানলাগুলোর ওপরই গুলি চালাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ আমাদের কানে এল শত্রু বিমানের গর্জন। আমরা আঙুর ক্ষেতের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে ঘাপটি মেরে রইলাম। মিলানো নামে এক লম্বা ইতালীয়ানের সঙ্গে ছিলাম আমি। আমারই দলের লোক। সে যা করছিল আমিও তাই করছিলাম। মনে হল প্লেনগুলো আমাদের লক্ষ্য করেনি। তারা পোর্ডিগুয়েরার অপর দিকে, অর্থাৎ যেদিক থেকে আমরা আক্রমণ চালাচ্ছিলাম সেই দিকেই কেবল বোমা ফেলছিল। বোমা পড়ার পর আমাদের দিকের যোদ্ধারা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অবশ্যই ভীরুতার জন্য নয়, কেউই সামান্যতম ভীত ছিলনা, এই বিশৃঙ্খলা শুধুমাত্র নেতৃত্বের অভাবের জন্য। কোথায় যেতে হবে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ না থাকায় যে যেদিকে পারল লুকিয়ে পড়ল। সেই জন্যে মিলানো ঠিক করল পিছু হটবে। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। খুঁজে পেতে মোটামুটি চোদ্দজনকে পাওয়া গেল। এরপর আমরা সবাই ফিরতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটা কুয়োর কাছে এসে হাজির। বেশ বড় সড় মুখ খোলা ছ' গজ জোড়া পাথুরে কুয়ো। জলের ওপর একটা মরা ইঁদুর ভাসছে। আমরা জলপানের জন্য দাঁড়ালাম। মিলানো অবশ্য বলেছিল, এ অবস্থায় আমরা ধরাও পড়ে যেতে পারি। আমরা যখন ফিরে

যাচ্ছি, আঙুর ক্ষেতে কয়েকজনকে দেখতে পেয়ে তাদের দিকে গেলাম। সংখ্যায় তারা বেশী ছিলনা। কয়েক মিনিট ঘুমিয়ে নেবার জন্যে আমরা আঙুর ক্ষেতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়তে হল। বলা হল এখনই আমাদের পশ্চাদপসারণ করা উচিত। আমরা কুয়ো পিছনে ফেলে খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে পাথরের একটা গোলা ঘরের মধ্যে চলে এলাম। সেখানে বিশ্রাম নিতে নিতে আলোচনা হল। শেষে একজন কমরেড, বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, ওভারঅল পরা একজন শ্রমিক, তিনি উদ্যোগ নিলেন এবং কিছু নিয়ম কানুন চালু করলেন। আলোচনাটা ঠিক আমি বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে কি করা হবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে তিনজনের একটি কমিটি নির্বাচিত করা হবে। শেষে ঠিক হল পশ্চাদপসারণ করাই বাঞ্ছনীয়। ফেরবার পথে আমি একজন কমরেডের মগ ধার নিয়ে কুয়োতে জল খাবার জন্যে গেলাম। আরো কয়েকজন আমাকে অনুসরণ করল। সেই গুদাম ঘরে সব মিলিয়ে পঁচিশ জন ছিল। তারপর অকস্মাৎ, একেবারে কানের কাছে বুলেটের শব্দ—জিপ্-জিপ্-জিপ্। আমরা কুয়োর পাথরের কানাচের আড়ালে বসে পড়লাম। তারপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে ক্ষেতগুলো পেরোতে লাগলাম। আমাদের চারদিক দিয়েই বুলেটের ঝড় বইছিল। আরো দ্বিগুণ ঝুঁকে চললাম। মাঠ পেরিয়ে ফিরে এলাম পাহাড়ে। আমার গলা তখন একেবারে শুকিয়ে কাঠ। এত তৃষ্ণার্ত যে ঢোঁক গিলতেও কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত আর ক্লান্ত। অসম্ভব মনের জোর ছিল তাই শরীরটাকে টেনে নিয়ে একটার পর একটা পা ফেলে এগোতে পারছিলাম। সূর্যের অবিশ্বাস্য উত্তাপের জন্য পাহাড়ে চড়াটা ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার হল। আমি নিজে মিলানোর পিছনের দিকে রইলাম। মিলানো পর্বতারোহী, কাজেই আমি যথাসম্ভব তার পরিমিত পদক্ষেপকে অনুসরণ করারই চেষ্টা

করছিলাম। অবশেষে আমরা চুড়োয় পৌঁছলাম। এত কষ্ট সত্ত্বেও আমার বেশ ভাল লাগতে শুরু করল। এতক্ষণ নিজেকে এক অক্ষম সৈন্যের মতো মনে হচ্ছিল। এবার অন্যদের মতই মনে হতে লাগল। আমার দেহের পক্ষে এই ধরনের শারীরিক সহনশীলতার বেশী আর কিছু দেখানো সম্ভব ছিলনা—আমি নিশ্চয়ই অন্যদের থেকে বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়িনি আর জলের জন্য অনেক কম চেঁচামেচি করেছি। আমাদের দলটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল, একদল জলের জন্যে গেল। অপর দল মিলানোর সঙ্গে আরো উঁচুতে উঠতে শুরু করল। আমরা জলের খোঁজে নীচে নেমে গেলাম। সেখানে একটা কুয়োর পাশে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। আমরা একটা ফুটো গামলায় করে জল তুললাম। আমি কতটা তৃষ্ণার্ত ছিলাম এর থেকেই বোঝা যাবে যে, ফুটো গামলাটা দিয়ে হুড় হুড় করে জল বেরোতে থাকলেও গামলাটা শেষ হবার আগেই পাঁচবার কাপ (২।৩ পাঁইট) ভরে জল খেয়েছিলাম। আমি লক্ষ্য করছিলাম যে বেশী অভিজ্ঞরা অল্প পান করল। তারপর আমরা গোলাঘরে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক ঘুমোলাম। সেই বুড়ো লোকটি আমাদের রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমরা ধীরে ধীরে তার পঙ্গু গতির সঙ্গে সমতা রেখে সাইপ্রেস বনের মধ্য দিয়ে উঁচু করে পাড় দেওয়া নিষ্ফলা ক্ষেতের টুকরোগুলো পেরিয়ে পাহাড়ের গা থেকে প্রক্ষিপ্ত বড় বড় মার্বেলের যত খণ্ড পেরিয়ে, প্রত্যেক কুয়োয় একবার করে জল খাবার জন্য থেমে থেমে নামতে লাগলাম। সবচেয়ে বিপদের সময়টা পেরিয়ে গেছে। বাকীরা এখন পাহাড়ের নীচে। আমরা যখন প্রথম শিবিরে পৌঁছলাম, শুনলাম মুখোমুখি আক্রমণে পাঁচজন মারা গেছেন। তারপর আস্তানা। সেই সবুজ শেওলা ঢাকা গ্রামের বদ্ধ জলাটার চারপাশ ঘিরে যে অ্যাম্ফিথিয়েটারটা রয়েছে সেটাকে পেরিয়ে, ফুটবল মাঠের ফাঁকা জমিটা পার হয়ে প্লেশিনোয় ফেরা।

অনুবাদ ॥ শাশ্বতী ঘোষ

জুলিয়াস ফুচিক

জুলিয়াস ফুচিকের জন্ম ১৯০৩ সালে। বারো বছর বয়স থেকেই লেখার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।' পনেরো বছর বয়সে তাঁর একটি ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশিত হয় কারেল চ্যাপেক সম্পাদিত পত্রিকায়। এই সময়েই তাঁর চোখের সামনে ক্ষুধার্ত শিশুদের ওপর গুলি চালানো হয় Plezen শহরতলীতে। এই ঘটনা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করে এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপিত হলে তিনি পার্টির সদস্য হন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে তিনি প্রাগে আসেন দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাস নিয়ে অধ্যয়ন করতে। জীবিকা অর্জনের জন্যে তখন তিনি ছাত্র পড়াতেন এবং শ্রমিক হিসাবে কাজ করতেন। বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পত্রপত্রিকায় লেখা ছাড়াও তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনের একজন অগ্রণী কর্মী। ১৯২৯ সালে তিনি Tvorba পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন এবং পত্রিকাটি সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পত্রিকা হিসাবে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। এই সময়ে তিনি ছিলেন চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র Rude Pravo-র কর্মীবৃন্দের মধ্যে অন্যতম। ১৯২৯ সালে নর্থ বোহেমিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিকরা স্ট্রাইক করলে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং বেআইনি ভাবে শ্রমিকদের কাগজ প্রকাশিত করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সদস্য হিসাবে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ানে আমন্ত্রিত হন। ছ' মাসের সফর শেষ করে দেশে ফেরার পর প্রকাশিত হয় তাঁর সেই চাঞ্চল্য-কর বই—'দা কান্ট্রি হোয়ার টু-মরো ইজ্ ইয়েস্টারডে'। কমিউনিস্ট হিসাবে, সাংবাদিক হিসাবে এবং বক্তা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ানের কীর্তির কথা প্রচার করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল চেক্ সরকার তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করে। ১৯৩৪ সালে চেক্ কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে Rude Pravo-র সংবাদদাতা হিসাবে রাশিয়ায় প্রেরণ করে। ১৯৩৬-এ দেশে ফিরে তিনি আবার Tvorba সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি নতুন দৈনিক কমিউনিস্ট পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন।

এরপর আসে ১৯৩৮ সাল। ঘর ছাড়ার কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচে সমস্ত কমিউনিস্ট পত্রিকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়, নিষিদ্ধ হয়ে যায় চেক কমিউনিস্ট পার্টি। জার্মানী অধিকার করে নেয় চেকোশ্লোভাকিয়া। জুলিয়াস ফুচিক

পশ্চিম বোহেমিয়ার Domazlice অঞ্চলের ছোট্ট একটি গ্রাম Chotimer-এ চলে যান। সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪১ সালে জার্মান গেস্টাপো বাহিনী চেক কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বেআইনি সেণ্ট্রাল কমিটিকে ধরে ফেললে, জুলিয়াস ফুচিক তখন নতুন বেআইনি কমিউনিস্ট সেণ্টারের অন্যতম সংগঠক হন এবং বেআইনি ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র Rude Pravo এবং আরো কিছু পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯৪২-এর এপ্রিলে তিনি গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়েন। তাঁর ওপর চালানো হয় শারীরিক নির্যাতন। Pankrac-এর গেস্টাপো কারাগারে বসে লেখা তাঁর অমর কীর্তি 'রিপোর্ট ফ্রম দা গ্যালোজ্'-এর (ফাঁসির মঞ্চ হতে) কথা আজ সকলেই জানে। ১৯৪৩-এর জুনে তাঁকে Bautzen-এ নিয়ে আসা হয়, তারপর আগস্ট মাসে তাঁকে বার্লিনের Volksgericht-এর সামনে হাজির করা হয়, ২৫শে আগস্ট তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এবং ৮ই সেপ্টেম্বর বার্লিনে তাঁকে হত্যা করা হয়।

মানবতার নির্ভীক সৈনিক হিসাবে তিনি সমস্ত রকম অত্যাচার এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এবং শান্তিকামী মানুষ তাঁকে এই রূপেই চিরদিন স্মরণ করে উদ্বুদ্ধ হবে। ১৯৫০ সালে তাঁকে মরণোত্তর আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনূদিত গল্পটি তিনি Rude Pravo-য় লিখেছিলেন ১৯৩৬ সালে জোসেফ পাভেল ছদ্মনামে।

ইলেকট্রিক বাল্ব-খেকো মানুষটা

জুলিয়াস ফুচিক

সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

দিনের শেষ বেলার আলো শ্রীহীন প্রাচীন শহরতলীর ওপর এসে পড়েছে তেরছাভাবে। দেখলাম, আঁধার ঘেরা গীর্জাটার প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে একটা ছোটখাট জটলা। জটলার মধ্যিখানে, বিস্ময়কর ভাবে নীরব ও নিশ্চল এক অবয়ব চোখে পড়তে থমকে যেতে হল।

একটি মানুষের মুখ, আগুনের ঝলক বেরিয়ে আসছে সেই মুখ থেকে।

এক বৃদ্ধা আমার আগে আগে হাটছিলেন গুটি গুটি পায়ে। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। যেন পঙ্গু হয়ে গেছেন। তারপর আতঙ্কে ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে বুকে হাত রাখলেন, 'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!'

হঠাৎ কানে এল ভোঁতা কর্কশ একটা হুইশিল।

চোখের পলকে মিলিয়ে গেল সেই অবয়ব। পড়ে রইল শুধু গোধূলির আলো, প্রাচীন বিষণ্ন শহরতলী আর গীর্জার আঁধারমাখা প্রেক্ষাপট···

* * *

সপ্তাহখানেক পরে আবার ওইরকম একটা জটলা চোখে পড়ল। বিকেল বেলা। ঝকমক করছে সূর্য আর তার আলোয় দূর হয়ে গেছে সব রহস্য। জায়গাটা সেই শেষবেলার আলোয় রাঙা প্রাচীন শহরতলী নয়। প্রাগের যেখানে আধুনিক ফ্ল্যাটবাড়ির খুপ্‌রি উঠেছে, তারই এক নিভৃত কোণ। শহরের সবচেয়ে সজীব কেন্দ্রেও যানবাহনের স্রোত সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হলেও হামেশাই এইরকম নিভৃতির জন্ম দেয়। ঘড়ঘড় করতে করতে ট্রাম চলে যাচ্ছে, ঊর্ধশ্বাসে ছুটছে গাড়ি, হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছে মানুষ আর ওই জটলার মাঝ থেকে এক তরুণ, ঈষৎ ভাঙা গলায় রাস্তার যাবতীয় শব্দের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে তার কণ্ঠস্বর, 'কোন্‌টা জোচ্চুরি সে আমি বলে

দিতে পারি। কিন্তু এর মধ্যে কোন জোচ্চুরি নেই। এ শুধু কঠিন পরিশ্রম। যার ইচ্ছে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। যতদিন চুক্তিবদ্ধ ছিলাম, এটাকে আমি শয়তানের ভোজ বলতাম। ঘরের মধ্যে এটা দেখানো অনেক সহজ। দেখছেন তো, এখন হাওয়া বইছে। আমার চোখ পুড়ে যেতে পারে। অবশ্য জিভের জন্য আমার কোন ভয় নেই। কেউ চেষ্টা করবেন না তো তাহলে? বেশ, তবে একাই আমি আমার ভোজ সেরে ফেলি......'

তারপর একটু একটু করে জ্বলন্ত রুটি ঢুকতে লাগল তরুণ বক্তার মুখের মধ্যে আর ছিটকে বেরোতে শুরু করল অগ্নিশিখা। এই অগ্নিশিখাই দিন সাতেক আগে আধো অন্ধকারে ওইরকম রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করেছিল। সত্যিই এটা শ্রমসাধ্য কাজ, রীতিমতো শ্রমসাধ্য কাজ। তরুণটিকে যে পরিশ্রম করতে হচ্ছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মুখটা ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে। কপালের শিরদুটো ফুলে উঠছে, চোখে জল চলে এসেছে।

'না, এটা মোটেই সুস্বাদু নয়। কিন্তু আমি যদি আগুন না খাই তাহলে যে আমার কোন খাওয়াই জুটবে না। আমি এক বেকার কারিগর। যদি কেউ সামান্য কিছু দয়া করেন তো · জানি, সময় খুবই খারাপ, তবু দু'একটা পয়সা দিতে হয়তো অসুবিধে হবে না...'

একটা টিনের থালা হাতে তরুণটি জটলাটা পরিক্রমা করল। কয়েকটা বিশ হেলার, এমন কি একটা ক্রাউনও মনে হল ঠনঠন করে পড়ল থালার ওপর। ছেলেটি আবার নতুন খেলা জুড়ল।

'একবার শুধু পরীক্ষা করে দেখুন এই পেরেকগুলো।...না না, কুণ্ঠিত বোধ করবেন না...খুব শক্ত, তাই না? কোন বুজরুকি নেই, এ সেই ভাঁজ করে ফেলার মতো নরম পেরেক নয়। একেবারে সত্যিকার পনেরো সেন্টিমিটার লম্বা পেরেক...'

পেরেকগুলো নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে তারপর হাতুড়ি পেটাতে শুরু করল যেন একটা কাঠের গুঁড়িতে পেরেক বসাচ্ছে।

'এখন আমি দিব্যি হাসতে পারছি, কিন্তু আমি যখন শিক্ষানবিশ ছিলাম খুব কেঁদেছি। আমার বাবা সবসময়েই বলতেন, জীবিকা অর্জন করতে হলে এটা শিখতেই হবে। এখন তো দেখতেই পাচ্ছেন···আমি জীবিকা অর্জন করছি। আমার বাবা লাফ মারার খেল্ দেখাতেন। ক্রুড্‌স্কিদের ওখানে কাজ করতেন তিনি। কিন্তু একদিন ঘোড়াটা আচমকা বেয়াড়াভাবে লাফিয়ে ওঠে, লাফ মারায় ভুল হয়ে যায়। হাসপাতাল অবধি পৌঁছবারও অবকাশ হয় না, বাবা তার আগেই মারা যান। কাজেই এরপর আমি একা হয়ে গেলুম। তখন ষোল বছর বয়স। যা-যা শিখেছিলাম তাই মস্কো করতে শুরু করে দিলুম। সবুর করুন, আরেকটা খেলা দেখাচ্ছি।'

একটা তরোয়ালের ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠল রোদ্দুরে।

'ইচ্ছে হলে ছুঁয়ে দেখতে পারেন। নিজের হাতে পরখ করে দেখুন। আমি এই ষাট সেন্টিমিটার লম্বা তরোয়ালটা এখুনি গলার মধ্যে পুরে দেবো···' বলতে বলতেই কাজ সারা হয়ে গেল। '···আমার জায়গায় আপনাদের কেউ যদি থাকতেন তাহলে পরিষ্কার টের পেতেন তরোয়ালের মুখটা একেবারে পাকস্থলি অবধি পৌঁছে গেছে। এটাও অবশ্য খাদ্য হিসাবে বিস্ময়কর, কোন মতেই পুষ্টিকর বলা চলে না···কাজেই পেটটা যাতে ভরে তার জন্যে এবার আরেকটা খেল্ দেখাবো।'

তরুণটির পায়ের কাছে পড়েছিল একগাদা ইলেকট্রিক বাল্ব। তার থেকে সবচেয়ে বড়টিকে সে তুলে নিল।

'সারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে একা আমিই কেবল কাঁচ গিলতে পারি। আরেক জন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সে মারা গেছে। সেও আমার মতো চাকরি যোগাড় করতে পারেনি—প্যারাফিন খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আর প্যারাফিন না-খেয়ে কাঁচ গেলা যায় না। কাঁচ বিঁধে ইন্‌টেস্‌টাইন ছিঁড়ে গেছল। কাজেই একা আমিই এখন···'

বাল্বটাতে সে কামড় দিল। কচমচ করে চেবাতে শুরু করল। সুস্বাদু খাদ্যের গ্রাস গ্রহণ করার মতো কাঁচের গুঁড়োগুলো গিলছে। একটা বাল্ব শেষ করে সে দ্বিতীয়টা শুরু করল।

'এই হচ্ছে আমার দুপুরের ভোজ। খেলা দেখানোর আগে কিছু খেতে নেই। কাঁচ খাবার জন্য পাকস্থলিকে একেবারে পরিষ্কার করে রাখতে হয়। আমার কাছে সেটা অবশ্য এখন কোন সমস্যাই নয়। খেলা দেখাবার আগে কি পরে, পেট তো সারাক্ষণ খালিই থাকে। রোজ গোটা ছয় কি আটটা বাল্ব খাই। সেই যথেষ্ট। এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কেউ যদি দয়া করেন তাহলে একটু পছন্দসই কিছু খাওয়া জোটে···

'এই খেলা দেখাতে আমি বিদেশ সফরেও গিয়েছিলাম। এই খেলা সর্বত্রই সফল হয়েছে। কিন্তু এখন, লকলকে আগুনের জিভ বার করে, পেটে তরোয়াল গুঁজে, দাঁতের মধ্যে বাল্ব পুরেও আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়—যদি আশপাশে পুলিশ এসে পড়ে। পুরনো শহরের ওখানে চোখদুটো তো খোয়াতেই বসেছিলাম। তার চেয়ে এখানটা অনেক ভাল। এই জায়গাটা পড়েছে তিনটে পুলিশের চক্কর দেবার সীমান্তে। কাজেই তিনজনের কেউই দেখা দেয় না। প্রত্যেকেই—তাদের মহানুভবতার জন্য, কাজটা অন্যের ওপর ছেড়ে দেয়। অবশ্য, তারাও তো মানুষ এবং হয়তো দেখা যাবে তারাও আস্তে আস্তে বিরক্ত হয়ে উঠছে···

'কেউ যদি সামান্য কিছু দয়া করেন···নিজের চোখেই দেখছেন, এর মধ্যে লুকোচুরির কোন ব্যাপার নেই, কোন কারসাজি নেই, কোন ভাঁওতা নেই···অবশ্য সময় যে খুব খারাপ তা আমি জানি।

'এমনও হতে পারে আপনাদের মধ্যে কারুর কারুর হয়তো আমার বাল্ব-খাওয়া দেখেও হিংসে হচ্ছে। তবু তো আমি কিছু খেতে পাচ্ছি।'

অনুবাদ ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ

. আয়ারল্যাণ্ডে লোকসভা বিলুপ্ত হল, শুরু হল প্রচণ্ড দমন, উৎপীড়ন। আইরীশ নেতৃবৃন্দ তাদের কাজকর্ম সরিয়ে নিয়ে গেলেন লণ্ডনে, ইংলণ্ডের লোকসভায় সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিরোধ, বিরুদ্ধ-সংগ্রাম শুরু করে দেওয়া হল। একটানা পনের বছর চলেছিল এ অবস্থা। শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম ১৮০৩ সালের নিষ্ফল বিদ্রোহ। অভ্যুত্থানের নেতা হিসাবে দেখা গেল পঁচিশ বছরের এক ছাত্র-যুবককে। আয়ারল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিকদের মধ্যে যিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাণচঞ্চল, সরল আর প্রিয়তম।

রবার্ট এমেত (১৭৭৮-১৮০৩) ছিলেন এক খ্যাতনামা চিকিৎসক ও দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমিকের সন্তান। মেধাবী ছাত্র। পনের বছর বয়সে ভর্তি হন ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে। সমস্ত দেশ তখন বিদ্রোহ-উন্মুখ, যন্ত্রণায় অস্থির। অসাধারণ ক্ষমতাশালী এই যুবক সামনের সারিতে এসে দাঁড়ালেন। অনবদ্য বাকপটুতা ও অনুপ্রাণিত করার দক্ষতায় আয়ারল্যাণ্ডের অতীত শৌর্যবীর্যের মহিমা ও বর্তমান অবিচারের স্বরূপ উদ্ঘটন করে অচিরেই তিনি সহপাঠী বন্ধুদের মনে সংগ্রামের আগুন প্রজ্বলিত করতে সক্ষম হন। তাঁর বাগ্মিতার খ্যাতি, নিষ্ঠুর শাসকের বিরুদ্ধে বুদ্ধিদীপ্ত জেহাদ ও ফরাসী বিপ্লবের সমর্থন তাঁর পরিচিতির গণ্ডি বিস্তৃত করে। তাঁর নাম কলেজ থেকে সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি সদাসতর্ক কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েন। 'সংযুক্ত আয়ারল্যাণ্ড গণ-পরিষদের' সদস্য হওয়ার অভিযোগে ১৭৯৮ সালে তিনি ট্রিনিটি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন এবং বছর কয়েক ইউরোপ ভ্রমণ করেন। প্রথমে কিছুদিন তিনি তাঁর ভাইয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সুযোগমত ভাইকে নিয়ে আমেরিকায় দেশান্তরী হওয়া। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের হৃদয়বিদারক ঘটনাবলীতে তিনি মত পরিবর্তনে বাধ্য হন।

১৮০৩ সালের তেইশে জুলাই তিনি গোপনে ডাবলিনে প্রবেশ করেন এবং এক বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিলো অস্ত্রাগার ও দুর্গ দখল করা। প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। এমেত অবশ্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। অনায়াসেই তিনি ইউরোপের অন্য কোথাও সরে যেতে পারতেন যদিনা ডাবলিনে তাঁর প্রেয়সীর সঙ্গে শেষ-দেখা করবার সিদ্ধান্তটি নিতেন। অচিরে তিনি গ্রেপ্তার হলেন, তাঁকে আদালতে আনা হল এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। অপরাধ যাই হোক না কেন, ইংরেজ আইনে অভিযুক্তের কথা বলবার অধিকার থেকেই যায়। এমেত আদালতের দরবারে তাঁর শেষ কথাগুলো বলেন, তাঁর উত্তরসূরীদের উদ্দেশে।

আমার দেশই আমার উপাস্য প্রতিমা

রবার্ট এমেত

হে ধর্মাবতার,

আইনানুসারে আমার উপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি করা কেন উচিত হয়নি, সে বিষয়ে আমাকে বক্তব্য রাখতে বলা হয়েছে। আমার এমন কিছুই বলার নেই যা আপনার ইতিপূর্বেই স্থিরীকৃত মত পাল্টে দিতে পারে। আপনি যে শাস্তিবাক্যটি উচ্চারণ করতে চলেছেন এবং যা আমি মানতে বাধ্য, আমার বক্তব্যে তার তীব্রতা বিন্দুমাত্র লাঘব হবেনা। তবুও আমি সেইকথা বলব যা আমাকে প্রানের চেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে এবং আপনি যা ধ্বংস করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মিথ্যা অভিযোগ ও কুৎসায় আমাকে নিমজ্জিত করার প্রয়াস থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই আমাকে বলতে হবে। অবশ্য আপনি যেখানে বসে আছেন, সেখানে থেকে আপনার মন এতটা সংস্কারমুক্ত হবে যে আমার উচ্চারিত বক্তব্য দ্বারা আপনাকে তিলমাত্র প্রভাবিত করতে পারবো, এমনটা আমি কল্পনাও করিনা। যে উদ্দেশ্যে এই আদালত গঠিত এবং যেভাবে একে চালনা করা হয় তাতে আমি আশা করিনা যে আমার চরিত্র আপনাদের মনে কোনরকম ছাপ ফেলবে। আমার একমাত্র অভিপ্রায় এবং সেটুকুই আমি আকাঙ্ক্ষা করতে পারি যে আপনাদের সংস্কারাচ্ছন্ন বিষাক্ত মানসে থিতিয়ে যাবার আগেই আমার যেন কোন অতিথি বৎসল বন্দরে আশ্রয়লাভ ঘটে। আর কালের করাল ঝড়ে হারিয়ে যাবার পূর্বমুহূর্ত অবধি আমার স্মৃতি যেন অকলুষিত থাকে। আপনার বিচারালয়ের বিচারে আমাকে যদি কেবল মৃত্যুবরণ করতে হত, নীরবে আমি মাথা নত করে দাঁড়াতাম, প্রসন্নমুখে অদৃষ্টকে মেনে নিতাম। কিন্তু আইনের বিচার যা আমার দেহটাকে জহ্লাদের হাতে তুলে দিচ্ছে, তার কৃতকর্মের যুক্তিযুক্ততার সাফাই হিসাবে আইন মন্ত্রণালয়

মারফৎ আমার চরিত্রহননের প্রচেষ্টা চালাবে ; কারণ কোথাও একটা অন্যায় ঘটে যাচ্ছেই, হয় সেটা আদালতের রায়ে অথবা এই বিয়োগান্তক পরিণতির কারণ নির্দ্ধারণে। সময়ই তার বিচার করবে। আমার অবস্থায় একটা মানুষকে যে কেবল প্রতিকূল ভাগ্য আর মনকে দূষিত ও বিবশ করে রাখা ক্ষমতার প্রভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয় তাই নয়, বহুদিনের জমে থাকা কুসংস্কারের মোকাবিলাও করতে হয়। মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু তার স্মৃতি থেকে যায়। আমার স্মৃতিও যাতে অবলুপ্ত না হয়, দেশবাসীর হৃদয়ে যাতে সশ্রদ্ধ আসন পাই—সেই কারণে এই বক্তব্য রাখবার সুযোগ আমি প্রবল আগ্রহে গ্রহণ করছি যাতে আমার উপর আরোপিত কিছু অভিযোগের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারি। যখন আমার আত্মা এক স্বজন-বন্দরে ভেসে যাবে, আমি যেন সামিল হই সেইসব বীর শহিদদের মিছিলে, দেশকে রক্ষার জন্য অথবা সমৃদ্ধশালী করার জন্য যাঁরা ফাঁসীর মঞ্চ বা রণক্ষেত্র প্লাবিত করেছেন আপন শোণিত ধারায়, এই আমার আশা। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি যাদের মাঝে বেঁচে থাকবো, আমার স্মৃতি বা নাম যেন তাদের উদ্দীপিত করে। আর আমি পরম সন্তোষের সঙ্গে তাকিয়ে দেখবো ওই বিশ্বাসঘাতক সরকারের বিনাশ, যে শুধু বুজরুকি দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখে। মানুষের ওপর জঙ্গলের পশুসদৃশ আচরণ ক'রে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করে। অনাথ শিশুর কান্না আর বিধবার চোখের জল সৃষ্টিকারী এই ইস্পাত-আবৃত নৃশংস সরকার সামান্যতম মতপার্থক্যেও মানুষকে তার ভাইয়ের টুঁটি টিপে ধরতে প্ররোচিত করে আর নিজে ভগবানের দোহাই দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে।

পবিত্র ঈশ্বরের কাছে আমার নিবেদন—আমি শপথ করছি স্বর্গরাজ্যের নামে, যেখানে অতি অল্পসময়ের মধ্যে আমাকে অবশ্যই হাজির হতে হবে—আমি শপথ করছি নিহত দেশপ্রেমিকগণ, যাঁরা

আমার আগেই এ পৃথিবী ছেড়ে গেছেন তাঁদের রক্তের নামে, যে এই বিপদ সঙ্কুল ও নানাবিধ উদ্দেশ্যসমূহের মধ্য দিয়ে আমার আচরণ কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একটি স্থির প্রত্যয় থেকে। ইতিমধ্যেই আমি তা ব্যক্ত করেছি। আমার দেশকে এই অতি-অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কিছু আমি ভাবিনি। দীর্ঘ সময় ধরে অপার সহিষ্ণুতায় আমার দেশমাতা এই যন্ত্রণা সহ্য করেছেন; এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে অত্যাচারীকে যতই হিংস্র এবং পৈশাচিক মনে হোক না কেন এই মহত্তম কর্মপ্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য যথেষ্ট একতা এবং শক্তি আয়ারল্যাণ্ডের মানুষের আছে। এই কথাগুলো আমি আন্তরিক ভাবে জেনে প্রভূত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি, বলছি এই আত্মবিশ্বাস সংশ্লিষ্ট সান্ত্বনা থেকে। হে বিচারকগণ, কখনোই ভাববেন না যে আপনাদের সাময়িক অস্বস্তিতে ফেলবার তুচ্ছ বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য আমি এসব বলছি। একজন মানুষ, যে কখনো কোনো মিথ্যা জাহির করবার জন্য গলা তোলেনি সে তার উত্তরপুরুষের কাছে মিথ্যা ভাষণ দিয়ে কখনই তার চরিত্রকে মলিন করবে না; বিশেষ করে তার দেশের পক্ষে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবং এইরকম পরিস্থিতিতে। হ্যাঁ বিচারক-বৃন্দ, এমন মানুষ, দেশ মুক্ত না-হওয়া অবধি সমাধিফলক পর্যন্ত যার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত, অত্যাচারী শাসক যাকে কবরে পাঠাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে, সে কখনো ঈর্ষান্ধ শত্রুর হাতে হাতিয়ার তুলে দেবেনা। অথবা তার আপন নৈতিক দৃঢ়তাকে, সংশয়াচ্ছন্ন করবার ভণ্ডামি নীরবে মেনে নেবে না। কারণ কবরস্থ হবার পরও এই নৈতিক দৃঢ়তাকে সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

পুনরায় আমি বলছি, আমি যা বলেছি তা আপনার উদ্দেশে নয়, (বিচারক বক্তব্যের মধ্যপথে বাধাদানের চেষ্টা করেন) কারণ আপনি যে পদে আসীন তা আমার অন্তরে ঘৃণা নয়, করুণার উদ্রেক করে। আমার অভিব্যক্তি আমার দেশবাসীর জন্য। এখানে যদি একজনও

খাঁটি আইরীশ উপস্থিত থাকেন, আমার কথাগুলো তাঁকে যেন নিদারুণ যন্ত্রণার মুহূর্তেও অনুপ্রাণিত করে।

(বিচারক নরবুরি বাধা দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কথা শোনবার জন্য তিনি বসে থাকতে পারেন না)

আমি সর্বদাই এই ধারণা পোষণ করেছি যে বিচারকের কর্তব্য হল কারান্তরিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ বিচার-বিবেচনা করে তবেই আইনের রায় ঘোষণা করা। একথাও সর্বদাই জেনে এসেছি যে বিচারক সময়ে সময়ে ধৈর্য সহকারে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অভিযুক্তের বক্তব্য শোনাও তাদের কর্তব্য বলে মনে করেন; আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, সহৃদয়তার সঙ্গে সে সম্বন্ধে তাকে ওয়াকিবহাল করা এবং অভিযুক্তের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে মরমী অভিমত প্রদান করাও তার কর্তব্য। শুধু এটুকু কর্তব্য সম্পন্ন করতেও যদি বিচারক অপারগ হন, তবে কোথায় রইল আপনার প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার দম্ভোক্তি। হতভাগ্য এক বন্দী, যাকে আপনারা ন্যায় বিচারের খাতিরে নয়, শুধুমাত্র নীতিগত কারণে ঘাতকের হাতে তুলে দিতে চলেছেন, সে যদি তার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার কর্মপ্রেরণার নীতি-নির্দ্ধারক কারণগুলির যথার্থতা প্রতিপাদন করতে না পারে—কেন তবে এই আদালত নিরপেক্ষতা, ক্ষমাশীলতা এবং সংবেদনশীলতার বড়াই করে।

হে ধর্মাবতার, এটাই হয়ত আপনাদের রোষপরায়ণ বিচাররীতির একটা অঙ্গ। মানুষের মনকে নত করা, উদ্দেশ্যমূলক দুর্নাম রটিয়ে তাকে অপমানিত করে ফাঁসির মঞ্চে ঠেলে দেওয়া; কিন্তু আমার কাছে ফাঁসির বিভীষিকার চেয়েও যা জঘন্য লজ্জার বিষয় তা হ'ল বিকৃত এবং ভিত্তিহীন অভিযোগের কলঙ্ক যা এই আদালত আমার চরিত্রে আরোপ করেছে।

ধর্মাবতার, আপনি একজন বিচারক; এবং ধরা যাক আমি অপরাধী। তবুও আমি একটি মানুষ; এবং আপনিও একজন মানুষ। বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে আমরা পরস্পর স্থান পরিবর্তন করতে পারি। আমি আপনার আসনে আর আপনি আমার জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারেন কিন্তু আমরা কখনই আমাদের চরিত্র পাল্টাতে পারবো না। আমি যদি এই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার চরিত্রকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, আপনার বিচার কি প্রহসনে পর্যবসিত হয় না। কোন্ স্পর্দ্ধায় আপনি আমার চরিত্রে মিথ্যা-কুৎসার কলঙ্ক লেপন করেন? আপনাদের অপবিত্র বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ডে আমি দণ্ডিত। তবে কেন আমার জিহ্বাকে স্তব্ধ আর আমার সুনামকে তীব্র নিন্দায় আচ্ছাদিত করার প্রয়াস? আপনার ঘাতক আমার আয়ুকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ আছে, আমার চরিত্র এবং উদ্দেশ্যকে মিথ্যা কলঙ্কের কালিতে নিমজ্জিত করার প্রচেষ্টাকে আমি অবিরত আড়াল করে দাঁড়াবো। মানুষ হিসাবে সুযশ আমার কাছে প্রাণাধিক প্রিয়। প্রাণের শেষবিন্দু দিয়েও আমি সেই সুনামকে যা আমার মৃত্যুর পরও টিকে থাকবে তাকে রক্ষা করে যাব। আমার উত্তরকালের মানুষ যাদের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে, ভালবাসা আছে, যাদের জন্য মৃত্যুবরণে আমি গর্বিত, তাদের জন্যই আমার অমলিন চরিত্রের এই স্মৃতি রেখে যাওয়া। মানুষ হিসাবে, হে বিচারক, শেষের সেই দিনটিতে আমাদের এক অভিন্ন আদালতে হাজির হতে হবে; আর তখনই হৃদয়-সন্ধানী নিখিল বিশ্বকে দেখিয়ে দেবেন কোন মানুষ সর্বাপেক্ষা পুণ্যকর্মে নিযুক্ত ছিল, মহত্তম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। আমার দেশকে উৎপীড়নকারী—

(এসময় এম্মেতকে আইনের রায় শোনবার আদেশ দেওয়া হয়)

হে বিচারক, একটি মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ তার সম্প্রদায়ের কাছে নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করতে চায়। এই বিচার চলাকালে তার উপর অসঙ্গত ভর্ৎসনা বর্ষিত হয়েছে। তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিপণ্য করে, শ্রেণীচ্যুত ক'রে, তার দেশকে স্বাধীন করবার বাসনাকে তুচ্ছ বিবেচনা করা হয়েছে—এই চক্রান্তকে প্রকাশ করবার অধিকার থেকে সে কি বঞ্চিত হতে পারে? কেন আপনারা আমাকে অপমান করছেন? অথবা কেন আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত নয় একথা আমাকেই ব্যাখ্যা করতে ব'লে আপনারা কি বিচার ব্যবস্থাকেই অপমান করছেন না? আমি জানি ধর্মাবতার, আমাকে এ প্রশ্ন করতে আপনি বাধ্য। প্রচলিত আইনে তা নির্দিষ্ট করা আছে। এই রীতি অনুযায়ী উত্তর দেবার অধিকারও বলবৎ আছে। সন্দেহ নেই, যে কোন মুহূর্তে এ অধিকার বাতিল হতে পারে, এই বিচার আড়ম্বরেরও একই ভবিতব্য হতে পারে, কারণ জুরিবর্গ তালিকাভুক্ত হবার আগেই দুর্গ প্রাসাদে শাস্তি ঘোষিত হয়ে গেছে। আপনারা—বিচারকগণ—সেই প্রত্যাদেশ প্রকাশের মাধ্যম মাত্র।

আমি ফ্রান্সের গুপ্তচর হিসাবে অভিযুক্ত হয়েছি। ফ্রান্সের গুপ্তচর! এবং সেটা কিসের স্বার্থে? অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যে আমি আমার দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিতে চাই; এবং সেটাই বা কি কারণে? এটাই কি আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিষ্ট? আইনের বিচার সভায় কি এই পদ্ধতিতেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা হয়? না, আমি গুপ্তচর নই; আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশপ্রেমিকদের মাঝে নিজের একটা জায়গা করে নেওয়া, ক্ষমতার মোহে নয়, আর্থিক লাভের জন্যও নয়, মহৎ-কীর্তির মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। আমার দেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেবো ফ্রান্সের কাছে? কি কারণে? প্রভু বদলের জন্য? না, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য? হায়, আমার স্বদেশ! আমার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি আমাকে প্রভাবিত করতে পারে? আমার কর্মধারার অন্তর্নিহিত

উদ্দেশ্য যদি তাই হতো, আমি কি আমার শিক্ষা, আমার সৌভাগ্য, আমার পারিবারিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনুসারে নিজেকে আপনাদের মতো নিপীড়কদের মাঝে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারতাম না? কিন্তু, আমার দেশই আমার উপাস্য দেবী। এই কারণে আমি সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করেছি, সমস্ত প্রিয় ভাবপ্রবণতাকে বর্জন করেছি, আর এখন তো নিজেকেই উৎসর্গ করছি। হায় ঈশ্বর! না বিচারকবৃন্দ, আমি একজন আয়ারল্যাণ্ড-বাসীর উচিত কর্ম করেছি। দেশকে বিদেশী এক নিষ্ঠুর পীড়নকারী শাসকের এবং এদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ মাতৃঘাতক দেশীয় চক্রান্ত-কারী চক্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবার সঙ্কল্প করেছিলাম। এদের এই বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ কলঙ্কিত অস্তিত্ব ও সচেতন কলুষতার জোয়াল থেকে দেশকে মুক্ত করবো, এই ছিল আমার অভিলাষ। আমার হৃদয়ের অভীপ্সা ছিল এই লৌহকঠিন দ্বি-মুখী স্বৈরতন্ত্রের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করা। আমার অভিপ্রায় ছিল দেশমাতার স্বাধীনতাকে এমন এক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁর নাগাল না পায়। বিশ্বমাঝে ওই উন্নত অবস্থায় দেশকে পৌঁছে দেওয়াই ছিল আমার মনোবাসনা। ফ্রান্সের সঙ্গে যোগাযোগ প্রকৃতপক্ষে ততটুকুই অভিপ্রেত ছিল যা পারস্পরিক স্বার্থে অনুমোদিত বা প্রয়োজনীয়। ফরাসীরা যদি আমাদের বিশুদ্ধ স্বাধীনতার অন্তরায় হয়ে কর্তার রূপ পরিগ্রহ করত, তবে তা হত তাদেরও ধ্বংসের সঙ্কেত। আমরা তাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছি—যুদ্ধের সহায়ক শক্তি এবং শান্তির সময়ে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে। ফরাসীরা যদি হানাদার বা শত্রু হয়ে আসত, দেশবাসী যদি তাদের অনাহূত মনে করতেন, সর্বশক্তি নিয়োগ করেই তাদের রোখা হত। আমার পরামর্শ ছিল সমুদ্রতটে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আপনার এক হাতে তরবারি অন্য হাতে মশাল রাখুন। অন্তরে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ক্রোধ নিয়েই

আমি তাদের সঙ্গে মিলিত হবার কথা ভেবেছিলাম। আমার দেশের মাটি অপবিত্র করবার আগেই তাদের সংহার করবার জন্য আমার দেশবাসীকে আমি সঞ্জীবিত করে তুলতাম। একান্তই তারা যদি আমার দেশে পদার্পণে সমর্থ হয়, উৎকর্ষ শৃঙ্খলা স্থাপনের নামে দেশ পরিত্যাগে অরাজী হয়, প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য আমি তখন লড়াই চালাব। প্রতিটি তৃণ জ্বালিয়ে দেবো এবং পরিখা-আবৃত শেষ স্বাধীন ভূমিটুকুই হবে আমার কবরস্থল। আমি নিজে আর কি করতে পারি, যদি আমার পতন হয়, আমার দেশবাসীকে শেষ কাজটুকু সিদ্ধ করবার দায়িত্ব অর্পণ করাই আমার উচিত; কারণ অত্যন্ত সচেতনভাবেই আমি অনুভব করি যে দেশ যদি পরাধীন হয়, জীবন তখন মৃত্যুর চেয়েও হীন। কিন্তু শত্রু হিসাবে তো ফরাসীরা আসছে না। তারা আসবে দুর্দশায় সাহায্যকারী বন্ধুর মতো। হ্যাঁ, বাস্তবিকই আমি ফরাসীদের সাহায্য চেয়েছি; ফ্রান্স তথা তামাম বিশ্বের কাছে আমার একথাই প্রমাণ করবার অভিলাষ ছিল যে আয়ারল্যাণ্ডের মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন—দাসত্বের প্রতি তাদের ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং দেশকে স্বাধীন ও মুক্ত করবার জন্য তারা প্রস্তুত। আমার দেশের জন্য আমি তেমন আশ্বাসই চেয়েছি যা ওয়াশিংটন পেয়েছিলেন আমেরিকার জন্য। আমি চেয়েছি একটা জাতির সাহায্য, যে-জাতির শৌর্য, শৃঙ্খলা, বীরত্ব, অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও চরিত্র গঠনের সহায়ক হবে। তারা আসবে আগন্তুক হিসাবে, কিন্তু আমাদের বিপদের সাথী হবে, আমাদের ভাগ্যকে সুনিশ্চিত করে তারা বিদায় নেবে পরম বন্ধুর মতো। আমার উদ্দেশ্য ছিল নতুন প্রভুকে স্বাগত জানানো নয়, পুরনো স্বৈরাচারীর নির্বাসন, এ সব কারণেই আমি ফরাসীদের সাহায্য কামনা করেছিলাম। কারণ যে শত্রু বর্তমানে আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আছে, তার চাইতে অনেক সহজে পরাভূত করা যাবে ফরাসীদের, যদি তারা

শত্রুও হয়। আমার দেশকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমার ভূমিকা এতো গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে মনে হবে আমিই আয়ারল্যাণ্ডবাসীর ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু অথবা ধর্মাবতারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী—"ষড়যন্ত্রের রক্তমাংস"। আসলে আপনি আমাকে খুব বেশী সম্মান দিয়ে ফেলেছেন; উচ্চতর পদাধিকারীর প্রাপ্য সকল গৌরব দিয়েছেন একজন নিম্নপদস্থ সেনাপতিকে। এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন এমন সব ব্যক্তি যাঁরা শুধু আমার থেকেই বড় নন, এমনকি, ধর্মাবতার, আপনি নিজেকে যা মনে করেন তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। এঁরা সব এমনই মানুষ যাঁদের প্রতিভা ও গুণের মহিমার সামনে সশ্রদ্ধ বিনয়ে আপনাকে মাথা নত করতে হবে এবং তাঁরা আপনার রক্ত-কলঙ্কিত হাত স্পর্শ করতেও অপমানিত বোধ করবেন।

আমাকে খুন করবার জন্য এই স্বৈরাচারী শক্তি (আপনি যার ঘাতকরূপী দালাল মাত্র) ফাঁসির মঞ্চ স্থাপন করেছে। সেইদিকেই আমি পা বাড়িয়েছি। কাজেই আপনি আর আমাকে কি শোনাবেন, হুজুর? অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে অত্যাচারিতের যত রক্ত ঝরছে এবং ঝরবে, একমাত্র আমিই কি তার জন্য দায়ী? আর আমি কি এমনই ক্রীতদাসে পর্যবসিত হব যে অত্যাচারীকে বাধা দেবো না? আমার সারা জীবনের কাজের কৈফিয়ৎ দেবার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সম্মুখীন হতে আমি ভয় পাই না। কি করে আমাকে আতঙ্কিত বা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করবেন আপনারা? আপনারা যে নশ্বর জগতের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ। আপনিও পারবেন না যদিও আপনার অপবিত্র রাজত্বে আপনি যত নিরপরাধ মানুষের রক্ত ঝরিয়েছেন তা একটি বিরাট আধারে সঞ্চিত করা হলে, আপনি হুজুর তার মধ্যে সাঁতার কাটতে পারতেন।

আমার মৃত্যুর পর কোন মানুষ যেন আমার বিরুদ্ধে অমর্যাদাকর আচরণের অভিযোগ আনতে সাহসী না হয়। কোন মানুষ যেন আমার স্মৃতিকে কলঙ্কিত না করে। একথা যেন কেউ বিশ্বাস না

করে যে আমার দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তি ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যে আমি নিয়োজিত থাকতে পারতাম, অথবা যে-ক্ষমতা আমার দেশের উৎপীড়ন ও দুর্দশার জন্য দায়ী আমি তার আজ্ঞাবহ গোলাম হতে পারতাম। অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাই আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। এর থেকে কেউ হাজার চেষ্টা করেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে না যে দেশের বর্বরতা ও নৈতিক বিচ্যুতি অথবা বৈদেশিক শক্তির দমন বা বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি আমাদের সমর্থন আছে। যে কারণে আমি দেশীয় অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করেছি, সেই একই কারণে আমি কোন বিদেশী অত্যাচারীর কাছে নতি স্বীকার করতাম না। স্বাধীনতার মর্যাদার জন্য আমি আমার স্বদেশের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে লড়াই করতাম এবং স্বাধীনতার শত্রুদের প্রবেশ করতে হলে আমার প্রাণহীন দেহ অতিক্রম করেই করতে হত।

দেশের জন্যই আমার জীবনধারণ। যে-আমি ঈর্ষাপরায়ণ সদাসতর্ক নিপীড়কের বিরোধিতা করে নিজের বিপদ ডেকে এনেছি, কবরে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছি কেবলমাত্র আমার দেশবাসীকে স্বাধিকার প্রদান এবং দেশমাতাকে স্বাধীন করবার জন্য—সেই আমাকে মিথ্যা অপবাদে ভারাক্রান্ত করা হবে আর আমি তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে অবিচল থাকতে পারি? না, ঈশ্বরের দোহাই, আমি তা পারবো না।

[এ সময় বিচারক বললেন যে এম্মেত তাঁর পরিবার এবং শিক্ষাকে অসম্মান করেছেন, এবং বিশেষ করে তাঁর পিতা ডঃ এম্মেত যদি জীবিত থাকতেন এই ধরনের মতামতে মোটেই প্রসন্ন হতেন না।]

৫

কী ভালই না হত যদি মৃত মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের আত্মাগুলি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে প্রিয়জনদের শুভ-অশুভে আগ্রহী বা উৎসুক

হতেন, আমার শ্রদ্ধেয় এবং সদাপ্রিয় মৃত পিতার ছায়া যদি তাঁদেরই একজন হতেন। হে পিতা, আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আপনার নিগৃহীত সন্তানের যাবতীয় কার্যাবলী বিচার করে দেখুন, এবং লক্ষ্য করুন, একমুহূর্তের তরেও, সেই নৈতিকতা এবং স্বদেশপ্রেম যা আপনিই সযত্নে আমার যৌবনদীপ্ত মনে অঙ্কুরিত করেছিলেন এবং যে কারণে এখন আমাকে জীবন উৎসর্গ করতে হচ্ছে, তা থেকে আমি বিচ্যুত হয়েছি কিনা। বিচারকগণ, আমার জীবনদানের লগ্নকালের জন্য আপনার অধৈর্য হয়ে উঠছেন। যে রক্তাঞ্জলির জন্য আপনারা উন্মুখ, সে রক্ত এখনো আপনাদের মন-গড়া সন্ত্রাসে আতঙ্কত্রস্ত জীবনের মতো শীতল হয়নি। তা এখনো উষ্ণ এবং নির্দেশিত মহৎ-কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশে নিরুদ্বিগ্ন-ভাবে শিরাউপশিরায় প্রবাহমান স্রষ্টা। কিন্তু আজ সেই প্রাণকে যে শোচনীয় কারণের জন্য আপনারা বিনষ্ট করতে উদ্যত, তাতে স্বর্গ রোরুদ্যমান। আর একটু ধৈর্য ধরুন, আর সামান্যই বলার আছে—আমার যাত্রা এখন নীরব হিমেল সমাধির দিকে—আমার জীবন-দীপ নির্বাপিত প্রায়,—আমার চলা এখন সমাপ্ত—অতল গহ্বর আমাকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য অধির, আমি তার গভীরে পরম আশ্রয় লাভ করবো। এ পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে আমার একটি মাত্র অনুরোধ আছে; সেটা হল আমাকে নিয়ে সোরগোল না তোলা। কেউ যেন আমার স্মৃতি-ফলক না নির্মাণ করেন, আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুবিদিত কোন মানুষ যেন এখন আমার কার্যাবলীর যথার্থতা প্রমাণে প্রয়াসী না হন; কুসংস্কার আর অজ্ঞতার সুযোগে ওরা যেন কলঙ্ক রটানোর সুযোগ না পায়। আমাকে এবং অন্য সকলকে সবার অন্তরালে পরমশান্তিতে চিরবিশ্রাম নিতে দিন। আমার সমাধি অখোদিত থাকুক, আমার স্মৃতি বিস্মরণের অতলে সুপ্ত থাক, যতদিন না অন্য কালের অন্য মানুষ আমার চরিত্রের সুবিচার করতে পারেন। যতদিন পর্যন্ত আমার দেশমাতা এই ভূমণ্ডলে তাঁর

আপন আসন প্রতিষ্ঠা না করছেন ততদিন যেন আমার সমাধিফলক লেখা না হয়। আমি শেষ করলাম।

অনুবাদ ॥ প্রদীপ ভট্টাচার্য

(এই মামলার বিচারক, লর্ড নরবুরি, অত্যন্ত দুরভিসন্ধি মূলক অন্যায় আচরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি এম্মেতের বীরত্বব্যঞ্জক অনমনীয় বক্তব্যে বাধা দানে অপারগ হন। নরবুরি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করামাত্রই এক মহিলা এই অভিযুক্ত মানুষটিকে একটি ল্যাভেণ্ডারের পল্লব দেবার জন্য ঝটিতে সামনে এগিয়ে যান। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কিন্তু সেটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং পাছে জনতা আরো বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, সেই আশঙ্কায় এম্মেতকে দ্রুত আদালত কক্ষ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁসির দিন দয়ালু কারারক্ষীর সঙ্গে এম্মেতের করমর্দনের ইচ্ছা ছিল। হাতকড়ার জন্য তিনি তা পারেননি, পরিবর্তে তিনি কারারক্ষীটির গালে চুম্বন করেন। কারারক্ষী মূর্চ্ছিত হয়ে যান এবং বলা হয় এম্মেতের ফাঁসি সাজ হবার আগে তাঁর সে মূর্চ্ছা ভাঙেনি।

এম্মেতের ইচ্ছানুসারে কোন সমাধিফলক নির্মিত হয়নি, এমনকি তাঁর কবরস্থানটি পর্যন্ত অজানা থেকে যায়, কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের প্রতিটি মানুষের কাছেই প্রেম এবং অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণার এক মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর স্কুল জীবনের সঙ্গী, টমাস মুর, তাঁকে অবিস্মরণীয় করে তোলেন, 'হায়! তাঁর নাম উচ্চারণ কোর না' নামে একটি কবিতা লিখে। পরবর্তীকালে এই কবিতায় সুর সংযোজনা করেন বেরলিওজ এবং ওয়াশিংটন আর্ভিঙ তাঁকে উপজীব্য করে "ভগ্ন হৃদয়" রচনা করেন। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন ও অন্য বহু উদারচিত্ত মহৎপ্রাণ মানুষকেই এম্মেতের কর্মজীবন গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।)

আন্দোর এন্দ্রে গেল্লেরি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে বিমান আক্রমণে অথবা কন্‌সেনট্রেশান ক্যাম্পে হাঙ্গেরির বহু লেখক প্রাণ হারান—ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক, নবীন ও প্রবীন অনেক প্রতিভা। গেল্লেরিও তাঁদেরই একজন। তাঁর জীবন অকালে সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি চারটি ছোটগল্প সঙ্কলন ও একটি উপন্যাস লিখে রেখে গেছেন।

গেল্লেরির সৃষ্টি নাটকীয়তা ও বাস্তবতার মধ্যে, কল্পনা ও কঠোর সত্যের মধ্যে একটি সংলাপ। ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অশান্তি ও বিপদের শঙ্কা মানুষকে তোলপাড় করে তুলেছিল। গেল্লেরি সেই সময়কে ধরে রেখেছেন তাঁর সাহিত্যে—তাঁর চরিত্ররা আশাহীনতায় ভোগে অথচ বাঁচবার অদম্য বাসনায় টান ধরেনা। জীবনের যন্ত্রণা ও আনন্দ যুগপৎ মথিত করে তাদের।

বুদাপেস্টের ওবুদা অঞ্চলের প্রলেতারিয়েত, বেকার যুবক, নিঃসম্বল হস্তশিল্পী, সুরাসক্ত শ্রমিক, মুটে মজুর—এদের সঙ্গেই ছিল গেল্লেরির ওঠাবসা। দারিদ্র্য ও আতঙ্কের মধ্যেও তিনি মানবতা আর সৌন্দর্য্য দেখেছেন। তাঁর চরিত্রদের তিনি তুলে নিয়ে যেতেন তাঁর সৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক রূপকথার জগতে যেখানে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্য ঝলসে ওঠে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতদের জগতে, জীবনের কিনারায় যারা দাঁড়িয়ে আছে, সেই দরিদ্রদের দুর্বিসহ বিষন্ন জগতে। গেল্লেরির ছোটগল্প নির্মম বাস্তবকে পুনরসৃষ্টি করেও জীবনের আনন্দকে হারাতে রাজী নয়। সেইখানেই তাঁর মহত্ব। তাঁর ছোটগল্পে জড়িয়ে আছে শুদ্ধ কবিতার গন্ধ। সঙ্কলনের অন্তর্ভূক্ত গল্পটি ১৯৩০ সালে রচিত।

আন্দ্রোর এন্দ্রে গেল্লেরি

আমি তখন বেকার। একটা পার্কের ভেতরে গা এলিয়ে শুয়ে ছিলাম আর ঘুমজড়ানো চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম মাঠে ও গাছের চুড়োয় সবুজ রঙের খেলা। ঘড়িতে যখন এগারোটা, চোখে পড়ল সরু রাস্তাটা দিয়ে সুন্দরী একটি মেয়ে হেঁটে আসছে, অল্প অল্প নাচছে তার বুক। নেশাগ্রস্তের মতো আমি তাকিয়ে রইলাম। পার্কের দূর কিনার পর্যন্ত ও হেঁটে গেল, তারপরে দিগন্তের নিচে সূর্য যেমন ডুবে যায় তেমনি মিলিয়ে গেল। আমি আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে।

আমার এই আচ্ছন্ন ভাব থেকে চমকে জেগে উঠলাম একটা মাল-টানা গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ শুনে। গাড়িটা টানছে চকচকে সোনালী-বাদামী একটা ঘোড়া, পীচ-বাঁধানো রাস্তার ওপরে ভারী খুর ঠুকে ঠুকে। শুধু শার্ট পরা গাড়োয়ান হাওয়ায় চাবুক মেরে মেরে শিস তুলছে, যেন সোল্লাসে তাল দিচ্ছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজের সঙ্গে। তার পেছনে ও তার আসন আঁকড়ে বসে আছে হো-হো আর হাসি-মস্করায় তুখোড় একদল মত্তপ খালাসী।

ওরা সোজা চলে গেল গাছগুলোর কাছে, তারপরে গাড়িটাকে সযত্নে দাঁড় করাল রাস্তার ধারে পাথরের গায়ে। গাড়িতে বোঝাই করা ছিল যন্ত্রপাতি, তার ওপরে উঠে দাঁড়াল একজন, ছোট একটা দূরবীন চোখে লাগিয়ে এমন ভাবে দেখতে লাগল যেন সমুদ্র জরিপ করছে। চিৎকার করে বলল, 'কাজের লোক কেউ আছ এখানে? দুই পেংগো কামাতে চাও এমন কেউ আছ?' শুনেই আমি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে পার্ক থেকে বেরিয়ে এলাম, যেন সবুজ একটা কয়েদখানা থেকে ছাড়া পাচ্ছি। লাফিয়ে উঠে পড়লাম গাড়ির ওপরে। তারপর নিজেকে যখন খানিকটা সামলিয়ে নিয়েছি সেই লোকটি, যে হাঁক দিয়েছিল, আমার কাছে এসে খুশির সঙ্গে হাসল,

আমার হাতে একটা রুটি দিয়ে বলল, 'নাও হে, খেয়ে নাও, আগে পেট জুড়োও, নইলে ওখানে গিয়ে খাবি খাবে…দুই পেংগো পরে পাবে তুমি…কাজটার জন্যে ঘণ্টা দুয়েক সময় দিতে হবে…আর বালতিখানেক ঘাম।'

অন্য আরেকজন জিজ্ঞেস করল, 'কি স্যাঙাৎ, অনেকদিন বেকার নাকি?' গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করেছিল, সেই শব্দে লোকটির কথা ডুবে গেল, যেমন ডুবে গিয়েছিল তার সঙ্গীর কথাগুলোও। আর আমি ভুলে গেলাম গত কয়েক সপ্তাহের সমস্ত তিক্ততা, রুটিতে ঠাসা মুখ কোনোরকমে নেড়ে বিড়বিড় করে জবাব দিলাম, 'ছ…হপ্তা…'

আমাদের কাজ, মার্বেল পাথরের সিঁড়িওলা বিশাল এক কোঠাবাড়ির দোতলায় একটি সিন্দুক টেনে তোলা। আমি এমন একটা ভাব দেখাতে চেষ্টা করছিলাম যেন এ-কাজে আমি খুবই পাকাপোক্ত। কিন্তু আমি দেখে অবাক হলাম যে কত সহজে সেই প্রকাণ্ড জিনিসটা দুটো লোহার পাতের ওপর দিয়ে পিছলে সিঁড়ির তলা পর্যন্ত চলে এল, যেন জিনিসটার কোনো ওজনই নেই। এজন্যে সময় লাগল বড়ো জোর পাঁচ মিনিট। তারপরে যখন আমরা মনুষ্য-রূপী ঘোড়ার মতো শক্ত কাঠের পাটায় কাঁধ দিলাম আমার মনে হতে লাগল আমার শরীরের সমস্ত জোর ফিরে এসেছে। জোরদার গলায় হেইও-হো আওয়াজ তুলে আর টান মেরে ও ঠেলা লাগিয়ে সিন্দুকটাকে আমরা ঝকঝকে সাদা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলতে লাগলাম। কাঠের পাটার ধারে ধারে আংটা লাগানো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে দড়ি গলানো, সেই দড়িতে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আংটাগুলো কাৎরে কাৎরে উঠছে। একটু আগেও যে মানুষ-গুলো ছিল হাসিখুশি তারা আমার মতোই জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে, তাদের লাল হয়ে ওঠা মুখগুলো থেকে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে। তারপর দোতলায় ওঠার পরে যখন খাসা এক চাকরানী

আমাদের কাছে বাচালপনা করতে লাগল, মস্ত জুলপিওলা খাস আমলা হোমরাচোমরার মতো ভাবভঙ্গি করে আমাদের পথ দেখাতে লাগল, তারপরে যখন আমরা ওস্তাদি দেখাতে দেখাতে ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে সিন্দুকটাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম আর রঙচঙে ঝালর ও কাটা আয়নার মধ্যে থেকে চটকদার ছিমছাম এক মহিলা আমাদের আমদেদ জানাল, যখন সেই কাটা আয়নাগুলোর মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল আমাদের জবরদস্ত ভঙ্গি ও ধীরেসুস্থে গড়িয়ে চলা সিন্দুকটার ছায়া—তখন, তখনই এই পেশাটার ওপরে আমার ভয়ানক একটা পছন্দ এসে গেল। তারপরে, যে সরাইখানায় এই দলটা তাদের দফতর বসিয়েছে সেখানে যখন আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম, মস্ত মোচওলা বুড়ো জোই-র হাত ধরে সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'আমাকে বরাবরের মতো তোমাদের দলে নিয়ে নাও না কেন।'

অন্যরাও আমার কথাগুলো শুনেছিল, কিন্তু এমনভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল যেন জবাবটা ওখানে লেখা আছে। তারপরে ঠোঁট কুঁচকিয়ে, মোষের মতো তাদের কাঁধগুলো ঝাঁকিয়ে, এই বলে নালিশ জানাতে লাগল যে ব্যবসায়ে খুবই মন্দা চলছে, তাদের নিজেদের উপার্জনই এত কম যে খাওয়া জোটে না।… তারপরে আচমকা মত বদলিয়ে কথাটায় সায় জানাল।

তারপর থেকে আমিও ওদের দলের একজন। হাতে কাজ না থাকলে বসে থাকি, আমার সামনে থাকে পশমের মতো ফেনা-ওঠা মদের গেলাশ। কিংবা তাকিয়ে থাকি উঁচু করে বসানো জানলার দিকে, সেখানে চোখে পড়ে ধড়হীন মুণ্ডুগুলো ওঠা-নামা করতে করতে আর উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। কাজ এসে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙি, হাই তুলি, তারপরে কষ্টে সৃষ্টে গাড়িতে চাপি। এখন আমি চালচলনে হয়ে উঠেছি আমার

সঙ্গীদের মতোই, ওরা যেমন রাস্তা দিয়ে চলার সময়ে শিস দিতে দিতে একটা বেপরোয়া ভাব দেখায়—আমিও তেমনি। ওরা যেমন গাড়ির ঝাঁকুনিতে নির্বিকার থাকে, আমিও ঠিক তেমনিভাবে আমার পুরুষ্টু শরীরের কাঠামোটাকে ঝাঁকুনি খেতে দিই। পাশ দিয়ে যদি কোনো মেয়ে যায় আমরা তার দিকে অশ্লীল কথা ছুঁড়ে দিই, আর তারপরে গড়গড়িয়ে চলতে থাকি। স্জেপি এই দলে সবচেয়ে জোয়ান মদ্দ, রোজ সকালে ওজন তোলে। অমন গোটা তিরিশেক পড়ুয়াকে যদি সামলাতে হয় তাহলে আমরা তো সোজা পিট্টান দিই।

কোনো পার্কের পাশ দিয়ে যখন যাই আমার ওপরে ভার পড়ে আশেপাশে যে-সব বেকার লোক ঘুরঘুর করছে তাদের উদ্দেশে হাঁক দেওয়া : 'শোন হে তোমরা, চলে এস, কাজ আছে।' এমন যদি কেউ আসে যে খুবই রোগা বা দুবলা, আমি হাত নেড়ে তাকে ফিরে যেতে বলি। 'আরে ভাই, তোমার মতো হাড় জিরজিরে শরীর দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না।' তাকে বলি, বলতে বলতে সারি নামে আমাদের যে মোটা বাদামী ঘোড়া তাকে টগবগিয়ে ছুটিয়ে দিই। দেখতে পাই যাকে বাতিল করা হল মাথা নুইয়ে পা টেনে টেনে ফিরে চলেছে, এমনকি হয়তো-বা কাঁদছেও।

আমাকে, আমাকে দিয়েই ওরা ইচ্ছে করে এই কাজ করায়, যাতে আমি আগেকার খারাপ দিনগুলোর কথা ভুলে না যাই।

প্রায়ই আমরা মদ খেয়ে হুল্লোড় করতে যাই। গত রাতেও দুটো ছুঁড়ির সঙ্গে বেদম ফুর্তি লুটে এসেছি—সোনালী-চুল তেস আর ঝাঁঝালো গিসেলা। দারুন জমেছিল সন্ধেটা, পুরোপুরি! প্রচুর বীয়ার আর মশলা দেওয়া মদ টেনেছিলাম। জোই করল কি, অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছিল যে মোটা লোকটা তাকে ঠেলে দিল টেবিলের তলায়, আর হুকুম দিল ওখান থেকেই যেন সে বাজনা বাজায়। তারপরে লাল-চুলওলা মাগীটার কোমর জড়িয়ে ধরে

টেবিলের ওপরে তার সঙ্গে নাচল। কী প্রচণ্ড আর কী উদ্দাম সেই নাচ, মনে হচ্ছিল জোই কখনো পঞ্চাশে পা দেয়নি।

হোটেলের ওই মাগীদুটো আমাদের হাড়হদ্দ বার করে দিয়েছে, তাই আজ সকালে বিরস মুখে আমরা চুপচাপ বসে আছি, প্রচুর পরিমাণে সোডা গিলছি আর প্রচণ্ড টক লেবু খাচ্ছি। একমাত্র বুড়ো জোই দেমাকের সঙ্গে তাকাচ্ছে সেই টেবিলটার দিকে, লাল-চুলওলা মাগীটার সঙ্গে যেখানে সে পা রেখেছিল সেই জায়গাটায় এমনকি হাত বুলোচ্ছে।

এখন ভরা গরমকাল, চারদিকে নীল বোতলের ছড়াছড়ি। জলের ছিটে দেওয়া মেঝের ঠাণ্ডায় পা রাখতে ভালোই লাগছে আমাদের। সরাইখানার মালিকের কুকুর বোদ্রি যে আমাদের অলস আঙুলের ডগাগুলো চাটছে তাও আমরা খুব একটা গায়ে মাখছি না।

স্জেপি তার চেয়ারে বসেই ঢুলছে, আর সারা গায়ে রোদ্দুর নিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আমাদেরও চোখের পাতা ভারী, মাঝে মাঝে একবার একটুখানি মেলছি মাত্র, পরক্ষণেই আগের চেয়ে আরো জোরে বন্ধ করছি।

সব চুপচাপ, প্রাণ না থাকার মতো। হঠাৎ তারই মধ্যে ঝনঝন করে বেজে ওঠে টেলিফোনটা। সরাইখানার মালিক তার লম্বা নল লাগানো পাইপটা নাড়িয়ে আমাকে টেলিফোনটার দিকে নির্দেশ করে। (টেলিফোন এলে লোকটা সবসময়ে আর কাউকে নয়, আমাকেই ডাকে, কেননা আমার চেহারায় বুদ্ধির ছাপ অন্যদের চেয়ে বেশি, আমি কথা বলতে পারি অন্যদের চেয়ে আরো ভালোভাবে।) অনিচ্ছার সঙ্গে আমি উঠে যাই, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আরো জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে টেলিফোনটা কানে তুলে ধরি।

'হ্যালো', বিড়বিড় করে বলি আমি, 'বলুন ম্যাডাম, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, যা বলবেন করে দিয়ে আসব, আপনাদের কাজ করে দেবার জন্যেই আমরা রয়েছি...কত নম্বর বললেন?...সাত নম্বর, টেফোর্ট স্ট্রীট,

তিনতলা···একটা সিন্দুক···সব লিখে নিয়েছি ম্যাডাম···এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি, আর এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে দিয়ে আসব···এই, পঞ্চাশ পেংগো, খুশি হয়ে দিয়ে দেবেন ম্যাডাম। এক কথা এক কাজ, কমও নয় বেশিও নয়···জানেন তো কাজটা খুবই শক্ত···হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজের ব্যাপারে নির্ভর করতে পারেন, কোনো ভুলচুক হবে না···ধন্যবাদ ম্যাডাম, আমরা এই গেলাম বলে···ঠিক আছে···।'

কামরায় ফিরে এসে হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠি : 'উঠে পড়ো সবাই, উঠে পড়ো···ফ্রান্সি, গাড়ি লাগাও।' সবাই উঠে দাঁড়ায়, আর তারপরে গাড়িতে বসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আলোচনা করে নেয় পার্ক থেকে কতজন বাড়তি লোক তুলে নেওয়া দরকার।

'পেছন দিকে দুজন হলেই কাজ চলবে।'

রাস্তা দিয়ে আমরা চলেছি সারাক্ষণ হাই তুলতে তুলতে। আমাদের হাত-পা ভারী হয়ে রয়েছে, আমাদের কোমর পাথরের মতো অনড়। আর দিনটা এতই গরম যে শার্টের বোতাম খুলে দিতে হয়েছে। আরো অনেক ভালো লাগত যদি কাজে না বেরিয়ে ঘুমোতে পারতাম। কিন্তু তা তো আর হয় না, বাড়তি দুজন লোককে যদি চার পেংগো দিয়ে দিই, তাহলেও আমাদের হাতে যা থেকে যায় তা আমাদের ছ'জনের দু'দিন বা তিনদিন চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।

বুড়ো জোই হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সিন্দুকটার মধ্যে কংক্রিট নেই তো?' আমি মাথা চুলকোই, 'এই গ্যাখ, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।'

'যদি ভিতরে কংক্রিট থেকে থাকে তাহলে দুজনকে দিয়ে হবে না, বাড়তি লোক নিতে হবে ছ'জন। তাহলে সব পয়সাই হাওয়া।'

যাক গিয়ে, সে দেখা যাবে। আমি হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করি, আগে যেমন ওরা আমার সামনে করত। পাঁচজন লোক

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে আমাদের দিকে। সকলেই কাজ পাবার জন্যে অতিমাত্রায় উদগ্রীব। তাহলে ওদের মধ্যে থেকে কাকে কাকে নেওয়া যায়? ওই যে গাঁট্টাগোঁট্টা বেঁটে লোকটা, চ্যাটালো জোয়ান হাত, ওকে দিয়ে কাজ চলতে পারে। আর কে? ওই যে ডিগডিগে লোকটা, ওর চাউনি দেখে মনে হয় লোকটা ভালো—কিন্তু এই কাজের পক্ষে বড্ডো রোগা···যাক গিয়ে, ওই আসুক।

গাঁট্টাগোঁট্টা বেঁটে লোকটার নাম পল। লোকটা আগে থেকেই একটা সিগারেট চেয়ে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে মুখ খিস্তি করতে শুরু করে আর নোংরা কথা বলতে থাকে। সকলের ওপরে মস্তানি চালাতে চায়। কিন্তু ডিগডিগে লোকটা, যার গলা কী রোগা, নির্বাক পুতলির মতো। লোকটা সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ পিটপিট করে,—বাতাসে তার চুল এলোমেলো হয়ে যায়। ওকে দেখে মনে হয় কেউ একজন গাড়িতে চেপে ঘুরতে বেরিয়েছে আর হাওয়ার আদর উপভোগ করছে। লোকটা ভালোই, ওকে একটু সুযোগ দিলে ক্ষতি কি, যাতে ওর একটু সুরাহা হয়? কিন্তু যেই না আমরা টেফোর্ট স্ট্রীটে পৌঁছেছি, দেখি কি, লোকটা একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা বার করেছে আর চোখের ওপর এঁটেছে। সেরেছে আর কি, ওকে এত বেশি বাবু-বাবু দেখাচ্ছে, যে দলের লোকরা না ওকে এখুনি দল থেকে বাদ দিয়ে দেয়। ও কিন্তু কারও বলার জন্যে অপেক্ষা করে না, ভারী যন্তরটা তুলে নেয়, টানা দেবার চাকার দিকে গিয়ে বিনাবাক্যে সবকিছু করে চলে—বেঁটে গাঁট্টা-গোঁট্টা লোকটার একেবারে উলটো। ওকে যে আমি পছন্দ করেছি সেজন্যে এখন আমার আনন্দই হতে থাকে।

'শোন হে, তোমরা পেছনদিকে থাক', বুড়ো জোই বলে, আর তারপরে সিন্দুকের ধাতব গায়ের ওপরে একটা চাপড় মারে। 'শুনছ তো? ভেতরে কংক্রিট আছে···ওহে আইজাক, না, কি যেন নাম তোমার,' এই বলে নতুন দুজনের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, 'তুমি এই

শাবলটা নাও, সিন্দুকটা আটকে ধরো, একটুও যেন পিছলে সরে না আসে, একচুলও নয়, এতে যদি তোমার শিরদাঁড়া ভাঙে তবুও ধরে রাখবে। আর শোন পল, তোমাকে বলছি, তুমি ধার থেকে সিন্দুকটাকে ঠেলা মারো, গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ঠেলা মারতে থাকো।'

সিন্দুকটা প্রচণ্ড ভারী। তার ওপরে সিঁড়িটা সরু, সিঁড়ির রেলিং-এর পেটা লোহার জালি জায়গায় জায়গায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া, প্রত্যেকবার ঘোরার মুখে সিঁড়ির বাঁক খুবই অল্প জায়গার মধ্যে।

রশির প্রান্তে আমরা যে যার জায়গা নিয়ে দাঁড়াই। 'হেইও-হো।'

শয়তানটা নড়বার নামও করে না। আমরা একে অপরের দিকে সমঝদারী চোখে তাকাই: আমাদের কুঁড়েমি এখনো একেবারেই কাটেনি দেখছি, আমাদের গায়ে এখনো জোর ফিরে আসেনি।

'মার কাটারি। মার। ওঠ্, ওঠ্।' সিন্দুকটা দুটো ধাপ উঠে আসে। চিৎকার করে একে অপরকে উৎসাহ দিতে দিতে খিল-ধরা হাতে আমরা রশিটা আঁকড়ে ধরে থাকি। আমাদের শরীরের শিরাগুলো ফেটে পড়ার মতো ফুলে উঠেছে।

আমার চোখের সামনে রক্তের মতো লাল কুয়াশা, তারই মধ্যে দিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা লোকটা সেখানে নেই। ও বেটা নিশ্চয়ই নিচে কোথাও আরাম করছে। তবে ডিগডিগেটা রয়েছে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে ওর চশমা দিয়ে, মুখটা সিং দরজার মতো ফাঁক করে প্রচণ্ডভাবে হাঁফাচ্ছে। লোহার শাবল দিয়ে ভারী ওজন তোলার পরিশ্রমে লোকটার প্রায় মরে যাবার মতো অবস্থা।

'শয়তানেরও কাজ নয়।' বুড়ো জোই হাঁপাতে হাঁপাতে তার পাকা মাথাটা ঝাঁকায়। তার মুখ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছিল, সেই ঘাম ফোয়ারার মতো চারদিকে পড়ে। আমার শার্টের তলার দিকটা

প্যাণ্টের ভেতর থেকে পিছলে বেরিয়ে এসেছে, আর ওপর থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাসে আমার গা শিরশির করছে। ক্রান্‌সির পেটটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, তার ওপরের পাটির দুটো খারাপ দাঁত বাড়িয়ে দিয়েছে নিচের দিকে প্রায় চিবুক পর্যন্ত। প্রচণ্ড পরিশ্রমের মেহনতে ওর নাকের ফুটোদুটো কাঁপছে। সাধারণত আমি আজকের চেয়ে দশগুণ বেশি সামলাতে পারি। কিন্তু গত রাতের মত হুল্লোড় আর ওই সোনালী-চুল জেন হতচ্ছাড়ীটার জন্যে আমার সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গীদের অবস্থা আমার চেয়ে কোনো অংশে ভালো নয়। শুধু মনে হচ্ছে আমার খোলা হাড়গুলো বেরিয়ে আছে আর সেই হাড় থেকে মাংসপেশী আলাগাভাবে ঝুলে ঝুলে আছে।

আমাদের কপাল ভালো, আমরা শেষপর্যন্ত দোতলার মুখে সিঁড়ির চওড়া জায়গাটায় পৌঁছে যাই। আমাদের শাপশাপান্ত আর গালিগালাজে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আমাদের মুখগুলো ঘোড়ার মাংসের মতো লাল, জামার হাতা দিয়ে আমরা মুখ মুছি। সুজেপি অনবরত কাশছে, কাশতে কাশতে ওর দম বন্ধ হবার অবস্থা। আর এই অবস্থাতেই কিনা একটা সিগারেট ধরাতে চাইছে। বুড়ো জোই করে কি, একটা থাপ্পড় মেরে ওর হাত থেকে সিগারেটের পুরো প্যাকেটটা ফেলে দেয়। প্যাকেটটা গিয়ে পড়ে একেবারে একতলার মাটিতে। ধমক দিয়ে বলে, 'তোমার কি এতই দম হয়েছে যে খরচ না করলেই নয়? কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

বেঁটে গাঁট্টাগোঁট্টা পল দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে আর সিন্দুক পেরিয়ে দেয়ালে থুতু ফেলছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে গালিগালাজ করে চলেছে।

ডিগডিগে সমানে তার চশমার কাঁচ মুছে চলেছে, মাঝে মাঝে চশমাটা তুলে ধরছে রোদ্দুরের দিকে আর কাঁচের ওপরে নিশ্বাস

ফেলছে। ওর মুখে কোনো কথা নেই, যতক্ষণ না আমি জিজ্ঞেস করি, 'খুব ভারী, না?' ও ঘাড় নাড়ে, 'তাই বটে।'

একটু পরে আবার আমরা হাত লাগাই। সিঁড়ির চওড়া জায়গাটা তেলা কাপড় দিয়ে ঢাকা, এতে ব্যাপারটা খুবই খারাপ দাঁড়িয়েছে। আমাদের পা ফসকে যাচ্ছে, যেন বরফের ওপর দিয়ে পিছলে চলেছি। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করার পর অনেক কষ্টে তিনতলায় ওঠার প্রথম ধাপটায় উঠতে পারি। এমন হাড়ভাঙা কাজের জন্যে পঞ্চাশ পেংগো খুবই সামান্য। এখন সবচেয়ে ভালো হয় যদি অনেকক্ষণ ধরে বিশ্রাম নিই আর আরো লোক ডেকে পাঠাই। একটা তলা ওঠানো তো ছেলেখেলা, আরো একটা তলা ওঠাতে গিয়ে বোঝা যায় সবকিছু যেন দ্বিগুণ ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাজটা শুরু করার পরে এখন যদি ছেড়ে দিই—আমরা এই আটজনের একটা দল—তাহলে সরমের আর কিছু বাকি থাকে না। আমাদের মধ্যে কেউ-ই তেমনভাবে আর মুখ খোলে না। ·· মরদ যদি হতে হয় তাহলে টেনে চলতেই হবে, যতোই কষ্ট হোক, এমনকি যদি মনে হয় যে আর পারা যাচ্ছে না—তখনো।

সঙ্গীদের সঙ্গে আমি মনেপ্রাণে এক হয়ে আছি, আমি জানি আমার কাছে যা বড়ো বেশি ভারী আমার সঙ্গীদের কাছেও সেটি তাই। তাই তিনতলার সিঁড়ির প্রথম বাঁকটায় এসে আমি তো রীতিমতো আতংকিত হই। আমি টেনেই চলি আর নিজের অজান্তেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকি। সিঁড়ির কিনারে বারবার আমার পা পিছলে যেতে থাকে। শক্ত করে পা রাখার মতো একটু জায়গা বড়ো একটা পাই না।

সিন্দুকটা কিছুতেই আর নড়তে চায় না, এমনকি একটা ধাপ নেমে আসে।

'টেনে ধরো, জোই, টেনে ধরো, ভগবানের দোহাই!' আমি আর্তনাদ করে উঠি।

'আমি ঠিকই ধরে আছি,' জোই বলে। ওর মুখটা এত লাল আগে আর কখনো হয়নি।

ওই শয়তান মাগীগুলো আর গত রাতের ওই হুল্লোড়, তাই তো! এখন বোঝ ঠেলা, নরকযন্ত্রণা ভোগ করো।

'টানো ভেইয়া টানো!' ফ্রান্‌সি হুংকার দিয়ে উঠেছে।

'হেইও হো!' সজেপির মোটা হেড়ে গলা গমগম করে ওঠে। প্রকাণ্ড কেঁদো লোকটা বুড়ো আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন মাটি থেকে পা ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।...কিন্তু আস্তে আস্তে ও কাৎ হয়ে পড়ে, ওর হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, সিন্দুকটা একতিলও নড়েনি। কী অবস্থা আমাদের, সিঁড়ির বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছি, সিন্দুকের পেছন দিকটা শূন্যে ঝুলে আছে, যে কোনো সময়ে উলটে পড়তে পারে। তখন, পেছন দিকে যারা আছে তারা যদি সময় মতো লাফিয়ে সরে যেতেও পারে, সিন্দুকটা সবকিছু ভেঙেচুরে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ে যাবে। মুখে রক্ত তুলে আর প্রচণ্ডভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হতে থাকে, আস্তে আস্তে কিন্তু অবধারিতভাবে সিন্দুকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলছে আমাদের কোমর ও হাতগুলো। এরই মধ্যে রশিটা আমার হাতের মুঠো থেকে একটু পিছলে গিয়েছে। ঠেকনাটা এখন আর সিধে নেই, যে-কোনো সময়ে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

আমরা পেছন দিকে তাকাই। খুব বেশিক্ষণ আর ধরে রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই। ডিগডিগে তার সমস্ত জোর দিয়ে লড়াই করছে, হাঁপাচ্ছে, লোহার হাতলটা রয়েছে ওর কাঁধের ওপরে। ওর মুখটা একেবারে রক্তশূন্য, হাঁটু বেঁকে গিয়েছে, কিন্তু আবার ও সোজা হয়ে দাঁড়ায়, জোরে ঠেলা মারে।

'এতে কিছু লাভ আছে?' আমি নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, তারপরে চোখ বুজি। পরক্ষণেই হাঁক দিই, 'তোল তোল! মারো ঠেলা!...তোল ওপরে!'

গাঁট্টাগোঁট্টা পলের কাণ্ড দেখে হঠাৎ আমি একেবারে পাথর হয়ে যাই। ও হঠাৎ সিন্দুকের পেছন থেকে ঝাঁ করে বেরিয়ে এসেছে, তারপরে বাচ্চারা যেমন ভাবে রেলিং-এর ওপর দিয়ে পিছলে নেমে যায় তেমনি ভাবে নেমে যাচ্ছে।

'তোমাদের ওই দু পেংগোর কাঙাল আমি নই,' আমাদের উদ্দেশে চিৎকার করে কথাগুলো বলে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমার গায়ে এখন আর এত জোর নেই যে চিৎকার করে ওকে শুনিয়ে দিই, 'শয়তান কোথাকার, পাজী বদমাশ!'

কিন্তু সোনালী চুল লোকটার কোনো হুঁশ নেই, নিজের লড়াইয়ের মধ্যে পুরোপুরি ডুবে আছে, এখনো মাটি ছাড়েনি। সিন্দুকটা ওর ওপরে পড়ো পড়ো অবস্থায়, ওর হাতল সমেত ও একেবারে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু নিজেকে আবার ও সামলে নেয়, চশমা আঁটা চোখে তাকায় আমার দিকে। ভাঙা ভাঙা গলায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'আমি বলি কি...আমি বলি কি...'

কিছু বলার নেই, আমাদের যদি মরে যেতেও হয় তাহলেও এখন আর আমরা ছাড়তে পারি না। তার চেয়ে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করি। ভাড়াটেরা আসুক, তাড়াতাড়ি আসুক। কিন্তু সাহায্যের জন্যে যতোই আমি চিৎকার করার চেষ্টা করি আমার গলা দিয়ে চাপা একটা গোঙানি বেরিয়ে আসে মাত্র, বাচ্চা ছেলের মতো। পেছনে যে লোকটা রয়েছে তার আর রেহাই নেই। এবার এই দু' টন ওজনের দৈত্যটা সিঁড়ি দিয়ে ভাঙচুর করতে করতে নামতে শুরু করবে, আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে তার পেছনে পেছনে পড়ব।

এই সময়ে চোখে পড়ে যায় কী একটা জিনিস হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। প্রথমে মনে হয়েছিল হাওয়ায় ফুলে ওঠা একটা সাদা জামা মাত্র। তারপরে টের পাওয়া যায় সাদা জামাটা হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা ভুঁড়ি। তারপরে দেখতে পাই ছোট ছোট দুটো পা সিঁড়ির ধাপ থেকে ধাপে উঠে আসছে। হাঁসফাঁস

করতে করতে পা দুটোকে তুলছে একজন মানুষ। তার পাশে পাশে আসছে তরকারি ভর্তি বাজারের থলে হাতে সোনালী-চুল হাড়-জিরজিরে বাচ্চা একটা ঝি। বেআক্কেলে হদোটা আমাদের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকায়, আমাদের সাহায্য করার জন্যে ছুটে না এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি ওকে প্রচণ্ড একটা ধমক দিই, যেন আমি ওকে একশো পেংগো মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছি, 'জলদি, আমাদের সঙ্গে হাত লাগাও, নইলে এই সিন্দুকটা তোমার মাথার ওপরেই পড়বে।' কথাটা শুনেও লোকটা নির্বিকার, তারপরে ধীরে-সুস্থে ও দেখেবুঝে গা থেকে রংদার জ্যাকেটটা খোলে, গোঁফে একটা মোচড় দেয়, তারপরে মাংসপিণ্ডের মতো গড়াতে গড়াতে চলে যায় চশমা-পরা লোকটার পাশে। ডিগডিগে তখন তার হাতের লোহার হাতলটা চাপিয়ে দেয় নতুন লোকের পুরু কাঁধের ওপরে। মাংস-পিণ্ডের মুখটা লাল হয়ে যায় আর সে হাঁপাতে শুরু করে, সিন্দুকটার দুলুনিতে সেও ভয় পেয়েছে। আমাদের কপাল সিঁড়িতে প্রায় ঠেকিয়ে আমরা তখন শেষ মরিয়া চেষ্টায় ঠেকনাটাকে জোরে টান মারি।

অনেক আওয়াজ ও অনেক ঘষাঘষির পরে সিন্দুকটা শেষপর্যন্ত নড়ে, তারপরে আমরা যেমনটি চাই সেইমতো ধাপ থেকে ধাপে উঠতে থাকে—যেন তার সেই বিশাল ওজন গলে গিয়েছে। তিন তলায় পৌঁছে আমরা সিন্দুকটার কিনারে পা ঝুলিয়ে বসি, আমরা প্রত্যেকেই। আমাদের গাল দিয়ে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। আমাদের রক্তমাখা হাতগুলো মাঝেমাঝে আমরা পরখ করে দেখছি। আমরা বসে আছি তো বসে আছি, রাত না হওয়া পর্যন্ত এমনি বসে থাকতেই ইচ্ছে হচ্ছে। ওদিকে কথার জাহাজ সেই নচ্ছার ঝিটার বকবকানি আর থামতেই চায় না। বলে, 'ফ্রেমশাই যদি হাত না লাগাত তাহলে আর তোমাদের রক্ষে ছিলনি।'

'তাই বটে,' ফ্রেমশাই ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ছেন আর গলা

খাঁকারি দিচ্ছেন। তারপরে রংদার জ্যাকেটটা পরেন আর সেই জ্যাকেটের পকেট থেকে বার করেন লম্বা একটা চুরুট, 'তোমাদের উচিত ছিল আরো কিছু লোক সঙ্গে আনা।'

এই বলে দেমাক আর হামবড়া দেখিয়ে তিনি চলতে শুরু করেন, হাড়-জিরজিরে ঝিটা সঙ্গে সঙ্গে চলে। আমি শুনতে পাই আমাদের উদ্দেশে তিনি গালিগালাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আর মেয়েটা প্রত্যেক কথায় সায় দিয়ে চলেছে।

এবারে সিন্দুকটা গড়গড়িয়ে চলে গোটাকতক দামী আসবাবে সাজানো কামরার ভেতর দিয়ে। আমরা ঠেলতে ঠেলতে চলি, যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, আমাদের এখনো ভয় থেকে গিয়েছে আমাদের পায়ের নিচে মেঝেটা যে কোনো সময়ে ভেঙে পড়তে পারে।

শেষকালে আমাদের পাওনা পঞ্চাশ পেংগো হাতে পেয়ে যাই। বাড়ির গিন্নী চেয়েছিল দরাদরি করে আরো কিছু কমাতে।

এক হাতের মুঠোয় টাকাটা নিয়ে অন্য হাতে ঠেকনার লোহার চাকতিটা অবশভাবে ধরে থাকি। জিনিসটাকে আমরা নিচে নিয়ে যাই প্রকাণ্ড হাতুড়ির মতো করে। ডিগডিগে রোলারগুলো কাঁধে নিয়েছে, এমন ভাবে যেন একজোড়া রাইফেল।

আমরা এসে দাঁড়াই ফাঁকা রাস্তায়, এখন দুপুরের খাবার সময়। মাথার ওপরে প্রচণ্ড সূর্য, ঘরবাড়িগুলোকে সে এখন সেঁকে নিচ্ছে, সন্ধ্যে হলে সেগুলো নিয়ে ভোজে বসবে। ছ্যাকরা গাড়িটার কাছাকাছি আসতেই সারি চিঁহি চিঁহি ডাক ছেড়ে উল্লাস জানায় আর শূন্যে লাথি ছোঁড়ে।

'হোয়া!' মিনমিনে গলায় আমি বলি, 'হোয়া!'

রোগা লোকটা একটিও কথা না বলে গাড়িতে চেপে বসে, গাড়ির ধার দিয়ে পা ঝুলিয়ে দেয়। লোহার হাতলের চাপে তার কাঁধের ওপরে কালশিরে পড়ে গিয়েছে। সারি উল্লাসের দমকে দমকে ছোটে। ঘোড়ার রাশ ফ্রান্‌সির হাত থেকে খসে পড়ে যায়। হাওয়ায় চাবুক

মেরে একবারও সে শিস তোলে না, যেটা সে করতে এত পছন্দ করত। তার বদলে যতোখানি কম জায়গায় সম্ভব গুটি-সুটি হয়ে বসে থাকে, যাতে অসাড় হাত পা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আমার শার্ট ও প্যাণ্ট ঘামে জবজবে হয়ে গিয়েছে, জুতোর ভেতরটায় মনে হচ্ছে জমে গিয়েছে পুরো একটা পুকুর। সরাইখানায় পৌঁছবার আগেই এই বিশ্রী গাড়িটার ঝাঁকুনি আমাদের প্রাণ বার করে দেবে মনে হয়।

পার্কের সামনে থামি। একটা পাঁচ-পেংগোর নোট বার করি। সঙ্গীরা সায় দেয়। এটা ওর প্রাপ্য। কিন্তু ডিগডিগে নড়ে না, হু-পা ঝুলিয়ে চোখ বুজে তেমনি বসে থাকে। মনে হয় ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

'ওকে সরাইখানা পর্যন্ত নিয়ে যাব নাকি ?' আমি জিজ্ঞেস করি, 'তাছাড়া, ছাখ জোই, লোকটা ভালো, সত্যিই ভালো। ধরো ওকে নিয়ে গিয়ে খানিকটা খাইয়ে দিলেও তো পারি, আর...'

কিন্তু ততোক্ষণে ও চমকে জেগে উঠেছে। আর পার্কটা দেখতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়ে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বেসামাল হাসে।

আচমকা একটা ভঙ্গি করে আমি নোটটা ওর হাতে তুলে দিই। শুনতে পাই ও বিড়বিড় করে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ফ্রান্সি সারির দিকে চাবুক চালায়। আমরা গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলি।

আবার আমরা সরাইখানায় ফিরে এসেছি। সবুজ ঢাকনা দেওয়া টেবিলের সামনে বসেছি আর ক্লান্তিতে গোঙাচ্ছি।

আমাদের হুকুমের জন্যে অপেক্ষা না করেই পরিচারক গুস আমাদের জন্যে ফেনা-ওঠা মদ নিয়ে আসে। বুড়ো জোই আরো কড়া মদের জন্যে হুকুম দেয়।

তেতো স্বরে সে বলে, 'এমন কিছু চাই যা নাড়া দিতে পারে। বুঝেছ তো?'

মদের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ঘুমন্ত চোখে আমি সেই রোদ্দুরের ঝলক তোলা পানীয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি।

আস্তে আস্তে আমার চারপাশের মাথাগুলো টেবিলের ওপরে নুয়ে পড়ে। চড়া দিনের আলোয় ঘুমিয়ে পড়ে সবাই। মদের গেলাসগুলো শূন্য, কেউ আর সেদিকে হাত বাড়াচ্ছে না। মনে হচ্ছে গেলাসগুলোও এখানে সেখানে ঘুমোচ্ছে।

দেয়ালের আয়নায় ক্লান্ত লোকগুলোর ছায়া পড়েছে। আমি আরেকটু সরে বসি, আয়নার দিকে একবার ক্লান্ত চোখে তাকাই।

হঠাৎ শুনতে পাই রাস্তা থেকে সারি ডাকছে। একজন কারও যাওয়া দরকার, ও জল খেতে চায়। রান্নাঘর থেকে একটা বালতি চেয়ে নিই। একটু পরেই দেখতে পাই আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি ঘোড়াটা মুখ খুলেছে, তার হলদে দাঁত ও লোভী জিভ বার করেছে। দেখলে অবাক হতে হয় কী প্রচুর জল খেতে পারে ঘোড়াটা।

'ওহে গুস,' জানলা দিয়ে চিৎকার করে বলি, 'আমাকে আরেক পাঁট দিয়ে যাও তো।'

তারপরে একসঙ্গে আমরা পান করি, ঘোড়া ও আমি।

অনুবাদ ॥ অমল দাশগুপ্ত

আনাতোলি লুনাচারস্কি

'উনি ছিলেন একাধারে লেখক, যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক কর্মী। ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যেও তিনি সর্বদা যা দেখতেন, শুনতেন তা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এরই মাঝে ডাক আসলেই কলম নামিয়ে বন্দুক তুলে নিতেন কাঁধে। কথা আর কাজে অনুপ্রাণিত করতেন প্রতিটি সৈনিককে···তাঁর কর্মজীবন দেশের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এক জলন্ত নিদর্শন।' আনাতোলি আনাতোলিয়েভিচ লুনাচারস্কি সম্বন্ধে এই তাঁর বন্ধু ও কমরেডদের মতামত।

আনাতোলি লুনাচারস্কির পিতা স্বনামধন্য আনাতোলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচারস্কি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও অনন্য সাংস্কৃতিক কর্মী। নবীন লেখক কনিষ্ঠ লুনাচারস্কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পিতৃভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ১৯৪৩ সালে নোভোরস্সিস্ক-এর কাছে কম্যাণ্ডো অবতরণের সময় একটি যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

মৃত্যুকে হারাতে হবে

আনাতোলি লুনাচারস্কি

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১

আমার প্রিয়জনেরা,

আজ বা কাল আমি পার্টির সভ্য হব। প্রায় একশ দিনের মত যুদ্ধ হোল। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে এই দিনটি আমার কাছে স্মরণীয়।

আমার নিজের অনুভূতির কথা কি ভাবে জানাব জানি না। সংগ্রামের আনন্দ ও জয়ের প্রতি বিশ্বাস আমাকে এক নতুন পরিণত চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আজ প্রতিটি সোভিয়েত নাগরিক বিশ্বাস করে জয় আমাদের হবেই। দেখো, সমস্ত মানুষের জীবনে নতুন বসন্ত আমরা আনবই। একজন বলশেভিক্ হয়ে সংগ্রাম করতে পারাটা এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। মৃত্যুও এই সংগ্রামে মহান। নিতান্ত ক্ষুদ্রপ্রাণ এক জীবনকে বীরত্বের চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে এই মৃত্যু। হয়ত এই অসংখ্য অগণিত বীরের কথা কেউ জানবে না কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টিতে এদের অবদান অসীম। যদি উজ্জ্বল আলোক শিখার মত জ্বলতে পারি তবে এই অন্ধকার ও আলোর সংঘর্ষে মৃত্যুর আশঙ্কা মোটেই বিচলিত করতে পারবে না। আমরা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেব তারা যে বেঁচে থাকব মানুষের স্মৃতিতে, তাদের গানের মধ্যে। জীবনের এই মহান ভাবগম্ভীর মুহূর্তে আমি তোমাদের কথা ভাবি। ভাবি আমার সমস্ত কাছের মানুষের কথা। আর ভাবি সোভিয়েত মানুষের কথা যারা আমার কাছে জীবনের আনন্দের প্রতিমূর্তি।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২

প্রিয় মা,

আমাকে ভুয়াপ্সেতে যেতে হয়েছিল। ওখানে সৈন্যবাহিনীর একটি খবরের কাগজে কাজ করেছি আর যুদ্ধরত ইউনিট্‌গুলোর ওপর

গবেষণা চালিয়েছি। সাঙ্ঘাতিক মনোমুগ্ধকর কাজ কিছু নয়। তবে অনেক নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়েছে। প্রচুর পড়াশোনাও করতে পেরেছি। এর মধ্যে আটদিন পাহাড়ে একটা গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনীর পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে কাটিয়েছি। এটার ওপর একটা লেখাও লিখেছি। তোমাকে তো লেখাটা পাঠিয়েছি। লেখাটা সংক্ষিপ্ত আকারে মস্কোর 'ক্রাসনি ফ্লট' কাগজে বেরিয়েছে। রেডিওতেও পড়া হয়েছে। জানি না তুমি শুনেছ কিনা। ওখানে আমরা একটা গুহার মধ্যে ছিলাম। বাইনাকুলার দিয়ে সারাক্ষণ নাজীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতাম। এই জীবন যাত্রার মধ্যে এক অফুরন্ত কবিতা আর সাহসের ভাণ্ডার রয়েছে। ফিরেছি হেপাটাইটিস্ নিয়ে। আমার সঙ্গে যারা ছিল তাদের প্রত্যেকেরই এই রোগ ধরেছে। সুস্থ হবার পর পোতিতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম কাজেই কোস্ট গার্ডের পদে বহাল হবার জন্য ভীষণ ভাবে চাপ দিয়েছি। অবশেষে আমাকে একটা গান বোটে পাঠানো হল। আমার জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনা পূর্ণ অধ্যায় শুরু হল ব্ল্যাক সী-তে। ওখানে আমার কাজের রেকর্ড খুব একটা খারাপ নয়। কম্যাণ্ডারদের মধ্যে যারা আমায় চিনত, তারা সবাই বলতো, ও শুধু লেখক নয়, একজন খাঁটি যোদ্ধা। কথাগুলো শ্রুতিমধুর হলেও এটা অত্যন্তই বাড়াবাড়ি। আমি তো আর সত্যিই বীরের মতো কিছু করিনি। তবে এর পর থেকে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দশগুণ বেড়েছে। আপাততঃ যুদ্ধ জীবন শেষ। নানান অভিজ্ঞতায় পূর্ণ আমার জীবন। আমার কাজের ভিত্তিতেই আমাকে পার্টির সভ্যপদ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। এখন আমাকে 'ব্ল্যাক সী-র নাবিক' বইটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির প্রস্তাব আমিই রাখি। প্রধান সম্পাদক হিসেবে মনে হয় আমার নামই থাকবে। এখানকার দিনগুলো বড় ভালো লাগছে। এর বেশী কিছু চাইলে সেটা বাড়াবাড়ি হবে।

আজকাল নিজের মধ্যে লেখার তাগিদ অনুভব করছি। সারি সারি কত মুখ কেলিডোস্কোপের মত ভেসে বেড়ায় আমার স্মৃতিতে। অসীম উৎসাহ আর প্রত্যাশা নিয়ে ওদের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছে করে। আমার প্রিয় মা, আমার জন্য চিন্তা কোরো না। অনেক বিপদের মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল। তা না হলে জীবন যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত, কোথায় যেন একটা ফাঁক চোখে পড়ত। পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটত না।

২৫ জানুয়ারি, ১৯৪৩

প্রিয় মা,

বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছি তোমাকে একটা লম্বা চিঠি লিখব। এখন সময় পেয়েছি। আমার দিনগুলো কাজের মধ্য দিয়ে বেশ মজায় কাটছে। মানসিক উন্নতির সুযোগ পাচ্ছি সবসময়। করনেইচকের 'সীমান্ত' নাটক আর ভাসিলিয়েভস্কায়ার গল্প 'রামধনু'র ওপর দুটো লেখা তৈরি করছি। যদি দেখি নাবিকরা উৎসাহ পাচ্ছে তাহলে পর পর বেশ কয়েকটা লেখা লিখে ফেলতে পারি। এতে সকলেরই উপকার হবে। আজকাল অনেক লোকের সামনে কিছু বলতে বেশ সহজ লাগে। এখন সবচেয়ে যেটা দরকার সেটা আমার নিজের কাজের মান বাড়ানো।

'আমার জাহাজ' নামে বেশ একটা বড় গল্প লেখার তোড়জোড় করছি। পাশাপাশি কিছু ছোট গল্পও লিখছি। এসব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে মন দিয়ে বেলিনস্কি, ব্র্যাণ্ড শেক্সপীয়র পড়ছি, পুরনো নাটকগুলোকে ঠিকঠাক্ করছি আর মাঝেমাঝে দু একটা গানও লিখছি। বলতে ভুলে গেছি গত পরশু একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। মস্কো রেডিও আমার লেখা 'দ্বন্দযুদ্ধ' রচনাটা পড়েছে। তোমাকে তো ওটার কথা লিখেছি আগে। তোমাকে, আলিওনুশকা আর আনিউতকাকে দেখার জন্য মনটা ছটফট করছে। কিন্তু তার আগে নাজীদের তাড়াতে হবে আর মৃত্যুকে হারাতে হবে। এই

ছুটো জয়লাভের অপেক্ষায় আছি। এটা না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটাকে চেপে রাখতে হবে। তবে আমার বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে। শত্রু পিছু হঠতে শুরু করেছে।

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩

আমার প্রিয়জনেরা,

জীবনের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। এক বিরাট দায়িত্ব আমার সামনে। কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে। জানি আমার অন্তরের 'দেবতা' আমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে। তবুও···আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কামানের গর্জন, বোমার হুঙ্কার, শেলের আওয়াজ শুরু হবে। যুদ্ধের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। এখন আমি শুধু বলতে চাই আমি কী ভীষণ ভালবাসি তোমাদের, আমার দেশের মানুষকে আর আমার জীবনকে। ভালবাসা, আনন্দ, জীবনের সুন্দর সব কিছু পাবার উপযুক্ত করে তুলতে হবে আমাকে। আমরা শত্রুর ওপর বিদ্যুতের ঝলকানির মত ঝাঁপিয়ে পড়ব। এই রাতের পর আমি আরও দশ বছর এগিয়ে যাব। তোমাদের সঙ্গে মিলনের দিনও এগিয়ে আসবে অনেক কাছে।

চিঠিটা অসম্পূর্ণই থাক্। যুদ্ধের পর শেষ করব।

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩

প্রিয়জনেরা,

সব কিছু ভালভাবে কেটেছে। আমি বেঁচে আছি এবং ভাল আছি।

আবার চিঠি লেখার সুযোগ পেয়েছি। পরের চিঠিতে বিস্তারিতভাবে সব জানাচ্ছি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩

আমার আদরের মা,

কয়েকটা দিন খুব সুন্দর কাটল। ফ্রাজনায়া গ্রুজিয়ার মেসে আমার বীরত্ব নিয়ে বেশ একচোট গরম গরম আলোচনা হল। ওদের তর্কের বিষয়বস্তু গোলাগুলির মাঝখানে ক্যাপ্টেন কে'র পাশে থাকাটা আমার উচিত হয়েছিল কি না। এসব এখন অতীত। সুতরাং তোমার আশঙ্কা করার আর কোনো কারণ নেই। আমার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। ওই অবস্থায় ক্যাপ্টেন কে'র পাশে থাকাটা আমার জরুরী ছিল। তুমিই বল, —মনের জোর আর কমরেডের সহযোগিতা না পেলে ওর কি অবস্থা হত। তাছাড়া একজন লেখক হিসেবেও আমার থাকাটা কর্তব্য। বীরের কথা লিখব কি করে, যদি না জানতে পারি ওদের অনুভূতি ওদের অভিজ্ঞতা? পর্দার আড়ালে থেকে মাঝে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যুদ্ধের আগুন পোহালে ওসব হয় না।

বিপক্ষ দলের বক্তব্য, যদি আমি সত্যি মারা যেতাম তা হলে কি হত। আমি মারা গেলে লেখার কে থাকত। কিন্তু আমি তো আর সত্যিই মারা পড়িনি। বেশ বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি। ক্যাপ্টেন কে'ও ঠিক আছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে যে কী ভীষণ লাভবান হয়েছি কি বলব। নিজের ওপর আস্থা শতগুণ বেড়ে গেছে। মানুষের নিজের ওপর বিশ্বাস ও আস্থা যে ভয়ানক জরুরী।

২০ মার্চ, ১৯৪৩

আমি এক নতুন জীবনে প্রবেশ করেছি। বর্তমানে আমার কাজ শান্তিপূর্ণ নির্মাণের কাজ। তোমাদের কাছ থেকে আসার পর নতুন অনেক কিছু দেখলাম। তোমাকে তো চিঠিতে সবকিছু জানিয়েছি। যখন আর্টিলারি ইউনিটে ছিলাম, মৃত্যুর হাতছানি আমাকে ভীত করেনি। বরং বিপদের এই আশঙ্কার মধ্যে

ককেশাসের ভয়াবহ সৌন্দর্য্য আমাকে আরও বেশী করে অভিভূত করেছে। তারপর কিছুদিন গানবোটে ছিলাম। কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। সবকিছু এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আমার সামনে।

আপাতত আমার সবচেয়ে বড় কাজ সব অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলা। আমার এখন অনেক প্ল্যান্। নতুন অনেক গল্প আর নাটক লিখে ফেলতে হবে। এই মুহূর্তে কিছু লীফলেট লিখছি। এটাও খুব প্রয়োজনীয়। ভাবছি যুদ্ধের ওপর যদি কোন মহাকাব্য লেখা যায়। বইটির মুখ্য চরিত্রে থাকবে সোভিয়েট নারী। ব্ল্যাক সী-র যুদ্ধে যারা নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন। প্রধান চরিত্রটি কেমন হবে তাও আমার কাছে বেশ স্পষ্ট। তুমিই সেই চরিত্র। আমি সাহিত্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়ে দেব। এই বিধ্বংসী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে তোমাকে যে ভাবে দেখেছি ঠিক সেই ভাবেই চরিত্রটি গড়ব। শুধু বাইরের ঘটনাগুলো তোমার সত্যিকারের জীবন থেকে একটু অন্য রকম হবে। কারণ এ এক আলাদা যুগ, এক নতুন জীবন যাত্রা। তবে তোমার নিজস্ব সত্ত্বা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তা—সবকিছুই থাকবে তোমার। তার কোন অদল বদল ঘটবে না। তুমিই থাকবে—তোমার ভাবপ্রবণতা, কোমলতা, মানসিক দৃঢ়তা, কল্পনা শক্তি, জীবনকে চেনার ক্ষমতা, সব কিছু নিয়ে। ভাবতেই শরীরে শিহরণ জাগছে।

অনুবাদ ॥ মালা ভট্টাচার্য

ন্গুয়েন থি

১৯২৮ সালে 'নাম দিনে' জন্ম। শৈশবেই পরিবারের সঙ্গে সায়গনে চলে আসেন। 'নাম বো'-য় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। মার্কিন আগ্রাসনের সময় থেকে লেখার শুরু।

প্রথমে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ও পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করার জন্যে ভিয়েতনামের মানুষ মাত্রেই সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। ভিয়েতনামের সাহিত্যিকরাও তাই একাধারে সাংস্কৃতিক যোদ্ধা ও মুক্তি ফৌজের সৈনিক। মুক্তিকামী মানুষ হিসেবে ন্গুয়েন থি এই দ্বিতীয় ভূমিকা পালন করার সময় ১৯৬৮ সালে সায়গনের উপকণ্ঠে একটি যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর রচনার মধ্যে 'মাদার উইথ রাইফেল' ভিয়েতনামে খুবই জনপ্রিয়। 'এ ভিলেজ কল্ড্ ফেথফুল্নেস্' নামে একটি উপন্যাস তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। এর প্রথম তিনটি অধ্যায় তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় এবং সাড়া তোলে। হ্যানয় থেকে উপন্যাসটির ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি তিনি ১৯৬৪ সালে লিখেছিলেন।

আমার গ্রাম

ন্‌গুয়েন থি

তুক্ ও বিন্ দুজনেরই বয়স পাঁচ। ওদের বাড়িও পাশাপাশি। মাঝখানে শুধু এক সারি নারকেল গাছের ব্যবধান। তুক্ বেশ কাজের ছেলে। এই তো কিছুদিন আগে তার মা যে বাছুরটা কিনে এনেছে সে তার দেখাশোনা করে। হলে কি হবে রাতে কিন্তু ও এখনও চাদর ভিজিয়ে ফেলে। বিন্‌ও কিছু কম যায় না। অত বড় ডুমুর গাছটা থেকে পড়ে গিয়েও সে একটুও কাঁদে না। ওর বড় বোন তো ওকে খুব সাহসী ছেলে বলে। কিন্তু বিনের একটা বড় বদ অভ্যেস হল কথা বলতে গেলেই ও তোতলায়।

কেউ জানে না কবে ওদের বন্ধুত্বের শুরু। তবে এটা সবাই জানে যে ওরা দুজনে গলায় গলায়। প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা যখন সূয্যি-মামা বাঁশঝাড়টার নীচে নেমে যায় তুক্ ওর ভুঁড়িটা দুলিয়ে মায়ের দেওয়া মোচার খোলের মত বিরাট টুপিটা মাথায় দিয়ে বাছুরটাকে নিয়ে হেঁটে যায় ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে। দেখায় ঠিক যেন একটা ব্যাঙের ছাতা। ওকে আসতে দেখে বিন্ ডুমুর গাছ থেকে একলাফে নীচে নামে। ছুটে যায় ওর বন্ধুর দিকে। বাঁশের চোঙাটা দিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দেয় বাছুরটার পিছনে। তারপরই শুরু হয় ওদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। খালি গায়ে নাভির নীচে প্যান্ট দুটো নামিয়ে পিঠে কয়েকটা গাছের ডাল বেঁধে কোমরে খেলার বন্দুক ঝুলিয়ে দুই যোদ্ধা মরণপণ লড়াই-এ ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিনের দিদি হাই ওকে একবার একটা "সাব মেশিনগান" তৈরী করে দিয়েছিল আর তুক্'কে দিয়েছিল একটা "মেশিনগান"। এখন ওদের নানা রকম হাতিয়ারের মধ্যে দু'চারটে গ্রেনেডও উঁকি দিচ্ছে। যদিও সেগুলো মাটির। সঙ্গে সুপারীপাতার কোদালও আছে। লাল রেশমী চুলে ভরা মাথা দুটো এই দেখা যায় বাছুরটার পেছনে, এই

দেখা যায় বেতঝোপের ফাঁক দিয়ে। মিছিমিছি শত্রুর পিছনে ধাওয়া করতে করতে কখনও ওরা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, কখনও করে চিৎকার আবার কখনও বা জোরে জোরে হেসে ওঠে। জোর লড়াই-এর মাঝে ফলের বিচি ছুঁড়ে ফেলে এদিক ওদিক।

সাধারণতঃ এসব হয় ধানক্ষেতের মধ্যে। আজকের দুপুরটা অবশ্য অন্যদিনের থেকে আলাদা। আজ আর তুকের বাছুরটার কথা মনে নেই। হাতে খেলার বন্দুকটা নিয়ে সে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে গেরিলাদের কাণ্ড কারখানা। ওরা গ্রেনেড গুনছে একটা একটা করে। ওদিকে বিন্ ওর দিদির পেছন পেছন বাগানের ভেতর চলে গেছে। গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে হাই বলল: "কি রে, ভেতরে আয়। আসছিস না কেন?"

বিন্ মাথাটা একপাশ হেলিয়ে অবাক হয়ে দেখছে ওর দিদিকে।

"আরে আয় না। না আসলে মারব কিন্তু। আয় বলছি, কাল তোকে আর একটা মেশিনগান্ বানিয়ে দেব, কেমন?"

বিন্ কোনো কথা না বলে গোমড়া মুখে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। হাই বলে উঠল: "ঠিক আছে আমি মা'কে বলব বিন্ কিছুতেই প্যাণ্ট পরতে চায় না।" ততক্ষণে বিনের চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে কান্না-কান্না গলায় বলল: "দিদি, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল না।"

"দূর পাগল, আমার সঙ্গে কোথায় যাবি? আমি তো বাথরুমে যাচ্ছি।"

"তবে আমাকে একটা গ্রেনেড দাও।"

হাই গাছের ডালটা বিনের গায়ে আলতো করে ছুঁইয়ে বলল: "গ্রেনেড আবার কোথায় দেখলি। আমার কাছে কোনো গ্রেনেড নেই।"

বলেই হাই ছুটে চলে গেল বেতঝোপের মধ্যে। বিন্ আর দেখতে পেল না ওর দিদিকে। ও প্রায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে

যাচ্ছিল। কিন্তু না, বিনু কাঁদল না। সে তো সাহসী ছেলে। সে কেন কাঁদবে? ও আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। কোথায় দিদি? আরে, ওই তো দিদির বিনুনিটা উঁকি মারছে। হাই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। হাতে একটা বেশ ভারী ঝুড়ি। বিনুকে দেখেই পড়ি কি মরি করে এক ছুট। বিনু দৌড়ল ওর পেছন পেছন। বাড়ি ফিরতেই রান্নাঘর থেকে মা'র গলা ভেসে এল:

"চিনু ওকে একটা দে না মা।" উঠোনে গেরিলারা সব বসে। একগোছা বন্দুক গাছের গায়ে হেলান দেওয়া। বিনু খুব অসন্তুষ্ট মুখে মা'র সামনে এসে দাঁড়াল। বাঃ! কড়াই থেকে বেশ ভুরভুর করে মাছের গন্ধ আসছে তো।

বিনু মা'র কাছে দিদির নামে নালিশ ঠুকে দিল। হাই তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে বলল: "জান তো মা, ও কিছুতেই ছাড়বে না। ওর নাকি একটা গ্রেনেড চাই-ই চাই।"

মা বিনুকে কোলের কাছে টেনে এনে বললেন: "না বাবা এসব জিনিস কি চাইতে আছে? এগুলো সব বাজে জিনিস। কি ভীষণ জোরে এগুলো ফেটে যায়, মানুষ মেরে ফেলে। দিদি নিক গে ওসব। তোমাকে আমি কালই একটা মাটির গ্রেনেড বানিয়ে দেব।"

"না আমি সত্যিকারের গ্রেনেড চাই। মিছিমিছি জিনিস আমি চাই না। দিদি কেন আমাকে নিয়ে যাবে না ওর সঙ্গে। আমিও বদমাশ্ ফও'কে মারতে যাব।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখনতো প্যাণ্টটা পরে নাও। আমি হাইকে বলে দেব তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। চিনু তোরা কিন্তু ওকে নিয়ে যাবি। বিনুও ফও'কে মারতে যাবে।"

চার বছর আগেকার কথা। ফও ছিল এ জেলার পুতুল শাসক। একদিন সে ও তার গুণ্ডাবাহিনীর চার জন মিলে ছুটো লোককে টানতে টানতে এ গ্রামে নিয়ে আসে। বিনু আর চুক্ তখন কোলে। চিনু সবে তেরো বছরে পা দিয়েছে। আশ-পাশের লোকেরা দুজনের

করুণ আর্তনাদ, কয়েকটা ভাসা ভাসা কথা শুনতে পাচ্ছিল। "গাঁয়ের লোকেরা, তোমরা শোন, আমি কোনো অন্যায় করিনি। আমাকে এরা খুন করছে।"

"বন্দুকগুলো আমার। এতে তোমাদের কোনো অধিকার নেই। কোথা থেকে পেয়েছি তা তোমাদের বলতে যাব কেন?"

তারপরই শোনা গেল পরপর গুলির আওয়াজ। গ্রামের লোকেরা ছুটে গেল সেদিকে। পাগলের মত ছুটে এল বিন আর ছুকের মায়েরা তাদের মৃত স্বামীদের দেখতে। ওদের কোলে ছোট্ট বিন্ আর ছুক্।

আগের দিন ওরা পাহাড়ে তামাক পাতা কাটতে গিয়েছিল। ওখানেই ফঙ্ তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করে। এতেই সে সন্তুষ্ট থাকার লোক নয়। গ্রামে টেনে নিয়ে আসে শুধু খুন করার জন্য।

খুন করার ধকল বড় ধকল। ক্লান্ত ফঙ্ স্বামীহারা দুটি মেয়েকে করুণস্বরে কাঁদতে দেখে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে মারল দুই লাথি। মায়েরা একটু চুপ করতেই জোরে কেঁদে উঠল বাচ্চা দুটো।

ফঙ্ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বন্দুকের মুখটা ওদের মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে চিৎকার করে বলল: "হতচ্ছাড়া শয়তানের বাচ্চারা, তোদের বাবারা ভিয়েতকঙ্ ছিল। ওদের উচিত শাস্তি দিয়েছি। দেখে আবার কাঁদা হচ্ছে।"

সেদিন এ ঘটনার কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। ফঙ্ লোকটাকে দেখলে সত্যিই বুকের ভেতরটা একেবারে হিম হয়ে যায়। বেতের মত লিক্‌লিকে চেহারা, সামনের দাঁত দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। চরিত্রও সেকরম। ওর বউ ওর ছোট মেয়ের থেকেও বয়সে ছোট। ঘুষের টাকা এমনভাবে হজম করে যেন একটা ক্ষুধার্ত কাতলা মাছ। হাসি দেখেনি কেউ কখনও ওর মুখে। কালো মেঘের মত মুখ করে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। গুণের সীমা

নেই লোকটার। একবার গক্ ব্রীজের কাছে একটা লোককে হুকুম করল গাছে উঠে জাতীয় মুক্তি বাহিনীর পতাকা নামিয়ে ফেলতে। নামবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে গুলি করে মেরে ফেলল। ভাড়া করা এক ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ওর ছবি তুলিয়ে পাঠিয়ে দিল এলাকার বড় কর্তার কাছে। আর বলে পাঠাল মৃত লোকটি একটি আস্ত ভিয়েতকঙ্। ও বিশ্বাস করত যে যাকেই ও মারত সেই ভিয়েতকঙ, আর মৃত্যু তো প্রত্যেক ভিয়েতকঙ্-এর প্রাপ্য।

সেসব দিনে আমাদের নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র প্রায় কিছুই ছিল না। হাতিয়ার বলতে ছিল গুলতি। গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতাম শত্রুর দিকে। বড় জোর পটকা ফাটাতাম। ড্রাম আর ঘণ্টা বাজিয়ে সাবধান করতাম নিজেদের। বেশীর ভাগ সময় খালি হাতই ছিল যথেষ্ট।

বিন ও ডুকের মায়েরা ওদের স্বামীদের মৃতদেহ নিয়ে যেতে চাইল। শুনে ফঙ এমন মার মেরেছিল যে আজও ওদের শরীরে সেই ব্যথা আছে, এখনও সময় সময় অসহ্য যন্ত্রণা হয়।

গ্রামটি ভারী সুন্দর। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পোয়াতি মায়ের মত পলিমাটিতে পূর্ণ একটি খাল। এই খালের জলেই ফঙের কত শিকার যে ভেসে উঠেছে তার আর হিসেব নেই। অগুন্তি মুণ্ডহীন, শতচ্ছিন্ন দেহ। অথচ এই জলই গ্রামের লোকের প্রাণ। এই জলই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই জলেই বিন্, ডুক্ একসঙ্গে খেলা করেছে, স্নান করেছে, বেড়ে উঠেছে সবল আখের মত। ফঙ-এর দৌরাত্ম্যে এই শান্ত সুন্দর গ্রামটির জীবন বিপর্যস্ত হল। নতুন নতুন ঘটনা, বীভৎস ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটল এখানে। শুধু তাই নয়। ঝাঁকে ঝাঁকে মার্কিন হেলিকপ্টার এসে বোমা বর্ষণ করত। এখন এসব পুরনো হয়ে গেছে। লোকে কিছুই ভোলেনি কিন্তু ঘটনাগুলো আর নতুন নেই। তারপর একদিন জাতীয় মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধারা এল। বাঁশের মত লম্বা খেলার রাইফেল দিয়ে শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করতে শুরু করল। বিন্ তখন ছোট মেয়ে।

বিন্‌কে ঘাড়ে নিয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সেও গিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেয়। আস্তে আস্তে স্থানীয় গেরিলারা শক্তিশালী হয়ে উঠল। ওরা তখন নিজেরাই শত্রু ঘাঁটি আক্রমণ করতে এগিয়ে গেল। সিমেণ্ট গ্রেনেডের বদলে এবার তাদের হাতে মার্কিনী গ্রেনেড। বিন্‌ তখন একটু বড় হয়েছে। সে মেয়ে গেরিলাদের নিয়ে রাস্তা ঠিক করার কাজে নেমে পড়েছে। বিন্‌ সারাটা দিন ঘরে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে বসে থাকত। রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখত, শত্রুদের মারছে। মা বুঝতে পারতেন কারণ তাঁরই পিঠে পড়ত বেশ দু'চার ঘা। বিন্‌ আর একটু বড় হলে সে গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল "সামরিক গ্রাম" দখল অভিযানে। একদিন জাতীয় মুক্তি বাহিনীর বেশ বড় একটি ইউনিট গ্রামে এল ঘাঁটি গড়তে। ছোট্ট এই গ্রামে এত লোক এত অস্ত্রশস্ত্র রাখার মত জায়গা কোথায়। এদিকে চিন্‌ বাহিনীর গাইড হয়ে গেছে। চিন্‌ এখন পুরোদস্তুর এক গেরিলা যোদ্ধা—কাঁধে ঝোলানো রাইফেল, কোমরে বাঁধা গ্রেনেড, সবল পদক্ষেপ। এমন পটু হয়ে উঠেছে সে যে বোমা বা গোলার শব্দ সে পরিষ্কার ধরে ফেলে। ওর টানা টানা চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না।

চিন্‌ তুক'কে তার নিজের ভাইয়ের মত দেখত। তুক্‌ তার বিধবা মার স্নেহে বড় হতে লাগল। মা খুব কম সময় বাড়ি থাকতেন। তাই সে সারাদিন এলোমেলো ঘুরত এখানে ওখানে। রাতে গেরিলা বা থি'র পেছন পেছন যেত এদিক সেদিক। ঘুম পেলে যেখানে সেখানে ঘুমোত। মা যখন বাড়ি থাকতেন তখন তিনি ক্ষেতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। জমি চাষ করা, আখের ক্ষেত থেকে পোকা-মাকড় মারা আরও কত কাজ। তুকের ওপর ভার ভাত রান্না করা। এখন তুক্‌কে দেখা যাচ্ছে গেরিলাদের সঙ্গে। একজন তুক-এর কাঁধে ওর থেকে বড় একটা রাইফেল ঝুলিয়ে দিল। ওটা ফেরত দিতে তার খুব আপত্তি।

ছুক্ ছুটে মা'র কাছে এল। গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের সুরে বলল: "মা, তুমি আমাকে মুক্তি বাহিনীতে নাম লেখাতে দেবে?"

"তুমি কি করে যাবে বাবা, তুমি এখন এতটুকু।"

"কিছু ভেবো না মা, আমি খুব বেশী করে খাব। তাহলেই চটপট বড় হয়ে যাব।"

"ঠিক আছে," মা হেসে বললেন, "বেশী করে খাও, তুমিও যাবে ওদের সঙ্গে।"

সেদিন দুপুরে ছুক্ এত খেল যে ওর পেট ফুলে ঢাক। মা কোনো রকমে ওর খাওয়া থামালেন।

পরদিন সকালে উঠে ছুক্ সোজা তার মা'র কাছে গেল। "মা আমাকে দু'পিয়াস্তার দেবে? চুল কাটতে যাব।"

মা অবাক হলেন, "কি? এইতো সেদিন চুল কাটলি?"

আসলে আগের দিন রাতে ও স্বপ্ন দেখেছে মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধারা কথা দিয়েছে যে ওকে ওরা সঙ্গে নেবে। কিন্তু চুল কাটতে হবে। এত বড় চুল নিয়ে কি করে বাহিনীতে যোগ দেবে। নাপিতের কাছ থেকে একেবারে ন্যাড়া হয়ে ফিরে এল ছুক্। নারকেলের মত মাথাটার ঠিক ওপরে একগুচ্ছ চুল। তারপর সে বেরোল স্বপ্নের সেই লোকটার সন্ধানে। কিন্তু কোথায় সে? ওকে কোথাও খুঁজে পেল না ছুক্।

এ গ্রামের নারী পুরুষ সকলে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। সকলের পিঠে একটা করে আনকোরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, হাতে নতুন ঘড়ি। মেয়েদের মাথায় প্লাসটিকের টুপি, কোমরে বাঁধা ভাতের বাটি। ছুক্ দেখছে ওদের। ভাতের বাটি পরিষ্কার করতে আর হাত চলছে না। সে যন্ত্রের মত বলল, "তোমাদের যাত্রা শুভ হোক ভাইবোনেরা।" সকলে একটু হেসে চলতে শুরু করল।

ছুক্ ওর বাবাকে দেখেনি। মা'র মুখ থেকে শুনেছে বাবা বেশ

লম্বা ছিলেন। ঝোপ বেড়াটার ওধারে দাঁড়ালে খুঁটিটাকে ছাড়িয়ে যেতেন। বড় ছেলেকে খুব ভালবাসতেন তিনি। ওদের আরামে রাখার জন্য কত চেষ্টাই যে করতেন। প্রায়ই গরান কাঠ পুড়িয়ে কাঠ কয়লা আনতে যেতেন। যাতে কাঠ কয়লার আগুনে তাপ পোয়াতে পারে ছুক্ আর ছুকের মা। বউ-এর জন্য খাল থেকে মাছ ধরে এনে নারকেলের শুকনো শাঁস দিয়ে পুড়িয়ে দিতেন। ছুকের মা যে খুব ভালবাসতেন খেতে।

বাবার কথা বিনের এইটুকুই মনে আছে যে তিনি প্রায়ই হাই'কে দোকানে পাঠাতেন মদ কিনতে। বাবা খুব সুন্দর খেলনার বন্দুক বানিয়ে হাইকে দিতেন। হাই বোধহয় তার কাছ থেকেই শিখেছে বন্দুক তৈরি করা। বিনের মনে আছে বাবা বলতেন তিনি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। হাই-কে কক্ষনো নিয়ে যাওয়া হবে না। ওকে বাড়িতে রেখে যাওয়া হবে।

বিন্ ও ছুক্ তাদের মায়েদের কাছ থেকে জেনেছে ওদের বাবারা আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। ফঙ্'ই সেই লোক যে তাঁদের খুন করেছে। ফঙ্'কে ওরা ভালভাবেই চেনে।

শুধু ওরা কেন, শয়তানটাকে এ এলাকার সকলেই হাড়ে হাড়ে চেনে। প্রত্যেক দুপুরে ধানক্ষেতের মধ্যে যার সঙ্গে ওরা লড়াই করে সেই কাল্পনিক শত্রু আর কেউ নয় স্বয়ং ফঙ্।

হাই কেন গোপন যায়গা থেকে গ্রেনেড বের করছিল বোঝা গেল। মা তাড়াতাড়ি মাছ ভেজে দিচ্ছেলেন হাই আর তার অন্য সব গেরিলা সঙ্গী সাথীদের জন্য। ওদের আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে তো। বিন্ ও ছুক্ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ওদের কাছে। বিনের খালি গা আর ছুকের প্যাণ্টের ভেতর থেকে তখনও দু চারটে পাতা দেখা যাচ্ছে। একটা গ্রেনেডের একপাশ লাল দেখে বিন্ ওর বোনকে বলল "আমাকে ওটা দাও।"

চিন্ গ্রেনেড গুনতে ব্যস্ত, "পনেরো, ষোলো, সতেরো—দেখছ তো মা, আবার জ্বালাতন করছে।"

ছুকের কোনোদিকে হুঁশ নেই। একদৃষ্টে মনোযোগ দিয়ে সে গ্রেনেড দেখছে। হাই কাকে ওগুলো দেবে ও জানে না। কিন্তু ওর ভাগ যে ও পাবেই সে বিষয়ে ওর কোনো সন্দেহ নেই। ছুক্ গলাটা বাড়িয়ে চিনের মুখের কাছে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, "দিদি, এটা নিশ্চয়ই আমার জন্য রেখেছ?"

হাই উত্তর না দিয়ে বিনুনীটা মাথার ওপর তুলে ফেলল।

ব্যাপারটা কি। ওদের সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলছে না কেন?

সেদিন দুপুরে গ্রামের সামরিক কমিটির প্রধান ভিয়েত কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে মুখ লাল করে এসে খবর দিল, "সায়গনে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। বুঝতে পারছ ঘটনাটার গুরুত্ব?"

হাই ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। বলল: "খুব গোলাগুলি চলছে বুঝি?"

ভিয়েত নারকোলের জল খাচ্ছিল। অদ্ভুত একটা গলায় উত্তর দিল, "এখানকার সবাইকে হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হতে বল।" তারপর একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাদের আশ্রয়-স্থলগুলো ঠিক করো। যে মুহূর্তে হুকুম আসবে সেই মুহূর্তে আমরা আমাদের কাজ শুরু করব। আজকে হলে আজকেই।"

শুনেই হাই তৎপর হয়ে উঠল। বিন্ আর ছুক্ ওদের তৎপরতা লক্ষ্য করল। ওদের কাছে ব্যাপারটা ওই ধানক্ষেত থেকে গরু তাড়ানোর মতো। একটু পর একে একে সবাই আসতে শুরু করল। তাও, হা, বি, মেন সকলে ওদের 'ম্যাটিম' রাইফেল নিয়ে হাজির। মাথায় ওদের টুপি নেই গলায় শুধু একটা করে রুমাল জড়ানো।

তারপরই সামরিক বাহিনীর প্রধান মিসেস্ জে হাসতে হাসতে

ঢুকলেন। মিঃ তু-লি কোমরে দু বেল্ট গুলি নিয়ে লম্বালম্বা পা ফেলে উপস্থিত। মিঃ বা-চা পিঠে গ্রেনেডের বোঝা নিয়ে হাজির। ছোট পা তাম-তো বড় রাইফেল নিয়ে চলে এল। সো মুভ পকেটে গুলি বোঝাই করে হাজির। ছোট ঘরটি লোকে ভরে উঠল। তামাকের ধোঁয়ায় সব অন্ধকার। এর মধ্যে কি করে দুক্ ওর বাছুরটাকে দেখাশোনা করবে? দুক্ তখন খালের জলে স্নান করছিল। হাইকে দেখেই সে ছুটে গেল গ্রেনেডগুলো নিতে। উত্তেজনায় প্যাণ্ট পরতেও ভুলে গেছে সে।

হঠাৎ ভিয়েত চারিদিক তাকিয়ে বলে উঠল: "বা ঘি কোথায়? ওকে দেখছি না যে।"

একজন উত্তর দিল, "ও তুক্‌মা'র বাড়িতে ঘুমিয়ে আছে।"

"এদিকে এতবড় একটা ব্যাপার হয়েছে আর ও ঘুমোচ্ছে?"

লম্বা লম্বা পা ফেলে তুক্ ছুটে গেল বা ঘি'কে আনতে। দুক্ বা ঘির কথা ভুলেই গিয়েছিল। একমাত্র বা ঘি'ই ওকে বন্দুক ধরতে দেয়, ঘুমোবার জায়গা খুঁজে দেয়, মিছিমিছি দাড়ি লাগিয়ে আমেরিকান সেজে ওর সঙ্গে খেলে।

বা ঘি এল শেষ পর্যন্ত। চোখদুটো লাল, গলায় ঝুলছে দুটো গ্রেনেড। চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে আস্তে আস্তে বলল: "সায়গনে সামরিক অভ্যুত্থান? ঠিক খবর? কে কাকে সরাল?"

ঠিক সেই সময় ভিয়েত হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল: "বাপরে কি মিছিল।"

দুক্ বা ঘি'র গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সবাই বসে আছে।

ভিয়েত বলল, "আমেরিকানরা এখন ভাবছে কাকে তাদের আশীর্বাদ দেওয়া যায়। বা ঘি, তু লি, তাম তো—তোমরা তোমাদের রাইফেল নিয়ে ওই গাছগুলোর আড়ালে চলে যাও। খুনেগুলো বাজারের কাছে এলেই আক্রমণ শুরু করবে।"

"আমরা কি সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব?"

"না, ওরা আমাদের কাছাকাছি এলে তারপর।"

"কে কাকে মারছে? রেডিওতে শুনলাম"—

"ইয়ুক্, এসব বাজে কথা শোনার দরকার নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক। আমরা ওদের সকলকে মারব। এই যে মহিলারা, তোমরা এখনও যাওনি?"

মিসেস্ সেস চুল ঠিক করতে করতে বললেন, "আমরা সবাই একসঙ্গে যাব না। জেলা থেকে খবর আসবে।"

"এখনও হুকুম আসেনি?"

"একটু অপেক্ষা কর। একসঙ্গে তোমাদের ডাক পড়বে না। যদি হুকুম না আসে তাহলে আমাদের প্ল্যান্ অনুযায়ী এগোব। শত্রুর মোকাবিলা ঠিকই করব।"

হঠাৎ শোনা গেল ঘড় ঘড় আওয়াজ। তিনটি হেলিকপ্টার বাজারের ওপর বেশ নীচু দিয়ে ঘুরছে। ভিয়েত লাফিয়ে উঠল। কোনো কথা না বলে সকলে ছুটে গেল আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে।

ভিয়েত বলে উঠল, "শোন সবাই, যে যার নিরাপদ আশ্রয়ে থাক। ছুক্, এখন কোথাও যাবে না।"

বা ঘি এক হাতে রাইফেল আর এক হাতে ছুকের হাত ধরে চোখ পিট্পিট্ করে বলল, "আমার সঙ্গে একটু যাক্ না।"

ভিয়েত রাজী হোল না। হাই দৌড়ে এসে ছুকের হাত চেপে ধরল। ছুক্ ওকেও টানতে শুরু করল। বিন্কেও নিয়ে চলল ওর সঙ্গে। হাই দুজনকে ধরে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করে: "দাঁড়া, তোদের দুজনকেই ঘরে বন্দী করে রাখব। ওরা ওই প্লেনগুলোকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে। তোরা তা পারবি না কি?"

একটি গেরিলার গলা শোনা গেল, "হাই তুমি কিন্তু সত্যিই দিদিগিরি ফলাচ্ছ। ওরা এত বড় হয়েছে আর তুমি বলছ কিনা ওরা পারবে না?"

আর একজন ফোড়ন কাটল, "মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার

বয়স হয়ে গেছে ওদের। ছাখ তো কেমন চুল কেটে ফেলেছে। বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য তৈরি।"

বিন্ ও তুক্ তো আহ্লাদে আটখানা। অনুকম্পার চোখে তাকাল দিদির দিকে। ভিয়েত ওদের দুজনের হাত ধরল, "সামগ্রিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত অপেক্ষা কর্। আমি তোদের সঙ্গে নিয়ে যাব। তোদের মায়েদেরও নেব সঙ্গে। লে হিয়ো যখন জেলা প্রধানের বাড়ি আক্রমণ করতে যাবে ওর সঙ্গে পাঠিয়ে দেব তোদের। সব আমেরিকান্‌গুলোকে বেঁধে নিয়ে আসব তোদের কাছে, কেমন? নে, এখন প্যাণ্টটা পরে নে। খেয়ে নে লক্ষ্মী ছেলের মতো।"

ওরা ভিয়েতের কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হোল। ওরা জানে না কবে ওরা যেতে পারবে কিন্তু মা-ও যাবেন শুনে বেশ নিশ্চিন্ত লাগল।

এমন সময় একটি অল্পবয়সী চট্‌পটে মেয়ে ছুটে এল খবর নিয়ে। তুক ও বিন্ তখন দেওয়ালের গায়ে পিঁপড়েদের কাণ্ডকারখানা দেখতে ব্যস্ত। মায়েদের গল্প শোনা গেল রান্নাঘর থেকে, "দেখিস বাবা, খাবার যেন না পড়ে থাকে।"

এদিকে গেরিলারা লড়াই এর জন্য প্রস্তুত। রাইফেল হাতে একে একে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মো কে বাজার থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। গ্রামের লোকের এই প্রথম যুদ্ধ।

ভিয়েত গলার রুমালটা ঠিক করে বাঁধতে বাঁধতে বলল: "খাবারটা রেখে দাও মা। আমাদের একটু দেরি হবে ফিরতে। আজ রাতে যদি না ফিরি তবে কাল এসে খাব। চিন্তা কোরো না—ঠিক ফিরে আসব।"

হাই সবার শেষে বেরোল। ও শোবার ঘর থেকে কয়েকটা জিনিষপত্র নিচ্ছিল। যেই সে বেরিয়েছে তুক আর বিন্ কোথা থেকে ছুটে এসে ওর জামাটা চেপে ধরল। হাই কান্নাভেজা গলায় বলল, "এটা তো শুধু একটা অভ্যুত্থান। এরপর যখন সবাই মিলে লড়াই

করবে তখন তোরাও যাবি। তোরা কি চাস না আমি ফঙ্‌কে মারি? লক্ষ্মী ভাই দুটি আমার, কাঁদিস না। ফঙ্‌কে আমরা সবাই এখানে ধরে নিয়ে আসব। তোরা আমাদের ভালবাসিস না?"

বলেই হাই নিমেষের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওর লম্বা বিনুনীটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

মাঝরাতে শুরু হোল যুদ্ধ। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ছুঁচের মত বিঁধছিল চোখে মুখে। ত্রাভিনের দিক থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ আসছিল। আস্তে আস্তে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের মত রাঙা হয়ে উঠেছে আকাশ। ওই মিশমিশে অন্ধকারেও সবকিছু যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কত রকমের প্লেন গর্জন করতে করতে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে মাথার ওপর দিয়ে। আগুনের গোলা মাটি ফুঁড়ে সমস্ত গ্রামটাকে গিলে খেতে আসছে।

গ্রামের লোকেরা সবাই জড়ো হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। মায়েদের কোলে শিশুরা মুখ গুঁজে এই তাণ্ডবলীলার মধ্যেও নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোচ্ছে। তুক ও বিন্‌ এরই মধ্যে খেলায় ব্যস্ত। পাটের বস্তার ওপর দিয়ে সমানে লাফাচ্ছে ওরা। ওদের মায়েরা পান চিবোতে চিবোতে কথা বলছেন।

তুক্‌ এক হাতে ওর মার হাঁটুটা চেপে ধরে অন্য হাতে খেলনার বন্দুকটা মাথার ওপরে একটা জেট্‌ প্লেনের দিকে তাক্‌ করে বলল, "ভাখো এটাকে আমি ঠিক গুলি করে মাটিতে ফেলে দেব।"

প্লেনটা খুবই নীচু দিয়ে উড়ছিল। মা তাড়াতাড়ি ওর হাতটা নামিয়ে দিলেন। শত্রু যদি বুঝতে পারে ওরা এখানে আছে তাহলে আর নিস্তার নেই। বিন্‌ ওর মার কোলে শুয়ে আগুনের খেলা দেখছে। ঠিক যেন একটা উৎসব।

এরই মধ্যে কানে আসছে গেরিলাদের টুকরো টুকরো কথা আর হাসির শব্দ। বিন্‌ হঠাৎ লাফিয়ে উঠল আনন্দে, "মা তুমি যাবার সময় আমাকে নিয়ে যাবে তো?"

"ঠিক আছে ঠিক আছে। এখন একটু চুপ করে বোস্ তো।"

"আচ্ছা মা, ঠাকুমা যদি এখনও বেঁচে থাকতেন তবে তাঁকেও তুমি সঙ্গে নিতে, না?"

বিন্ শুনেছে ওর ঠাকুমা প্লেন দেখলেই অভিশাপ দিতেন আর ফঙের সর্বনাশ কামনা করতেন।

"হ্যাঁ", মা উত্তর দিলেন।

"বাবাও যেতেন যুদ্ধে, যদি বেঁচে থাকতেন?"

"হ্যাঁ", মা নিঃশ্বাস ফেললেন।

বিনের বয়স কম। ও জানে না যে তার বাবার মত এ গ্রামের কত লোক ফঙের হাতে খুন হয়েছে। মায়েরা সে সব দৃশ্য চোখের সামনে থেকে সরাতে পারেন না। চিন্তার রেশ ছিঁড়ে গেল বোমার ভয়ঙ্কর গর্জনে।

রাশ ডো'র সামরিক ঘাঁটি থেকে আগুনের আলো দেখা গেল। কি হয়েছে, কি হতে পারে ওখানে? পাশের গ্রাম থেকে ড্রাম আর ঘণ্টার আওয়াজ আসছিল। তুক্ নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছিল এই আলোর মেলা। মা'কে বলল, "ওখানেই কি বা ঘি প্লেনগুলোকে গুলি করছে?" কোনো উত্তর না দিয়ে মা জামার বোতাম আটকালেন।

"প্লেন চলে গেল না মা?"

"পালিয়ে তো গেলই। দেখছ না তোমার ভাইরা রাশ ডো'তে শত্রুর আড্ডাটাকে জ্বালিয়ে দিল।"

বিন্ উত্তেজিত হয়ে উঠল: "দিদিও কি ওখানে আছে?"

সত্যিই তো হাই এখন কোথায়? সে কি এখন প্যাণ্টটা গুটিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধবন্দীদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলেছে? যেমন করেছিল মো-কে যুদ্ধের সময়। হয়ত সে একটার পর একটা গ্রেনেডও ছুঁড়ছে যেমন ছুঁড়েছিল লো হিয়ো ঘাঁটি দখলের সময়।

নাকি ওর বাবার মত হুকুমের অপেক্ষা না করে গ্যাসোলিনের বোতল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুর ওপর।

যুদ্ধের ময়দানে বসে মা ভাবছেন তার আদরের মেয়ের কথা। কত কথা কত ঘটনা ভেসে উঠছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ভিয়েত তার বাঁশি বাজাচ্ছে, সো মে জামা সেলাই করছে, হা নদীর পারে এক হাঁটু জলে নৌকোটাকে ঠেলছে, বা ঘি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে গা'কে বিয়ে করতে অনুরোধ করছে আর গা বোঝাতে চেষ্টা করছে পার্টির অনুমতি ছাড়া বিয়ে করা অসম্ভব। ওরা সবাই এখন লড়াই-এর ময়দানে—রক্তরাঙা আকাশের নীচে। ওরা ঘাঁটি ভাঙছে, হাতিয়ার জোগাড় করছে, আরও কত কি করছে। মা কি আর সব কথা জানেন। কিন্তু এটা ঠিক ওরা যা করছে সবই তিনি প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তে আশা করেছেন। স্বামীর জন্য সে রাতে যে ভাবে অপেক্ষা করেছেন তার থেকেও বুঝি অনেক স্বপ্ন, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তিনি বসে ছিলেন এই দিনটির জন্য।

বিনের মা তুকের মা'কে একটি পান দিয়ে বললেন, "ফরাসীদের সঙ্গে লড়াই-এর সময় আমার স্বামী যখন শত্রু ঘাঁটির ওপর হামলা করতে যেতেন আমি রাতে ঘুমোতে পারতাম না। সারা রাত ছটফট করতাম। তখন যদি এখনকার মত পান খাবার অভ্যেস থাকত তাহলে ভাল হোত। অনেক চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতাম। আজও ছেলেমেয়েদের দেখে একটু ভয়—ভয় লাগছিল। কিন্তু তবুও ওদের তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছি।"

"তোমার চিনের বয়স কত হোল?"

"তা প্রায় সতেরো তো হবেই।"

তুকের মা বললেন, "আমার এখনও হো কাকার কথা মনে পড়ে। কি অদ্ভুত ভাবে তৈরি করেছেন তিনি ছেলেমেয়েদের। মনে আছে যুদ্ধ বিরতির সময় বিনের বয়সী বাচ্চাদের জন্য কত মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন আজ সার্থক হোল।"

শুধু রানা ডো নয়, ত্রাভিনের দিক থেকেও আগুনের লাল আভা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল আকাশ জুড়ে। ঘণ্টার আওয়াজ, অগুন্তি হাততালি আর বিজয়োল্লাস ঢেউয়ের মত আকাশ-বাতাস ছাপিয়ে অনুরণিত হল। মায়েরা তাঁদের কোলের দিকে তাকালেন। বাচ্চারা কখন এক ফাঁকে পালিয়েছে। কোথায় কে জানে।

অনুবাদ ॥ মালা ভট্টাচার্য

ইউসেফ এল-সেবাই

মিশরের বিখ্যাত এল্ সেবাই পরিবারে ১৯১৮ সালের ১০ই জুন এল্ সেবাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুহম্মদ এল্ সেবাইও একজন প্রতিভাবান লেখক ছিলেন।

স্কুল জীবন থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন। কায়রোর ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করবার পর অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক পদে উন্নীত হন। সামরিক জীবন থেকে অবসর নেবার পর মিশরের আইন সভায় যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রী হন। তাছাড়া মিশরের রাইটার্স ইউনিয়নের তিনি ছিলেন সেক্রেটারী এবং আরব রাইটার্স ইউনিয়নের ও আফ্রো-এশিয়ান সোলিডারিটি অরগানাইজেশানের সেক্রেটারী জেনারেল। 'আফ্রো-এশিয়ান রাইটিঙ্'-এর, পরবর্তী কালে যা লোটাস নামে ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়, সেই সাংস্কৃতিক পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক। মার্কিন সাহায্যপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ইজ্‌রায়েলী আক্রমণ ও জাওনিস্ট জাতিবাদবিরোধী আরবদের মুক্তি সংগ্রামকে আফ্রিকার, আফ্রো-এশিয়ার তথা সারা বিশ্বের মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সামিল করাই ছিল ইউসেফ এল্ সেবাই-এর জীবনের লক্ষ্য। আফ্রো-এশীয় লেখকদের একটি বৈঠকের পূর্ব মুহূর্তে তিনি সাইপ্রাসের নিকোশিয়ায় দক্ষিণপন্থী শক্তি নিয়োজিত অজানা ঘাতকের হাতে নিহত হন ১৯৭৮ সালে।

প্রাচীন ক্ল্যাসিকধর্মী গদ্য রীতির পরিবর্তে নতুন স্টাইলের গদ্যরীতির তিনি প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন। আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিশেষ করে কথা-সাহিত্য তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানে সমৃদ্ধ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। 'রদ্দুল কালবি', 'হাজা ওয়া হুব্বু', 'হাজিজিল হায়াত' প্রভৃতি তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

পিঁপড়েটাকে মেরো না

ইউসেফ এল-সেবাই

ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে···

তার পেছন থেকে গাছের থমথমে ছায়া আরো লম্বা হচ্ছে···লম্বা হতে হতে তীর ছাড়িয়ে একেবারে জলের কিনার পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে গুটিসুটি সে বসে আছে গর্তের মধ্যে, ছড়িয়ে পড়া ছায়া লক্ষ্য করছে।

অন্ধকার নামতে এত দেরি হচ্ছে কেন ?···

অন্ধকার কেন আরো তাড়াতাড়ি আসছে না ? কেন আসছে না ছুটে ?···

অন্ধকার কি বুঝতে পারছে না যে এখন আর গড়িমসি করার সময় নয়, কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে গা-ছাড়া ভাবে ঘুরে বেড়ানো নয়।···অন্ধকারকে ছড়িয়ে পড়তে হবে, তার কালো কুচকুচে পোশাকটাকে বিছিয়ে দিতে হবে রাস্তা আর দিগন্তের ওপরে, গ্রাস করতে হবে দৃশ্যমান সমস্ত জিনিস, তাদের অবয়বকে মুছে ফেলতে হবে···যা কিছু চোখে দেখা যায় তাকে অবলুপ্ত করাটাই এখন অন্ধকারের কাজ···

অন্ধকার আরো তাড়াতাড়ি আসুক, তার থমথমে ভার চাপিয়ে দিক সব কিছুর ওপরে, জগতটা হয়ে উঠুক কালোর সমুদ্র।···

কালো জল···কালো বাতাস···কালো মাটি আর আকাশ।

যখন শিশু ছিল তখন কোনোটাই পছন্দ করত না—না কালো, না অন্ধকার।···সূর্য ডুবে যাওয়া মানেই মজা শেষ, রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে খেলা বন্ধ···সূর্য ডুবে যাওয়া মানেই জানলা থেকে মায়ের ডাক : 'আয় রে···সাঁঝ হয়ে এল···'

ইচ্ছে করত হাত বাড়িয়ে সূর্যটাকে দিগন্তের কিনারে ধরে রাখে, সূর্য আরো আলো দিক, খেলার জন্যে আরো সময়।

আর আজ কিনা আলোর ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে, ইচ্ছে

করছে হাত বাড়িয়ে সূর্যটাকে অন্ধকার হয়ে আসা দিগন্তের নিচে চেপে ধরে…জগতের ওপরে সূর্যের এই অহেতুক ঝলমলানি বন্ধ করে।

আর কিছু নয়, আলো, সূর্যকে কেন এই আলো দিতেই হবে… এমন এক জগতে যেখানে অন্ধকার আর বিষণ্ণতার রাজত্ব। সূর্যের আলোকে তাই দেখাচ্ছে চকচকে রঙের অনর্থক প্রলেপের মতো—ছাউনিকে চোখের দেখা থেকে আড়াল করার জন্যে যেমন প্রলেপ দেওয়া হয় অনেকটা তেমনি।

সে বদলে গিয়েছে—তার মধ্যেকার ওতঃপ্রোত একটা কিছু বদলে দিয়েছে তার দৃষ্টিভঙ্গি। আগে একসময়ে ভালোবাসত এমন অনেক কিছুকেই সে এখন ঘৃণা করে, আগে একসময়ে ঘৃণা করত এমন অনেক কিছুকেই সে এখন ভালোবাসে। আগে তার মধ্যে উত্তেজনা জাগাত এমন অনেক কিছুই এখন আর তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। আগে একসময়ে যা ফিরিয়ে দিয়েছে তাই এখন সে পেতে চায়।

তখন সে শিশু, একদিন দেখতে পেল একটা আরশোলাকে মারবার জন্যে তার মা ঝাঁটা তুলেছে। তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, দুই চোখ জলে ভরে গেল, চিৎকার করে উঠল সে, 'কেন মারছ?'

অবাক আর বিরক্ত হয়ে মা তাকাল তার দিকে, জানতে চাইল সে কেন চিৎকার করেছে।

সে আবার বলল, 'আরশোলাটাকে মারছ কেন?'

'শেষ করার জন্যে।'

'শেষ করবে কেন?'

মা হতভম্ব হয়ে গিয়ে শুধু বলল, 'এটা তো একটা আরশোলা মাত্র।'

'ও তোমার কী করেছে?'

কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। মা যেন ইতস্তত করছে। মা চিরকাল আরশোলা মেরে এসেছে। সেজন্য কারও কাছে কোনো-

দিন কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি। এই সমস্ত আলোচনা থামিয়ে দেবার জন্যে মা তখন কাটা-কাটা জবাব দিল, 'আরশোলা ক্ষতি করে।'

'কী ক্ষতি করে ?'

'খাবার নষ্ট করে আর জিনিসপত্র নোংরা করে।'

'কিন্তু আমি তো দেখলাম ও শান্তভাবে গুটি-গুটি চলে যাচ্ছিল, ও তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি…' প্রাণীহত্যাকে তখন সে ঘৃণা করত, একটা মাছি বা একটা পিঁপড়ে মারতেও হাত উঠত না। কথাটা তার পক্ষে তখনই মাত্র সত্য ছিল।·· আর এখন…কথাটা স্বীকার করার সাহস কি তার আছে…হত্যা করতেই তার আনন্দ। …হত্যা করার কাজটাকে সে উপভোগ করতে শিখেছে।…ব্যাপারটা কি তাই ?…হয়তো…

নিজেকে বুঝতে পারে—এমন ভান তার নেই। নিজের ভেতরকার অনুভূতির মধ্যে সন্ধান চালাতে সে ঘৃণা বোধ করে, সন্ধানের ফল কী হতে পারে তাই নিয়ে তার ভয়।…তাই বটে…হত্যা করাটাই এখন তাব কাজ হয়ে উঠেছে…এই কাজ সম্পন্ন করতে হয় নিপুণভাবে ও সুন্দরভাবে। আদর্শ রক্ষার জন্য হত্যা করাটাই এখন তার কর্তব্য। যাই হোক না কেন তার ধারণা, যাই হোক না কেন তার ভালো লাগা বা মন্দ লাগা…হত্যা করাটাই হয়ে উঠেছে এখন তার কাজ।

কিন্তু সে কি সত্যিই মনে করে এটা তার কাছে করণীয় কাজের চেয়ে বেশি কিছু নয় ? পালনীয় কর্তব্যের চেয়ে বেশি কিছু নয় ? নাকি হত্যা করার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে থাকে…

তাকে অবশ্যই নিজের কাছে খাঁটি থাকতে হবে, যদিও অপরের কাছে সে প্রায়ই মিথ্যা বলে এসেছে। নিজের কাছে সত্য স্বীকার করতে সে কখনো অপারগ হয়নি। তার সম্পর্কে এই হচ্ছে একটি ব্যাপার যা অপরিবর্তিত আছে। সত্য…সত্য এই যে হত্যা করাটা সে এখন উপভোগ করে থাকে…হত্যা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। সে কি সেই মানুষ যে একসময়ে একটা পিঁপড়ে বা একটা

আরশোলা পর্যন্ত মারতে পারত না…এখনো পারে না…হ্যাঁ… নিজের সম্পর্কে এটুকু তাকে স্বীকার করতেই হবে যে এখনো সে প্রাণ থাকতে একটা পিঁপড়ে মারতে পারে না…তবে খালের ওপারে যারা আছে তাদের কথা যদি হয়…হ্যাঁ, ওদের বেলায় হত্যা করার ব্যাপারটার অন্য অর্থ…এমনকি একটা ছোট্ট পিঁপড়ের বেলাতেও ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে বলে তার যে এত ভয় সেটা এই লোকগুলোর বেলায় অন্যরকম।

হত্যা করার উদগ্র একটা আকাজ্ক্ষা নিয়ে জ্বলতে লাগল…

হ্যাঁ…এইবার ঠিক হয়েছে…সূর্য পুরোপুরি ডুবে গিয়েছে আর সেইসঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছে না-চাওয়া আলোর সমস্ত ছড়ানো ছিটানো অবশেষ—যা জগৎকে প্রকাশ করে দিচ্ছিল।

নানাদিকের অনেক ছায়া মিলেমিশে হয়ে উঠল একটি অখণ্ড থমথমে অন্ধকার। জগৎকে ঢেকে দিল কালো আচ্ছাদনে। অবয়বের সঙ্গে অবয়ব মিশে গেল। খুঁটিয়ে দেখার আর কিছু থাকল না।

তার বুকের ধুকপুকুনি এত বেড়ে গেল কেন? সে কি ভয় পাচ্ছে—হয়তো…তবুও সে চাইছে খাল পার হতে, উদগ্রীব হয়ে আছে লড়াই করার জন্য। সে যে একটু বিচলিত বোধ করছে তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। খানিকটা ভয়ও হয়তো—আগে যখন সে ফুটবল খেলত তখন প্রত্যেক বার ম্যাচের আগে ঠিক এই একই অনুভূতি কি তার হয়নি—

ছাউনিতে তৎপরতার লক্ষণ প্রকাশ পেল। ফিসফিস কথা—চাপা গোঙানি—অল্প গোলমাল—ছাউনির পেছন থেকে নৌকো-গুলো টেনে আনা হল—একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ আর অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গলার স্বর :

'এখন কি—'

সমস্ত গলার স্বর থেমে গেল—ছায়ামূর্তিগুলো নড়াচড়া করতে লাগল ভূতের মতো—ছায়ামূর্তিগুলোকে মনে হতে লাগল টান-টান

—শোনা গেল একটা টোকা দেবার আওয়াজ। ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল একটা গলার আওয়াজ :

'কে আছ ওদিকে, চুপ করো, নইলে আমরা শেষ হয়ে যাব।'

নিঃশব্দে নৌকোগুলোকে জলে নামানো হল—আলতো ভাবে—যেন একটা হাত তার মাথা চাপড়িয়ে দিচ্ছে—ভেতরে পা দিতেই নৌকোগুলো দুলে উঠল আর ঝাঁকুনি খেতে লাগল—শোনা গেল আরো ফিসফিসানি আর বিড়বিড় কথা, তারপরে ধমকের সুরে একটা গলার আওয়াজ—অন্ধকারের ভেতর থেকে আরো দুটো চাপা গলার স্বর শোনা গেল :

'আমি চাই যে তোমরা গুলি চালাতে শুরু করো আর যতক্ষণ না আমি থামতে বলি গুলি চালাতেই থাকো। আমরা যতক্ষণ না পৌঁছে যাচ্ছি গুলি চালানো বন্ধ কোরো না।'

অন্য একটি গলার স্বর ফিসফিস করে জবাব দিল :

'আমার ভয় হচ্ছে আমাদের গুলি তোমাদের গায়ে লাগতে পারে।'

'ও নিয়ে ভেবো না···যতোক্ষণ না আমি সংকেত দিই গুলি চালিয়ে যাও।'

একটু পরে আবার সেই একই গলার স্বর শোনা গেল :

'ব্যাপারটা কি জান, যতোক্ষণ তোমরা গুলি চালিয়ে যাবে ওরা ভাবতেও পারবে না যে আমরা খাল পার হচ্ছি।'

গুলি চলতে শুরু করল···ঝাঁকের পর ঝাঁক···নরকের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল যেন, সেই হট্টগোলে সমস্ত ফিসফিস বিড়বিড় কথা ডুবে গেল একেবারে।

অন্ধকারে যতো নৌকো ভেসে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি তার নৌকো···তাদের বাঁচিয়ে রাখছে আড়াল-তোলা গুলি আর নারকীয় আওয়াজ। জলের ওপরে দাঁড়ের ঘা পড়ছে আর ফোঁটা ফোঁটা জলের ছিটে উড়ে আসছে বাতাসে।···ওপার থেকে গানের শব্দ

ভেসে এল তার কানে। তীরের একটি কাফে থেকে শুনতে গেল ওম কালসুমের গলার স্বর: 'ও আমার মনের মানুষ…'…এ যেন অনেকটা নীলনদীর ওপর দিয়ে প্রমোদ-বিহার। নিজের অজান্তেই সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল আর জোর করে এই তুলনাটা মন থেকে সরিয়ে দিল। পুরনো স্মৃতি মনে করার সময় এটা নয়। তার স্বপ্নে শোনা গলার স্বরগুলো ডুবে গেল এই হট্টগোলের মধ্যে।…ওই সবের জন্যে তার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।…সে কি পারবে এই ঘটনার মুখোমুখি হতে যে সে এখন হত্যা করার জন্যে উদগ্রীব?… হবে নাই বা কেন…এটাই কি সত্য নয়?…

সে যা দেখেছে তা দেখার পর থেকেই হত্যা করার প্রয়োজন তাকে সব সময়ে গ্রাস করতে চাইছে—যেমন গ্রাস করে মরুভূমিতে তৃষ্ণা, বয়ঃসন্ধিকালে যৌন আকর্ষণ…চোখের সামনে মানুষটিকে মরতে দেখার পর থেকে সে শুধু হত্যা করতে চেয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে তরতর করে মানুষটি তাদের দিকে এসেছিল। হাসিমুখে অভিনন্দন জানিয়েছিল তাদের:

'কেমন চলছে তোমাদের, ছেলেরা?'

সে নিজে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আর প্রশংসার চোখে মানুষটিকে লক্ষ্য করেছিল—তামাটে রঙ, জুলপির কাছে পাকা চুল, সিধে শক্ত-সমর্থ চেহারা।

তাদের অবাক-হওয়া মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মানুষটি হাসতে হাসতে বলেছিল:

'এস, এস, তোমরা নিশ্চয়ই এমন কঞ্জুষ হওনি যে আমাদের এককাপ চা খাওয়াতে পারবে না?'…

তারা খুশিতে চিৎকার করে উঠেছিল আর মানুষটিকে নিয়ে এসেছিল নদীর ধারের কুটিরটিতে। গর্বের সঙ্গে তার কাছে তারা নিজেদের কৃতিত্বের কথা বলেছিল।

মানুষটির রুক্ষী ঘড়িব দিকে তাকিয়ে বলেছিল:

'সভায় যদি আপনাকে ঠিক সময়ে পৌঁছতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এবার রওনা হওয়া উচিত...'

সারা মুখে একটা স্বচ্ছন্দ ও খুশির ছাপ নিয়ে মানুষটি জবাব দিয়েছিল ঃ

'আপিসের খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকাটা তো অনেক হয়েছে...এই ছেলেদের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকি।'

শেষ পর্যন্ত মানুষটি উঠেছিল...আর তখনই গুলি চলতে শুরু করেছিল...প্রথমে একটা-দুটো আর আচমকা প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ...খুব কাছে...কানে তালা লাগানো আওয়াজ...প্রথমে কেউ বুঝতে পারে নি কি ঘটেছে, কিন্তু ধোঁয়া ও ধুলো সরে যাবার পরে দেখা গেল মানুষটি পড়ে আছে, তার মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত...তার ঠোঁট থেকে রক্ত গড়াচ্ছে...

কেউ ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারে নি।...কেউ পুরোপুরি বুঝতে পারে নি ঘটনার গুরুত্ব...তবে যার যে ধারণাই হয়ে থাকুক বাপারটা তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর...মানুষটিকে হত্যা করা হয়েছিল...

তখন থেকেই তার মনে এই বোধ এসেছে যে কতকগুলো মূল্য-বোধ বা নীতি রক্ষা করার জন্যে হত্যা করাটা এখন আর করণীয় কর্তব্য মাত্র নয়। তার ভেতরে একটা কিছু তাকে যেন গ্রাস করতে চাইছে, তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে চাইছে...এমন একটা কিছু যা প্রশমিত হতে পারে একমাত্র হত্যা করার ক্রিয়াটি সংঘটিত হলে।

জলের ওপরে দাঁড়ের ছপছপ শব্দ আবার সে শুনতে পেল...না, না, দাঁড়ের নয়...কক্ষনো নয়...বরং যেন বিশাল একটা ছুরি জলের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে...জলের ছিটের ফোঁটাগুলো...বরং যেন রক্তের ফোঁটা, উষ্ণ ও চটচটে, চারদিকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে...

নৌকো তীরে পৌঁছল...কানে তালা লাগানো আওয়াজ সমানে চলেছে...গুলি ছুটছে, তাদের মাথার ওপরে আগুনের একটা চাঁদোয়া তৈরি হয়েছে যেন...:

শুরু হল তীরে অবতরণ···

তার পকেটে হাতবোমা···হাতে মেশিনগান···বালির ওপর ভারী পা ফেলে ফেলে সে চলেছে···

সামনের চারটে পরিখা অন্ধকারে দেখলে ভূতের মতো···মাঝে মাঝে বিস্ফোরণের আলো, আর সেই আলোয় কতকগুলো ট্রাক দেখতে পাওয়া গেল···

আস্তে আস্তে টেনে টেনে, গুড়ি মেরে মেরে তারা এগিয়ে চলল ···আরো বাড়ল আওয়াজ···ঝরে পড়তে লাগল আগুনের ফুলকি আর পৃথিবী হয়ে উঠল যেন একটা নরক···

গুলি কি বন্ধ হবে না···আমাদের লোকেরাই তো গুলি চালাচ্ছে অথচ এই গুলিতে সহজে মারা পড়তে পারি আমরাই···

দূরত্বটা পঞ্চাশ গজের বেশি নয়···শত্রু গুড়ি মেরে রয়েছে তাদের পরিখার মধ্যে, চারদিক বালির বস্তায় ঘেরা, মৃত্যু যে ঘনিয়ে আসছে সেটা ওরা সন্দেহ করতে পারছে না।

দূরের তীর থেকে সংকেত এল।

'গুলি বন্ধ করো।'

গুলি বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত শব্দ থেমে গেল অল্প কিছুক্ষণের জন্যে, সবকিছু শান্ত···তারপরে প্রত্যেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজের মধ্যে···

টেলিফোনের তার কেটে ফেলা হল···

গাড়ির ভেতরে খবর পাঠাবার যন্ত্রগুলো ভেঙে ফেলা হল··· প্রত্যেক প্রবেশপথে মাইন পাতা হল···শত্রুর শিবির বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল···

একটা পরিখার দিকে লাফিয়ে পড়ল সে। মানুষগুলোকে ফাঁদে ফেলার উদগ্র একটা আকাঙ্ক্ষা তাকে চালিত করেছে। একটা বোমা পরিখার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল এই আশায় যে গুড়ি মেরে থাকা লোকগুলো বেরিয়ে আসবে আর তখন একে একে ফাঁদে ফেলবে··· তাদের হত্যা করবে, তার যন্ত্রণাভরা তৃষ্ণা মেটাবে···

কেউ বেরিয়ে এল না···

পাশের পরিখা থেকে আর্তনাদ শোনা গেল কিন্তু কথাগুলো কিছু বোঝা গেল না। দেখতে পেল তার একজন কমরেডের দিকে একটা বন্দুক তাক করা হয়েছে। নিজের বন্দুক দিয়ে সেই বন্দুক-ধারীকে সে গুলি করল।

একটি শত্রু খতম···

আনন্দ আর তার ধরে না···যেন প্রশিক্ষণ শিবিবে বন্দুকের নিশানায় সরাসরি গুলিবিদ্ধ করেছে···

পরিখার মধ্যে আরো একটা আগুনে বোমা ফেলল ··

শুনতে পাওয়া গেল গলার স্বর···কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না···

বন্দুকের নলটা বাড়িয়ে ধরল···তারপরে গুলি চালাতে লাগল, পরিখার গোড়া থেকে শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত·· তারপরেই শোনা গেল আর্তনাদ···

সে জানল না কতজনকে হত্যা করেছে···কিন্তু গুলি চালিয়ে চলল।

আরো আর্তনাদ···কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না···পকেট থেকে একটা হাতবোমা টেনে বার করল···হাতবোমাটা শুধু ছুঁড়ে দিল পরিখার মধ্যে···প্রচণ্ড হাতে···বিস্ফোরণ···দলপতি এসে আর একটা হাতবোমা তুলে দিল তার হাতে···সঙ্গে সঙ্গে সেটাও ছুঁড়ে ফেলল···

নিস্তব্ধতা···নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে শুধু কাতর বিলাপ·· একটু পরে তাও বন্ধ।

তাদের সবাইকে সে হত্যা করেছে···

সবাইকে···

মিষ্টির ওপরে বসা পিঁপড়ে ও মাছির মতো। পরিত্রাণ করার জন্যে পশ্চাদ-বাহিনীর এগিয়ে আসার শব্দ তার কানে এল···কিন্তু একটির পর একটি বিস্ফোরণ···তাদের এগিয়ে আসা বন্ধ।

নিস্তব্ধতায় আরো একবার শিবির ডুবে গেল। এবার ফিরে যাবার সময় হয়েছে।

আহতদের টেনে নেওয়া হল নৌকোয়···আবার গুলি চালাবার হুকুম জানিয়ে দূরের তীরের দিকে একটা সংকেত পাঠানো হল।

আবার শুরু হল আওয়াজ।

আবার শুরু হল নারকীয় তাণ্ডব।

আবার শোনা গেল জলের ওপরে দাঁড়ের ঘা পড়ার শব্দ। জলের ছিটের ফোঁটাগুলো উড়ে এসে তার মুখে লাগল···একটা ফোঁটা চেটে নিল তৃষ্ণায় কাঠ হয়ে যাওয়া গলাটাকে ভিজিয়ে নেবার জন্যে।

এখন সে শান্ত।

এখন আর তার কোনো উত্তেজনা নেই···

তলার বালিতে ঠেকে না যাওয়া পর্যন্ত নৌকোগুলো এগিয়ে চলল···হাল্কাভাবে লাফিয়ে নেমে গেল সে···আনন্দের সঙ্গে··· মুখে হাসি নিয়ে।

দিন হল···ভোরের সঙ্গে সঙ্গে এল আলো।

আলোকে এখন আর খারাপ লাগছে না···

সূর্য তার রক্তিমাভ রশ্মি ফেলল পূর্ব দিগন্তের পেছন থেকে··· দূরের শিবিরের পেছন থেকে···

এখন আর এই নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সূর্যের দিকে তার আনন্দিত মুখখানা তুলে ধরল···ইচ্ছে হল সমস্ত বাধা ঠেলে সূর্যের দিকে হেঁটে যায়···পুবের বালুকাকে ফিরিয়ে দেয় তার শুদ্ধতা···দূর দিগন্তের পেছন থেকে সূর্যকে টেনে তোলে।

প্রাতরাশ খেতে খেতে সঙ্গীকে বলল :

'রাতটা ভালোই গেল।'

বন্ধু হেসে জবাব দিল :

'সহজেই হয়ে গিয়েছে···'

একটা পিঁপড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল বন্ধুর জুতোর দিকে…বন্ধু লক্ষ্য করছিল, নিজের অজান্তেই বন্ধু তার বুটপরা পা এগিয়ে দিল পিঁপড়েটাকে পিষে মারবার জন্যে…

সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, পিঁপড়ের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল বন্ধুর পা…

বন্ধু অবাক : 'কী হল তোমার ?'

সে বলল : 'এই পিঁপড়েটাকে মারছ কেন ?…'

'এটা তো একটা পিঁপড়ে মাত্র !'

'কিন্তু ও তো তোমার কোনো ক্ষতি করেনি !'

বন্ধু মাথা নাড়ল : 'অদ্ভুত মানুষ তুমি !…যা তুমি করে এলে তারপরে…'

সে কিন্তু অদ্ভুত নয়…

সে যা তাই…

যা তাই…সবকিছু সত্ত্বেও যেমন থাকার তেমনি।

অনুবাদ ॥ অমল দাশগুপ্ত

ফ্যাঙ চিহ্ মিন

১৯০০ সালে চীনের ইইয়াং প্রদেশের কৃষক পরিবারে ফ্যাঙ চিহ্ মিন'এর জন্ম। কিয়াংসিতে ছাত্র-জীবনেই তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯২৩শে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে কিয়াংসিতে সামন্তপ্রভু ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৩শে পার্টির নির্দেশে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে কিয়াংসির উত্তরাঞ্চলে এগিয়ে যান জাপানী আগ্রাসন রুখবার জন্য। কুয়োমিনটাঙ সৈন্যদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে তিনি গ্রেপ্তার হন ও তাঁকে কিয়াংসির তদানীন্তন রাজধানী নান্‌চাঙ-এ নিয়ে যাওয়া হয়। কুয়োমিনটাঙ বাহিনী ফ্যাঙ-এর গ্রেপ্তারে উল্লসিত হয়ে একটি পার্কে জনসমাবেশ ঘটায়, বন্দী ফ্যাঙকে সেখানে উপস্থাপিত করা হয়। ফ্যাঙ কিন্তু এই সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহার করেন এবং তাঁর সেদিনের আবেগ ও যুক্তিদীপ্ত ভাষণ উপস্থিত শ্রোতাদের মন জয় করে।

প্রতিক্রিয়া শক্তি হতচকিত হয়ে মিটিঙ ভেঙে দেয় মাঝখানে। ফ্যাঙকে পাঠান হয় কারাগারে। ফ্যাঙকে দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য কোন প্রচেষ্টা বাদ যায় না। তারপর ১৯৩৫ এর আগস্টে ফ্যাঙ্ চিহ্ মিন্‌কে হত্যা করা হয়। কারারুদ্ধ অবস্থায়ও ফ্যাঙ নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। বন্দী অবস্থায় লেখা তাঁর দুটি রচনা সহকর্মীরা পাচার করতে সক্ষম হয়েছিল। লেখা দুটি লু শুন-এর হাতে তাঁরা পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং লু শুন তা পৌঁছে দেন পার্টির কাছে। ১৯৪৯-এ নতুন চীন জন্ম নেবার পর, এই দুটি রচনা প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে অন্যতম—'প্রিয় চীন'।

প্রিয় চীন

ফ্যাঙ চিহ্-মিন

খুব বাচ্চা বয়সে আমি ভর্তি হয়েছিলাম গাঁয়ের এক প্রাইভেট স্কুলে। সাম্রাজ্যবাদ কী, কীভাবে তা চীনকে আক্রমণ করেছে, সে ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা ছিল না। দেশপ্রেমের মানেও আমি বুঝতাম না। পরে, যখন উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলে এলাম, তখন অনেক কিছু জানলাম, বুঝতে শিখলাম নিজের দেশকে ভালোবাসা মানে কী। ১৯১৮'র দেশপ্রেমিক আন্দোলন আমাদের স্কুলকেও নাড়া দিল, আমরা ছাত্ররা একটা সমাবেশও করেছিলাম।

সমাবেশে আমরা কয়েকশ' ছাত্র ছিলাম, প্রত্যেকেই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের তৃপ্তিহীন আক্রমণাত্মক কাজের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ, আরও তীব্র ঘৃণা ছিল নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতক ৎসাও জু-লিন আর চাং ৎসুং-হ্ সিয়াং* এর প্রতি। এমনকি তরুণ শিক্ষকেরাও (পুরনোরা দেশপ্রেমিক আন্দোলন নিয়ে কমই মাথা ঘামাতেন) ছাত্রদের মতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। সমাবেশের উদ্বোধনের পরেই একজন তরুণ শিক্ষক মঞ্চে উঠলেন চীনকে দাবানোর জন্য জাপানীদের পেশ করা একুশ দফা দাবী** পড়ে ব্যাখ্যা করতে। তিনি আরম্ভ করেছিলেন শান্তভাবেই, তারপরেই তাঁর গলা চড়তে লাগল, শীঘ্রই তিনি চিৎকার করতে শুরু করলেন। তাঁর রক্তোচ্ছ্বাসিত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, গলা ফুলে উঠল যেন এখনই ফেটে যাবে, টেবিলে ঘুঁষি মারছিলেন, ঘেমে নেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে, আমরা তরুণেরা ঠোঁট চেপে ধরলাম শক্ত করে,

* পিকিং'এর সেনাপতিদের সরকারের দু'জন জাপান-পন্থী উচ্চ-পদাধিকারী কর্মচারী।

** ১৯১৫'র জানুয়ারীতে, যখন অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াই করছে, জাপানীরা গোপনে ইয়ুয়ান শিহ-কাই, যে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেছিল, তার কাছে চীনের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য একুশ-দফা দাবী পেশ করেছিল।

আমাদের চোখ আগুন ছড়াতে লাগল। আমাদের কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে সময় যদি কোন জাপানী বা বিশ্বাস-ঘাতককে আমাদের সামনে পেতাম, তাহলে নিঃসন্দেহেই তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতাম। সেই সভায় জাপানী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রথমে আমাদের নিজেদের জাপানী জিনিসপত্র ধ্বংস করে তারপর দোকানগুলো খোঁজা—তারপর জনসাধারণকে দেশপ্রেমিক হবার আবেদন জানানো। সভাশেষে যখন ছাত্ররা জাপানী দ্রব্য বার করার জন্য তাদের ড্রয়ার, ট্রাঙ্ক, বাঁশের প্যাঁটরা খুলতে লাগল, ডরমেটরীগুলো উত্তেজনায় ভরে উঠল।

"এটা জাপানী, ভেঙে ফেল"—একটা জাপানী দাঁতের মাজনের বোতল পাথরের সিঁড়িতে ছুঁড়ে ফেলা হ'ল, সেটা চূর্ণ হয়ে গেল, গোটা জায়গা গোলাপী গুঁড়োয় ঢাকা পড়ে গেল।

"এটাও জাপানী, ভাঙো এটাকে"—একটা জাপানী এনামেলের গামলা মেঝেতে উল্টে ফেলে লাথি মারা হ'ল, এনামেলটাকে চটিয়ে দেবার জন্য। শেষ পর্যন্ত একজন ছাত্র সেটাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল, গামলাটা গড়িয়ে এক কোণে চলে গেল।

"দেখ, এই মাদুরটা জাপানী নয়, ভাই না"—একটি ছাত্র একটা মাদুর ধরে রেখেছিল, স্পষ্টতঃ সেটা ছাড়ার ইচ্ছে ছিলনা তার।

অন্যরা জড়ো হয়ে দেখল মাদুরটা একপ্রান্তে লেখা আছে 'জাপানে তৈরী'। তারা চেঁচিয়ে উঠল—

"তুমি কি কানা? পড়তে পারনা? এটার মায়া এত বেশী যে তুমি ক্রীতদাস হয়ে থাকতে চাও।"—তাকে একটাও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তারা মাদুরটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

যখন শহরের স্কুলে এসেছিলাম, আমি ছিলাম এক গ্রাম্য দরিদ্র বালক, সঙ্গে ছিল গেঁয়ো জামাকাপড় আর বিছানাপত্র। জাপানী দাঁতের ব্রাশ, মাজন, গামলা বা বিছানার মাদুর কেনার পয়সা

জোগাড় করা আমার পক্ষে খুব সহজ হয়নি। এও ভালো করে জানতাম যে যদি ঐ জিনিসগুলো নষ্ট করে ফেলি, তাহলে আর পূরণ করতে পারব না। কিন্তু স্বদেশের প্রতি ভালোবাসায় মনে কোন দুঃখের ছায়াও পড়তে না দিয়ে আমি সেগুলো ধ্বংস করে ফেললাম। সে সময়েই আমি স্কুলের বন্ধুদের বলেছিলাম, এর পরে অসুস্থ হ'লেও আমি জাপানী ওষুধ কিনবনা, তাতে যদি মারা যাই, তাও না।

এর পর আমার মন ছেলেমানুষী স্বপ্নে ভরে রইল : স্নাতক হবার পর সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হব, অফিসার হব, তারপর হাজার, দশহাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দেব জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই-এ, ঐ তিনটে দ্বীপকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাব। অথবা ব্যবসা করব, কঠোর পরিশ্রম করে ভাগ্য ফেরাব, তারপর সব সেনা ও নৌবাহিনীকে দিয়ে দেব, যাতে তারা আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দিতে পারে। পাশ্চাত্যের ইতিহাস পড়তাম যখন, আমি আরেকজন নেপোলিয়ন হতে চাইতাম, চীনা ইতিহাস পড়ার সময় হতে চাইতাম দ্বিতীয় এক ইয়ুয়ে ফেই*। পিছন দিকে তাকিয়ে এইসব স্ববিরোধী ধারণাকে কি হাস্যকরই না মনে হয়। কিন্তু সে সময়ে এগুলোকে আমি দারুণ আকাঙ্ক্ষা মনে করতাম। ঐসব আড়ম্বরপূর্ণ পরিকল্পনায় আমি এমন বুঁদ হয়ে থাকতাম যে কখনও কখনও পরপর কয়েক রাত ঘুমোতে পারতাম না।

একজন স্কুল ছাত্রের স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা একটি মেয়ের প্রথম প্রেমে পড়ার সময়ের বাসনার মতই পবিত্র।

বন্ধুগণ, তারপর কী হ'ল, জানো? সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বা ব্যবসা করার বদলে উচ্চবিদ্যালয়ের পর আমি পড়াশোনার জন্য নানচাং-এ গেলাম। প্রাদেশিক রাজধানী, তাই নানচাং মফস্বল শহর থেকে অনেক আলাদা ছিল। সেখানে অনেক

* ইয়ুয়ে ফেই (১১০৩-১১৪২) ছিলেন স্থং রাজবংশের একজন সেনাপতি, উত্তরের তাতারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

বিদেশীকে দেখলাম, অনেক অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাও হ'ল। দুটো ঘটনার উল্লেখ করছি।

শহরের মধ্যে পা বাড়ালেই বিদেশীদের সঙ্গে মোলাকাত হ'ত। নিঃসন্দেহেই আমরা বিদেশীবিরোধী নই। অনেক ওয়াকিবহাল, আদর্শবাদী বিদেশীও আছেন। যারা জাতীয় মুক্তির জন্য চীনের গণ-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরোধী, যাঁরা আমাদের বন্ধু। কিন্তু কিছু লোক আছে যারা চীনে এসেছে পয়সা কামাতে। সহজ জীবন উপভোগ করতে, নয়ত ধর্মোপদেশ দিয়ে আধ্যাত্মিক আফিম ছড়াতে—এরা অত্যন্ত ঘৃণ্য। এরা নিজেদের মনে করে সভ্য ও উঁচু জাত, আমাদের মনে করে বর্বর, নীচু জাত। এদের এই গর্বিত চালচলন, চীনাদের প্রতি অবজ্ঞা আমাকে অবধারিত ভাবেই ক্রোধোদ্দীপ্ত করে তোলে। আমি নিজের মনেই প্রশ্ন করতাম, 'সত্যি আমরা চীনারা কি নিকৃষ্ট জাতি, সত্যি আমরা ঘৃণার যোগ্য। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে ব্যাপারটা সত্য নয়।

একদিন আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম মাথা নীচু করে, চিৎকার শুনতে পেলাম "সরে যাও, সরে যাও।' দেখলাম চারটে লোক, ডাকবিভাগের সবুজ পোষাক পরা, দু'জন করে পাশাপাশি হাঁটছে, হাতে লাল রং'এর পোস্টমাস্টার-জেনারেল ছাপ মারা চারকোণা লণ্ঠন; তাদের পিছনে চারজন খালিহাত, সবুজ পোষাকের ডাককর্মী, তারও পিছনে চারটে লোক দুলকি চালে একটা সবুজ রং'এর ডুলি বইছে। দু'পাশে দু'জন করে ডাককর্মী সেটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে, আর পিছনে আরও চারজন—সবারই সবুজ পোষাক। ডুলিতে বসে এক ভোঁতা নাক, নীল চোখ, বাদামী চুলঅলা পশ্চিমী। তার মুখে বিরাট চুরুট আর মুখমণ্ডলে আত্মকেন্দ্রিক ঔদ্ধত্যের ছাপ। "কাকে ও প্রভাবিত করতে চাইছে?"—আমি চিৎকার না করে পারলাম না। ডাকবিভাগের কাজকর্ম কি এতই

জটিল যে কেবল বিদেশীরাই তা চালাতে পারে? কেন চীনের পোস্টমাস্টার জেনারেল হবে একজন বিদেশী?

পরে পড়াশোনার জন্য কিউকিয়াং'এ গিয়েছিলাম, সেখানেও পরিস্থিতি অন্যরকম। বন্দরে ছিল তথাকথিত বিশেষ অধিকার আর পাছে মার খাই অথবা গ্রেপ্তার হই, সে ভয়ে আমাদের নিজেদেরই সাবধানে চলতে হ'ত। চীনের মাটিতে বিদেশীদের উপনিবেশ, সেখানে বিদেশীদের কাছে চীনাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হয় এটা কি অসম্মানজনক ছিলনা?

যখন নদীর পারে দাঁড়িয়ে থাকতাম, দেখতাম বিদেশী যুদ্ধজাহাজ বা বাণিজ্যতরী ইয়াংসিতে বয়ে যাচ্ছে, অথবা নোঙর করে আছে। কেন চীনের নদীতে আমরা বিদেশী জাহাজকে বিচরণ করতে দেব? কোথাও কোন দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথে চীনের যুদ্ধজাহাজ বা বাণিজ্যতরী আছে? তা যদি না হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে বিদেশীরা চীনের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে। কেন আমরা মাথা নোয়াবো, আর আমাদের মাড়িয়ে যেতে দেব?

তখন আমি এক মিশনারী স্কুলে পড়তাম, সেখানে বিদেশীরা 'সাম্য', 'বিশ্বপ্রেম' এই সব ক্রিশ্চান গুণাবলী প্রচার করত। যুক্তিবিচারে সেখানকার সব শিক্ষকই খ্রীষ্টের অনুগামী হিসেবে সমান ব্যবহার পাবার অধিকারী, কিন্তু পশ্চিমী শিক্ষকেরা মাইনে পেতেন মাসে দু'শো থেকে তিনশো ডলার, আর চীনা শিক্ষকেরা পেতেন একশোরও কম। যারা চীনা শেখাতেন, তাদের মাইনে ছিল আরও কম, ভিখিরীর মত মাসে কুড়ি ডলার। এই কি ক্রিশ্চান সাম্য? পশ্চিমীরা কি ঈশ্বরের প্রশ্রয়ধন্য প্রিয়জন আর চীনা ইতর হতভাগ্যদের তিনি বর্জন করেছিলেন?

একবার ভেবে দেখ, বন্ধুরা। যদি তোমরা অচেতন বা ভীরু না হও, ক্রীতদাস হ'তে না চাও, তাহলে রোজ এই ধরনের অবিচার দেখে তোমরা কি আমাদের দরিদ্র দেশের জন্য লড়াই করতে উঠে

দাঁড়াবেনা। আর আমি তো তখন ছিলাম আদর্শবাদী রক্তগরম এক তরুণ।

পড়াশোনা যখন আর চালাতে পারলামনা, আমি চলে গেলাম সাংহাইতে—সেখান থেকেই চীনের রক্ত চালান যায় বাইরে। আমার সব থেকে খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল ফরাসী পার্কে। সাংহাইতে গিয়েছিলাম আংশিক সময়ের কিছু কাজের খোঁজে, যাতে করে কলেজে ভর্তি হতে পারি, কিন্তু অসংখ্য বেকার-ভর্তি সাংহাইতে কাজ পাওয়া স্বর্গে চড়ার থেকেও শক্ত ছিল—আমার সব আবেদনই প্রত্যাখ্যাত হ'ল। আমি এত দমে গিয়েছিলাম, যে কয়েকজন বন্ধু বলল ফরাসী পার্কে একটু বেড়িয়ে আসতে। যখন গেটের কাছে পৌঁছলাম, দেখলাম লেখা আছে "চীনা ও কুকুরদের প্রবেশ নিষেধ।" আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল মুখ। আর কখনও এত অপমানিত বোধ করিনি। আমাদের জায়গা সাংহাই—সেখানে তাদের পার্ক তৈরী করতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে চীনাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছেনা আর তাদের কুকুরের সঙ্গে একগোত্রে ফেলা হচ্ছে। তথাকথিত সভ্য দেশের লোকেরা কি করে আমাদের এমন অপমান করতে পারে? আমাদের দাঁড়ানোর জায়গা কোথায়? কতকাল আর চীন এভাবে টিকে থাকতে পারে? আমি তাড়াতাড়ি আমার আস্তানায় ফিরে গেলাম।

বন্ধুগণ, পরে শুনেছিলাম কয়েকজন দেশপ্রেমিক লেখক প্রতিবাদ করায় ঐ নোটিশ নাকি তুলে নেওয়া হয়েছিল। সত্যি কি ওটা সরানো হয়েছিল, না কি এখনও তা রয়েছে! বন্ধুগণ, একটা বিষয় ঠিক যে, নোটিশটা থাকুক বা না থাকুক, ঐ প্রভুত্ববাদী বিদেশীদের চীন সম্পর্কে বিষাক্ত আজ্ঞা একটুও পাল্টায়নি।

বন্ধুগণ, সাংহাইতে চিলেকোঠায় শান্তভাবে নিজেকে বন্দী রাখাই ছিল সবথেকে ভাল। বাইরে বেরোলে বা বিদেশীদের বিশেষ অধিকারের এলাকা, যা ছিল 'রাষ্ট্রের মধ্যে আরেক রাষ্ট্র, সেখানে

হাঁটলে উত্তেজিত হবার মত অনেক কিছু ঘটত। সর্বত্র দেখা যেত উদ্ধত বিদেশী 'ভদ্রলোকেরা' রিক্সাঅলা বা কুলিদের লাঠি পেটাচ্ছে, মাতাল নাবিকেরা রাস্তায় ঝগড়া করছে, পুলিশেরা দরিদ্র হতভাগ্যদের ঠেঙাচ্ছে। যদি তথাকথিত পশ্চিমী জেলখানার কাছে যাওয়া যেত, শোনা যেত আমার দেশবাসীর আর্তনাদ ও কান্না, যে সব দেশপ্রেমিকেরা তাদের বিরোধিতা করার সাহস দেখিয়েছে, পুলিশ অতিরাষ্ট্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। একটা আধা উপনিবেশের, আমার অসুখী দেশের মানুষের ছিল এরকম দুর্দশাগ্রস্ত ভাগ্য।

বন্ধুগণ, সাংহাইতে আর থাকতে পারলাম না, কাজেই কিয়াংসি প্রদেশে ফিরে এলাম।

একটা জাপানী জাহাজে চড়লাম। চড়ার আগে যে বন্ধুরা বিদায় জানাতে এসেছিল তারা আমাকে সাবধানে থাকতে বলল, নাহলে ঝামেলায় পড়তে পারি। আমি যাচ্ছিলাম ভিড় ভয় ও দমবন্ধ-করা কম ভাড়ার অংশে। তোমরা জানো, বন্ধুগণ, আমার যক্ষ্মা ছিল, কাজেই ঐ গরম, দমআটকানো আবহাওয়া আমার পক্ষে খুবই খারাপ ছিল। তবুও, একজন দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে ঐ কমভাড়ার বার্থ পাওয়াও ভাগ্য বলতে হবে। সেখানে শুয়ে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। টিকিট পরীক্ষার পর সবে একটু ঝিমুনি এসেছে, হঠাৎ জাহাজের খোল থেকে মারধোর আর সাহায্যের জন্য চিৎকার শুনতে পেলাম, আমি উঠে পরিচারককে জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে। সে বললো কয়েকজন বিনা টিকিটের যাত্রীকে ঠেঙানো হচ্ছে, আর আমাকে বললো নিজেকে সামলাতে। তা না করে, আমি গেলাম জাহাজের খোলে কি হচ্ছে দেখতে। দোরগোড়া থেকে দেখলাম, তিনটে লোক, ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক, চিনির বস্তার উপব গুটিসুটি মেরে বসে আছে। একজন বছর কুড়ির এক গাঁট্টাগোট্টা সৈনিক, ছেঁড়া ইউনিফর্ম পরা, আরেকজন চল্লিশ-পেরনো, মনে হয় মজুর। সে এত রোগা

বোধহয় কোন অসুখে ভুগছে। তৃতীয়জন একটি কৃষ্ণকায়া তরুণী, মাথায় কালো ওড়না, গাঁ থেকে আনা উদ্বাস্তু মনে হ'ল। গুটিশুটি মেরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা চাবুকের ঘা থেকে বাঁচার জন্য হাত দিয়ে মাথা ঢাকছিল। চোরের মত তারা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, যদি তাদের উপর যে নিষ্ঠুর আঘাত বর্ষিত হচ্ছিল, তা থেকে কোথাও একটু আড়াল পাওয়া যায়। কোন গর্ত, এমনকি ময়লা জলের খানা হ'লেও, তারা যেন তাতে ডুব দিত। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সাতজন লোক। একটু পিছিয়ে দাঁড়ানো একজনের শক্তসমর্থ চেহারা, ভুঁড়ি, ছোট গোঁফ, পরণে পশ্চিমী পোষাক। তার হাত পকেটে পোরা, স্ফীত চকচকে মুখে নোংরা হাসি, সে শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিল। এক পলক তাকিয়েই বলা যায়, সেই হ'ল কর্তা, বাকী ছ'জন নাবিক অথবা পরিচারক। তার আদেশে ওরা বিনা টিকিটের যাত্রী তিন-জনকে, চাবুক বা বাঁশের লাঠি দিয়ে মারছিল।

মোটা লোকটা গর্জাচ্ছিলো, "ভালো করে পেটাও, পরের বার যাতে টিকিট কাটে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল নতুন মার তার পরেই হৃদয় বিদারক আর্তনাদ। মোটা লোকটা আর তার গুণ্ডারা হাসিতে ফেটে পড়ল।

মোটা লোকটা খল্‌খল্‌ করে উঠলো "গানটা শোন। চালিয়ে যাও।"

চাবুক আর লাঠি যত চলতে লাগল, গরীব, টিকিটহীন যাত্রীদের আর্তনাদ তত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

"থামো"—মোটা লোকটা আদেশ দিল, "একটা দড়ি আন।" শিক্ষিত বাঁদরের মতই ঐ গুণ্ডারা জানত কী করতে হবে। তাদের একজন তখনই হেলেদুলে চলে গেল, আর একটা দড়ি নিয়ে ফিরে এল।

সৈনিকটিকে দেখিয়ে মোটা লোকটা নির্দেশ দিল "ওকে জলে ছুঁড়ে দাও, মাছেরা খাবে।"

গুণ্ডারা সৈনিকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চিনির বস্তা থেকে সরিয়ে আনল। ডেকের উপর হিঁচড়ে টেনে এনে একটুও দেরী না করে তারা হাত পা বেঁধে ফেলল। দড়িটা এত লম্বা ছিল, সব প্রান্তেই কয়েক গজ করে ঝুলে রইল।

মনে হ'ল সৈনিকটি জ্ঞান হারিয়েছে।

মজুর আর মেয়েটি তখনও খোলের মধ্যে কাঁপছিল, তারা তখনও হাত দিয়ে মাথা আড়াল করে রেখেছিল। মেয়েটিব ঠোঁট ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

কি হয়েছে দেখার জন্য আরও যাত্রীরা এসে জড়ো হচ্ছিল। খোলের দরজার কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা, তাদের মুখে ক্রোধ মেশানো ঘৃণার ছাপ।

ইতিমধ্যে সৈনিকটির জ্ঞান ফিরেছে। তুর্বল স্বরে সে প্রতিবাদ জানালো, "আমার টিকিট কেনার পয়সা ছিলনা, ব্যস, তার জন্য কি তোমরা আমাকে খুন করতে পারো?"

ঠাস্ করে একটা লম্বা গুণ্ডা তার গালে চড় কষাল। "চুপ কর"— সে চেঁচালো, "তোর মত একশোটা অপদার্থ কুত্তাকে আমবা মেরে ফেলতে পারি, এতো একটা।"

তারা ওকে কিনারে নিয়ে গিয়ে দড়ির ঝোলা প্রান্তগুলো বেলিং এর সঙ্গে বেঁধে ওকে বাইরে ছুঁড়ে দিল। জলের একফুট উপরে সে ঝুলে রইল। ছাঁটে ভিজে গেল।

হাতে পায়ের প্রবল যন্ত্রণায় সৈনিকটি সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল।

তাই শুনে শয়তানগুলো হেসে উঠে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

পাঁচ-ছ' মিনিট পরে তাকে আবার হিঁচড়ে টেনে তুললো, ডেকে তাকে গাদা করে ফেলে টানাটানি করে দড়িটা খুললো, আর সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ করতে লাগলো:

"কি, যথেষ্ট হয়েছে?"

"বিনা পয়সায় বেড়াবি না ?"

"পরের বার টিকিট কাটবি তো ?"

"আরেক দফা চাই না কি ?"

"কি বুদ্ধু, বিনা ভাড়ায় বিদেশী জাহাজে যাওয়া।"

উপুড় হয়ে শুয়ে বিশ্রীভাবে ঘষটে যাওয়া কব্জি আর গোড়ালির গাঁট রগড়াতে রগড়াতে সৈনিকটি চোখ বন্ধ করলো, কোন উত্তর দিলনা।

মজুরটির দিকে দেখিয়ে মোটা লোকটা বলল "ওকেও বাইরে ঝুলিয়ে দাও।"

মজুরটি বাধা দিয়ে ডেকের উপর হাঁটু গেড়ে বসল—

"না, দয়া কর।" তার আবেদন শোনা গেল। "বরং আমাকে ডুবিয়ে মার। বেঁচে থাকাটাই আমার কাছে দুর্ভাগ্য।" সে রেলিং-এর দিকে হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করলো।

"থামো। বাঁধো ওকে"—মোটা লোকটা হুকুম দিল।

গুণ্ডারা মজুরটাকে ধরলো, বাঁধলো, দড়ির আল্‌গা প্রান্তগুলো রেলিং'এ বাঁধলো, তারপর তাকে ঝুলিয়ে দিলো বাইরে। সৈনিকটির মতই আশঙ্কায় ভুগলো সে, পাঁচ-ছ' মিনিট আর্তনাদ করলো তোলার আগে, তারপর তাকে ডেকে ছুঁড়ে দিয়ে বন্ধনমুক্ত করা হ'ল। কিন্তু রক্তঝরা কব্জি আর গোড়ালির গাঁট রগড়ানোর বদলে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, তার গাল বেয়ে জলের ধারা নামলো।

একটা রোগা বেঁটে লোক জিজ্ঞাসা করলো "মেয়েটাকে নিয়ে কী করা যায়।"

মোটা লোকটা একটু হাসলো শুধু।

"ওকে বেঁধোনা, ওকে নিয়ে একটু মজা করা যাক।"

মোটা লোকটা ঘাড় নাড়লো।

লোকটা এগিয়ে গেল মেয়েটির প্যান্ট টেনে খুলতে।

অন্যদের মধ্যে দেখা গেল খুশীর আলোড়ন।

আমি রাগে চিৎকার করে উঠলাম "ঠেঙাও মোটাকে!"

"কে চেঁচালো?" মোটা লোকটা গর্জন করে আমাদের দিকে ফিরলো।

"ঠেঙাও ওকে", সব যাত্রী, যারা দেখছিলো, চিৎকার করে উঠলো।

হঠাৎ বাধা পেয়ে মোটা লোকটা ফিরলো, যেতে যেতে বলে উঠলো, "আমরা ওদেব বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনবনা, তবে পরেব বন্দরে নামিয়ে দেবো।"

এক সুরে সম্মতি জানিয়ে গুণ্ডাগুলোও তাকে অনুসরণ করলো।

"হৃদয়হীন বর্বর সব, গরীবের ওপর এ'ভাবে অত্যাচার চালায়!"

"নিষ্ঠুর শয়তান সব।"

"ওর মোটা মাথাটা কেটে ফেলা উচিত।"

"ওই পোষা কুকুরগুলো আরও জঘন্য।"

"আমাদের উচিত ছিল ওই জারজগুলোকে আচ্ছা করে ঠেঙানো।"

যখন যাত্রীরা এইসব কথা বলছিলো, ওরা আস্তে আস্তে সরতে সরতে তাদের কেবিনে ফিরে গেল।

আমার জায়গায় ফিরে এসে বাঙ্কে ধপ করে শুয়ে পড়লাম। আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, যেন জ্বর হয়েছে, আমি একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বন্ধুগণ, ঐ করুণ দৃশ্য কখনও ভুলবনা। কেননা ঐ মোটা লোকটার নির্দেশে শুধু তিনটে বিনাটিকিটের যাত্রীই নয়, গোটা চীনা জাতিই লাঞ্ছিত হয়েছিল। চীনারা কি সত্যি পশুরও অধম? বন্ধুগণ, এই কাহিনী শুনে, তোমরা কি অপমানিত বোধ করনা?

পরে এ ধরনের খারাপ ব্যবহার আমি আরও দেখেছি। সেসব বলতে গেলে কয়েকদিন লেগে যাবে। আর আমি তা বলতেও পারবোনা। এককথায়, আধা উপনিবেশ হিসেবে চীনকে অনেক অন্যায় সহ্য করতে হয়েছে, তার দুঃখ ঘোচাবার উপায় ছিল না

বলে। কিন্তু বন্ধুগণ, এই ধরনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই চীনা জাতির মুক্তি'র জন্য লড়াই'এ আমার উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই মহান কাজের জন্য আমি আনন্দের সঙ্গে আমার জীবন দিয়ে দেবো।

চীন আমাদের মা, আর বন্ধুগণ, আমি নিশ্চিত যে আমার মতই তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তার নাতিশীতোষ্ণ স্নিগ্ধ আবহাওয়া যেন মায়ের উষ্ণতা, যা সন্তানকে আরও কোলের কাছে টেনে আনে। তার বিশাল এলাকা যেন এক মাতৃশরীর, তা কোন তন্বী জাপানী বালিকা নয়। তার অনেক উঁচু পর্বতমালা, আর বিরাট নদীগুলি যেন তার স্বাস্থ্যবতী শরীরের বর্ণালী নকসা, তার ছোট বড় হ্রদগুলি ত্বকের টোল। চীনের আছে, অজস্র উৎপাদনযোগ্য উপাদান, এখনও অনাবিষ্কৃত ধাতু, অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ—তা যেন আমাদের মায়ের প্রাচুর্য্যপূর্ণ দুগ্ধ, তার চল্লিশ কোটি সন্তান-কে পালন করার ক্ষমতা। পৃথিবীর অন্য কোন মায়ের কথা আমি মনে করতে পারিনা, যে এত অসংখ্য সন্তানকে পালন করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে, আমাদের সুউচ্চ ওমেই পর্বতমালা, সুন্দর পশ্চিম হ্রদ, আমাদের মোহময় ইয়েনতাং পর্বতমালা, অসাধারণ কোয়েইলিন ভূ-দৃশ্য সবারই প্রশংসা পায়। আমি বিশ্বাস করি চীনে এমন কোন জায়গা নেই, তা শহর বা গ্রাম, পাহাড় বা নদী যাই হোক না কেন সামান্য যত্নে যা সুন্দর দৃশ্যে পরিণত হতে পারে না। আমাদের মায়ের মত স্বভাবেই তা সুন্দর ও সর্বাঙ্গে প্রশংসনীয়।

কিন্তু যাকে আমরা এত ভালোবাসি, আমাদের সেই সুন্দরী মাতা, এতদিন ধরে শোষিত ও নিপীড়িত যে তার সুন্দর নতুন কাপড় বা একটা সাবান কেনারও সামর্থ্য নেই। সেজন্যই তাকে এত নোংরা, কৃশ লাগে। হ্যাঁ, আমাদের মা, ঝলমলে সৌন্দর্য্য নিয়ে জন্মেও ভিখারীর দশাপ্রাপ্ত। পশ্চিমের সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে তার তুলনা চলেনা, এমনকি জাপানী বালিকার কাছেও তাকে লজ্জা পেতে হয়।

শোন, বন্ধুগণ—আমাদের মাতা তিক্তস্বরে কাঁদছেন। আমি শুনতে পাচ্ছি তার শোক—"আমি কি বৃথাই চল্লিশ কোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি। কেউ কি তাদের সম্মোহিত করে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে! কেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয় না? তাহলে তো তারা যে-শত্রুরা তাদের মাকে ধ্বংস করছে, শোষণ করছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই'এ জোর পেত। তারা কি তাদের মাকে উদ্ধার করতে চায় না, তাকে পৃথিবীর সব থেকে স্বতন্ত্র, সব থেকে সম্মানীয় জননী করে তুলতে চায় না।"

বন্ধুগণ, তোমরা কি আমাদের মাতার আর্তনাদ শুনেছ? আমাদের ভর্ৎসনা করে তিনি ঠিকই করেন। তাঁর আর্তনাদের জন্য আমরা তাঁকে দোষ দিতে পারি না। আমরা শুধু নিজেদের দোষ দিতে পারি, কেননা আমাদের মধ্যে আছে অধঃপতিত লোকজন, যারা আমাদের জনগণের উপর অত্যাচার চালায় যাতে আমাদের সুন্দরী মাতা যখন অপমানিত হয়, নিষ্ঠুরভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখন আমরা শুধু দেখে যাই। আমরা, তার সন্তান হিসাবেই অন্যায় করছি, আমাদের মাকেও আমরা রক্ষা করতে পারি না।

বন্ধুগণ, দেখ এই সাম্রাজ্যবাদীরা কি বর্বর। চীনা লোককথার কোন দৈত্য বা দানবও এই লোমশ ওরাং-ওটাংদের মত বর্বর নয়। যখন তারা অতল গহ্বরের মত তাদের রক্তাক্ত মুখব্যাদান করে, তারা কয়েক সহস্র মানুষকে গিলে ফেলতে পারে। তাদের তীক্ষ্ণ প্রসারিত নখর ভয়ঙ্কর ভাবে চক্চক্ করছে। ছাদের বদলে তাদের রয়েছে লোহার মত শক্ত নখ। কি ভয়ঙ্কর আর ঘৃণ্য এই শয়তানেরা। আর এখন এই শয়তানদের পাঁচজন* আমাদের মায়ের কাছে এগিয়ে আসছে। দেখেছ তা? হটাও ওদের। তারা ওঁকে টেনে নিয়েছে বাহুর মধ্যে, তাদের রক্তাক্ত মুখ ওর ঠোঁটে ও গালে লাগানোর জন্য, ওঁর সুন্দর ত্বক আর স্তনের উপর তাদের নোংরা হাত রাখছে। আর

* সে সময়ে যারা চীন আক্রমণ করেছিল, সেই পাঁচ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও ইতালীর কথা বলা হয়েছে এখানে।

দেখ, শাদা মুখোশপরা শয়তানটা কি করছে। সে একটা সোনালী নল বসিয়েছে ওঁর বুকে আর রক্ত টেনে নিচ্ছে। ওঁর মুখ যন্ত্রণায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অন্য শয়তানরাও সেই একই পথ ধরতে যাচ্ছে। দেখ, তারা প্রত্যেকেই তাদেরই তৈরী ক্ষতে সোনা, লোহা বা রবারের নল বসাচ্ছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ত টেনে নিচ্ছে। নিশ্চয়ই তারা শীঘ্রই ওঁর শিরা থেকে সব রক্ত টেনে নেবে।

হেই! ঐ বেঁটে শয়তানটা একটা কসাই'এর ছুরি বার করেছে! কি করতে যাচ্ছে ও! আটকাও ওকে! ওকি আমাদের মায়ের মাংস কেটে নেবে! ওকি ওঁকে খুন করতে যাচ্ছে? ঐ বর্বর আমাদের জননীর কাঁধে আঘাত করেছে, কেটে নিয়েছে তার বাম বাহু ও স্তন। এর মধ্যেই সে ওঁর শরীরের এক-পঞ্চমাংশ কেটে নিয়েছে। মায়ের রক্ত প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে যাচ্ছে; ওঁর চোখের জল রক্তের সঙ্গে বয়ে নামছে, কিন্তু ওঁর কম্পমান ঠোঁট থেকে একটুও শব্দ বেরোচ্ছে না। বন্ধুগণ, ভাইয়েরা! আমাদের মাকে বাঁচাও, তিনি মারা যাচ্ছেন।

ঐ বেঁটে শয়তান আমাদের মায়ের শরীরের এক-পঞ্চমাংশ গলাঃধকরণ করার পরেও লোভার্ত বাঘের মত তাকাচ্ছে। শয়তান, তুমি কি ওঁকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চাও, গোগ্রাসে ওঁকে সম্পূর্ণ গিলতে চাও? ভাইয়েরা, যে ভাবেই হোক, ওটাকে আটকাতে হবে। ঐ হিংস্র পশু আমাদের সুন্দরী জননীর প্রতিটি অঙ্গ টুকরো করে ফেলে তাকে এক রক্তমাখা বিকলাঙ্গ জীবে পরিণত করেছে। ভাইয়েরা, যে কোন মূল্যে আমরা ওটাকে ঠেকাবই। আক্রমণ কর ঐ শয়তানকে, আমাদের লৌহমুষ্টি নিয়ে আঘাত কর ওকে যতক্ষণ না সে আমাদের মাতার মাংস উগরে ফেলছে। কোন-ভাবেই ওকে এটা হজম করতে আর তা থেকে পুষ্ট হতে দেওয়া হবে না। আমরা আমাদের মাকে উদ্ধার করব, তাকে সুস্থ করব, তাকে টুকরো হয়ে যেতে দেব না।

আর ঐ চীনারা, ওরা কি ওঁর সন্তান ? তবে কেন তারা শয়তান-দের সাহায্য করছে, নিজেদের মাকে খুন করায়। দেখ, যখন তারা ছুরি চালাচ্ছে, এরা টুকরো মাংস নিয়ে তাদের মুখে পুরে দিচ্ছে আর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, যাতে তারা গিলে নিতে পারে। এখন এরা ওদের ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছে, যাতে ওরা হজম করতে পারে। এই তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর চীনারা কেন শয়তানদের অঙ্গুলি নির্দেশে চলে ? এই বিরক্তিকর মোসাহেবরা নির্লজ্জ, অতি নির্লজ্জ। ওরা পুতুল, বিশ্বাসঘাতক—সব থেকে নোংরা আবর্জনা। নিজেদের মা, ভাইদের খুন করায় শয়তানদের সাহায্য করে তোমাদের কী লাভ হবে ? পুতুল, বিশ্বাসঘাতক, পোষা কুকুর, তোমাদের বলে দিতে পারি, যখন ঐ শয়তান আমাদের মায়ের মাংস হজম করে ফেলবে, তখন নির্লজ্জ তোমাদের উপর মলত্যাগ করবে।

দেখ, বন্ধুগণ। অন্য শয়তানরাও ছুরি বার করেছে, আমাদের জননীর শরীরের দিকে লোভের সঙ্গে তাকাচ্ছে। ওরাও কি বেঁটে শয়তানটার মতই ওঁকে কেটে টুকরো টুকরো করতে চাইছে ? তাহলে শেষ হয়ে যাবে সব—ওরা মাকে খুন করবে—আমরা মাতৃহারা অনাথ হয়ে যাব। তখন আমাদের আরও পীড়ন, আরও অপমান সহ্য করতে হবে। বন্ধুগণ, ভাইয়েরা, শীঘ্র ওঠ, আমাদের মাকে বাঁচাতে হবে। আমরা তাঁকে মরতে দিতে পারি না।

বন্ধুগণ, তোমরা কি ভাবছ আমি ক্ষেপে গেছি ? না, না, আমি তোমাদের জননীকে বাঁচানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আর দেরী করা যায়না তাহলে তিনি মারা যাবেন।

বন্ধুগণ, চীনকে পতন ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাও। আমাদের মুমূর্ষু মাতাকে সাম্রাজ্যবাদী শয়তানদের মুঠো থেকে বাঁচাও। দেরী করার সময় নেই। কিন্তু কী ভাবে তাকে বাঁচাবে। আমরা কি কৌশলী ও বুঝদার বক্তব্য বা চিঠি লেখার জন্য আমাদের সেরা

লেখকদের নির্বাচিত করব, যাতে তারা শয়তানদের বুঝিয়ে আমাদের আক্রমণ করায় বিরত করতে পারে? না কি যুক্তিবিস্তার করার জন্য কয়েকজন কৌশলী ও বাক্‌পটু কূটনীতিবিদ্‌কে বাছবো, যার ফলে তারা কসাই'এর ছুরি নামিয়ে রাখবে, চীনের অঙ্গচ্ছেদে বিরত হবে? ধর, আমরা ক্রন্দনপটু কয়েকজনকে বেছে প্রতিনিধিদল তৈরী করলাম, তারা ওদের সদ্‌প্রবৃত্তির কাছে আবেদন জানানোর জন্য একনাগাড়ে সাতদিন সাতরাত কেঁদে গেল, যাতে ওরা চীনকে ছেড়ে দেয়—অথবা হয়ত—কিন্তু বেশী বাড়িয়ে লাভ নেই, কেননা এর কোনটাতেই কাজ হবে না। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে চীন দখল না করার অনুরোধ জানানোটা হ'ল বাঘকে মাংস খাওয়া বন্ধ করতে বলার মত। এর থেকে অসম্ভব আর কিছুই নেই। আবেদন, যুক্তিপ্রয়োগ, কান্নাকাটি দিয়ে আমাদের জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জিত হবেনা। চীনের পক্ষে একমাত্র পথ, আমাদের জননীকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হ'ল সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়ন করার জন্য সারা দেশের জনগণকে অস্ত্র ধরতে ও পবিত্র জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করতে উদ্বুদ্ধ করা। তোমরা কি একথা মানোনা, বন্ধুগণ!

চীন অনেকগুলি যুদ্ধে হেরেছে বলে, যারা সবসময়েই ঝামেলায় থাকে তাদের মতই আমরাও নিজেদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। ওরা ভাবে চীন এক অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে, আর কখনও উদ্ধার হবে না। ওরা ভাবে চীন সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে সদ্যোজাত শিশুর মতই অসহায়। তিন মাস আগে, আদবকায়দা-সম্পন্ন, পাণ্ডুর, দুর্বল দেখতে, চকচকে চুলঅলা একটি ভদ্রলোক, মিঃ এক্সের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটের সেক্রেটারী এই লোকটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কেননা তিনি আমাদের দেশের ভাগ্য নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। আমাদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল :

এক্স : "আমাদের দেশ এখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে।"

আমি : "হ্যাঁ। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের দেশ একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

"শেষ? হ্যাঁ, তাই, আজ হোক, কাল হোক চীন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের বাঁচার কোন রাস্তা নেই"—হতাশার সঙ্গে তিনি মাথা নাড়লেন।

"কী করে এ'কথা বললেন আপনি", আমি বললাম, "বাঁচার কোন পথ নেই এ কী করে সম্ভব।"

"চীন খুব দুর্বল, সাম্রাজ্যবাদীরা কত শক্তিশালী সেটা দেখুন। ওদের হাজার হাজার প্লেন, বোমা ; যে কোন লোককে মেরে ফেলার মত বিষাক্ত গ্যাস। ওদের ঠেকাবার মত কী আছে চীনের?"—সত্যি তাঁকে ভীত দেখাচ্ছিল।

"সাম্রাজ্যবাদীরা শক্তিশালী, তা ঠিক, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হ'লে আমাদের যে লড়াকু শক্তি হবে তাকে ছোট করে দেখবেন না, তাছাড়া…"

"না, না", তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন, "আমাদের জনগণের শক্তি প্লেন আর কামানের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। শেষ হয়ে গেছে, আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই, কোন পথ নেই।"

"তাহলে আপনার মতে আমরা পারি শুধু চেয়ারে বসে ক্রীতদাস হবার জন্য অপেক্ষা করতে। সেটা কি কাপুরুষের কাজ নয়?" আমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে তিনি কোন উত্তর করতে না পেরে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

এই কৃপাযোগ্য ব্যক্তিটি সেই কাপুরুষদেরই প্রতিনিধি, যারা শুধু সাম্রাজ্যবাদীদের প্লেন আর কামান দেখতে পায়, নিজের জাতির সংগ্রামী শক্তি দেখতে পায় না। তার মতে চীনের নিয়তি হ'ল ভারত ও কোরিয়ার* পথে যাওয়া। চীনের ভাগ্য কি এ রকম হতে পারে?

---

* সে সময়ে ভারত ও কোরিয়া বিদেশী শাসনাধীন ছিল, স্বাধীনতা অর্জন করেনি।

এটা কি সত্য যে চীন নিজেকে বাঁচাতে পারে না? না, একে-বারেই না। আমি স্থির নিশ্চিত যে চীন নিজেকে বাঁচাতে সমর্থ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদেব জনগণ কি দেখায়নি, যে তাদের শক্তি অবজ্ঞা করার নয়? সারাদেশ জোড়া ৩০ মে'র আন্দোলন* সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি একটা জোরালো আঘাত, তা দেখিয়েছে যে চীনারা কুকুব বা শূয়োর নয়, যে খুশীমত জবাই করা চলবে। সে-সময়ে বিপ্লবী সরকার সমর্থিত কোয়াং চো ও হংকং-এর ধর্মঘট† হংকং বন্দর বন্ধ করে দিয়েছিল, যার ফলে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদকে পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। যখন উত্তরাঞ্চলীয় অভিযাত্রী বাহিনী†† হুপেহ্ ও কিয়াংসিতে পৌছল, তখন কি আমাদের সৈন্যরা হ্যাংকাও ও কিউকিয়াং'এর ঐসব বিদেশী উপনিশগুলো দখল করে নেয়নি? তার ফলে কি চীনে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔদ্ধত্য ঘা খায়নি?

বন্ধুগণ, আরেকটা গল্প শোনাচ্ছি। উত্তরাঞ্চলীয় অভিযাত্রী বাহিনী যখন কিয়াংসিতে আসে সে সময়ে আমি ঐ প্রদেশে কাজ করছিলাম। একদিন হ্যাংকাওতে কাজে যাব বলে কিউকিয়াং'এ একটা জাপানী জাহাজে উঠলাম। ঘটনাচক্রে এটা সেই জাহাজ,

* চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি মহান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন। ১৯২৫'এর ৩০শে মে সাংহাই'র ছাত্ররা শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখায় ও বিদেশী অধিকারের অবসানে দাবী জানায়। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ও অন্যান্যদের হত্যা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন তাদের দমন করে সারা চীনে নানা শহরে জনগণ ধর্মঘট করে। প্রতিবাদ জানিয়ে ক্লাশ বন্ধ করা হয়, দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

† তিরিশে মে'র গণহত্যার প্রতিবাদে ক্যান্টন ও হংকং'এর শ্রমিকেরা সাড়ে তিন মাসের জন্য ধর্মঘট করেছিলেন।

†† ১৯২৪ সালে বুর্জোয়া বিপ্লবী সান ইয়াৎ সেন কুয়োমিণ্টাংকে পুনর্গঠিত করেন ও কোয়ানটুং'এ অবস্থিত জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠায় কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করেন। সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধবাজ সেনাপতিদের বিতাড়নের জন্য এই সেনাবাহিনী ১৯২৬'এর জুলাইতে বিখ্যাত উত্তরাঞ্চল অভিযান শুরু করে। সেই থেকে একে উত্তরাঞ্চলীয় অভিযাত্রী বাহিনী বলা হয়।

যাতে করে আমি সাংহাই থেকে কিউকিয়াং'এ এসেছিলাম। কিন্তু অবাক হলাম দেখে যে অফিসার ও নাবিকরা, যারা আগে এত নিষ্ঠুর ও উদ্ধত ছিল, তারা এখন অনেক বন্ধুভাবাপন্ন। আমি জাহাজের খোলে গেলাম দেখতে, কিন্তু কোন বিনা টিকিটের যাত্রীকে গুড়িসুড়ি মেরে থাকতে দেখলাম না। কম ভাড়ার অংশের সামনের ডেকে কয়েকজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখলাম, কয়েকজনকে মজুরের মত লাগছিল। তবে বেশীর ভাগই মনে হ'ল কৃষক। একজন পরিচারক তাঁদের খাবার পরিবেশন করছিল। কৌতূহল মেটাবার জন্য আমি কাছে গিয়ে লোকটার সঙ্গে কথা বললাম।

"মাপ করবেন, আপনি কি বলতে পারেন, এরা সবাই টিকিট কেটেছে কিনা"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না কাটেনি", সে জবাব দিল, ওরা সবাই গরীব লোক।

"আপনারা বিনা টিকিটে লোকদের জাহাজে উঠতে দিয়েছেন?"

"আর কি করতে পারি আমরা। অজস্র যাত্রী আছে এখানে, টিকিট ছাড়া। ওদিকে দেখুন। ঐ সৈনিকদের কারও টিকিট নেই" —সে অল্প ভাড়ার অংশে আঙুল তুলে দেখাল। সেখানে এক ডজনেরও বেশী বিপ্লবী সেনাবাহিনীর লোক পরিচারকদের কাঠের বাক্স ঘিরে বসে আছে, যার মধ্যে আছে চিনাবাদাম, ডিম, জমানো সয়াবীনের দই আর অনেকগুলো এনামেলের মদের ভাঁড়। তারা মজা করছিল, পান করছিল আর আড্ডা মারছিল।

"সত্যি ওদের টিকিট নেই"—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমি আপনার সঙ্গে মজা করছি না"—সে জবাব দিল, "উত্তরাঞ্চলীয় অভিযাত্রী বাহিনী হ্যাংকাও পৌছনোর পর থেকেই বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করেছে।"

"আগে কেউ এরকম করতে পারত?" আমি জানতে চাইলাম।

"জীবনেও না। আগে বিনা টিকিটের প্রত্যেক যাত্রীকে ঠেঙানো হ'ত, তারপর নদীতে ফেলে দেওয়া হ'ত।"

"নদীতে ছুঁড়ে দিতেন? ডোবানো হ'ত? সেটা কি আইন বিরুদ্ধ ছিল না?"

পরিচারকটি একটু হেসে বুঝিয়ে দিল, "আমরা সত্যি সত্যি ওদের ডুবিয়ে দিতাম না। শুধু একটু শিক্ষা দেবার জন্য ঢেউয়ের উপরে ঝুলিয়ে রাখতাম। এতেই বেশ কাজ হ'ত।"

"আপনাদের ওপরঅলা এসব বন্ধ করল কেন?"

"বিপ্লব এত জোরদার হয়ে ওঠায় সে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।"

"কিছু যদি মনে না করেন, আরেকটু পরিষ্কার করে বলবেন।"

"কেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়নি? এখন যদি কোন চীনাকে সে মারে বা ডুবিয়ে দেবার ভয় দেখায়, তাহলে চারদিকে শোরগোল পড়ে যাবে। মজুররা ধর্মঘট করবে, জাহাজ আটকে যাবে। তাতে কয়েকটা টিকিটের দামের থেকে অনেকটা বেশী ক্ষতি হবে।"

"আপনি বলতে চান বিদেশীরা চীনাদের একটু ভয় পেতে শুরু করেছে।

সে মুখ টিপে হাসল, "ঠিক বলতে পারি না। তবে ওদের ব্যবহার দেখে তাই মনে হয়।"

আমি তাকে বিদায় জানিয়ে মনে মনে হাসতে হাসতে আমার বার্থে ফিরে এলাম, আমাব ইচ্ছা করছিল সেই মোটা লোকটার খোঁচা খাওয়া রূপটা দেখতে।

যখন ঘুবতে ঘুবতে খাবার ঘবে হাজির হলাম, দেয়ালে বাহারে অক্ষর আর ছবির গোটানো কাপড় ছাড়াও একটা সংবাদ জানানোর বোর্ড দেখতে পেলাম। তার হরফগুলো এত বড় যে দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল।

"জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের ঘোষণা:

"সম্প্রতি সেনাবাহিনীর কিছু লোক ও নাগরিকেরা বিদেশী জাহাজে ভাড়া না দিয়ে যাতায়াত করছেন। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়, আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে ভবিষ্যতে সব যাত্রীই

জাহাজে চড়ার আগে টিকিট কাটবেন। এই নিয়ম কঠোরভাবে পালনীয়।”

তাহলে এমন দিনও এল, যখন বিদেশী জাহাজকেও চীনা ঘোষণা-পত্র ঝুলিয়ে রাখতে হয়, যখন চীনা জনগণ সৈনিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে প্রতিরোধ করার জন্য উঠে দাঁড়ায়, যখন চাবুক, বাঁশের ছড়ি আর দড়ির খাগের ক্ষমতাও হারিয়ে যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধুগণ, এরপর চীনকে অনেক ধাক্কা খেতে হয়েছে। আর পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপতর হয়েছে, ৎসিনান গণহত্যা* থেকে শুরু করে আঠারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনা পর্যন্ত—যখন জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা খোলাখুলিভাবে আমাদের চারটে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ দখল করে নিয়েছে, যখন বেঁটে শয়তান আমাদের মাতৃদেহের এক পঞ্চমাংশ ফালি ফালি করে কেটে গিলে ফেলেছে। চীনের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিহত হওয়ার এই ঘটনা ঘটেছে “অ-প্রতিরোধ নীতি’র জন্য আর এই সত্যের জন্য যে জনগণ তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ায়নি। কিন্তু তারপর জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধ ও দেশ বাঁচানোর জন্য সারা দেশজোড়া আন্দোলন শুরু হ’ল, শুরু হ’ল চারটি উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অপ্রতিহত প্রতিরোধ আর বিখ্যাত সাংহাই যুদ্ধ।** এর ফলে জাপানী উদ্ধত যুদ্ধবাজরা একটা জোর ধাক্কা খেয়েছে আর সারা পৃথিবীর কাছে ঘোষিত হয়েছে যে চীনের দেশপ্রেমিক জনগণ আর সেনাবাহিনী তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য লড়াই করতে এবং জীবন দিতেও প্রস্তুত। চীনের আছে চার হাজার বছরের ইতিহাস আর চল্লিশ

* তেসরা মে’র গণহত্যা নামেও পরিচিত। ১৯১৮’এর ৩রা ও ৪ঠা মে জাপানী আক্রমণকারীরা শানটুং প্রদেশের ৎসিনানে আক্রমণ চালিয়ে পাঁচ-হাজারেরও বেশী চীনাকে হত্যা, আহত ও ধর্ষণ করে।

** ১৯৩২’এর ২৮শে জানুয়ারী জাপানী সেনারা সাংহাই আক্রমণ করলে সাংহাই এর সেনাবাহিনী ও জনগণ প্রবল সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করে।

কোটি জনগণ। আমরা শেষ লোকটি পর্যন্ত সব আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

বন্ধুগণ, যদিও আমাদের মধ্যে শত্রুদের সাহায্য করে এমন পুতুল ও বিশ্বাসঘাতকেরা আছে, তবু এই সব নির্লজ্জ লোকেরা সংখ্যায় কম। চীনা জনগণ তাদের বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করে। তারা তাদের জঘন্য পরিণতির দিকেই এগোচ্ছে। আমাদের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দেশপ্রেমিক। তাদের হৃদয়ে আছে দেশের প্রতি ভালোবাসার চেতনা। হাজার হাজার মানুষ কি জীবনপণ করে লড়ছেনা? তারা কখনও চীনকে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ধ্বংস হ'তে বা বংশধরদের ক্রীতদাস হতে দেবেনা। আমি স্থির নিশ্চিত, বন্ধুগণ, যে আমরা লড়াই করে চীনকে রক্ষা করব—আর এটা কোন শূন্যগর্ভ আস্ফালন নয়।

এটা ঠিক যে চীন এখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত, জনগণ দরিদ্র, কিন্তু কে নিশ্চিত করে বলতে পারে যে চীনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে চীনের সম্ভাবনা দারুণ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক আগেই বানিয়েছিলেন মহাপ্রাচীর, গ্র্যাণ্ড ক্যানাল খনন করেছিলেন, প্রমাণ রেখেছিলেন চীনাজাতির বিপুল সৃজনক্ষমতার। যখন আমরা সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলব, আমাদের মধ্যের বিশ্বাসঘাতক আর সহযোগীদের দূর করে দেব, স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন করব, তখন এই সৃজনক্ষমতা সীমাহীন সুযোগ পেয়ে যাবে। যখন সেদিন আসবে, চীনকে আমরা সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলব। সাম্রাজ্যবাদীদের সব ঘৃণ্য উত্তরাধিকার, দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দ্বিধা ও শত্রুতা, ক্ষুধা ও শীত, অসুখ, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা ও সেই সঙ্গে আফিম যা চীনা জনগণকে অসাড় করে রাখা ও মারার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে—সবকিছুই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গেই মুছে যাবে। আমি স্থিরনিশ্চিত, বন্ধুগণ, যখন সেদিন আসবে সারা দেশগঠনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে শোকের

বদলে আসবে আনন্দময় গান, বিষণ্ণ দৃষ্টির বদলে হাসি, দারিদ্র্যের বদলে সচ্ছলতা, কষ্টের বদলে স্বাস্থ্য, অজ্ঞতার বদলে বুদ্ধি, শত্রুতার বদলে বন্ধুত্ব, মৃত্যুর যন্ত্রণার বদলে জীবনের সুখ আর পোড়োজমির বদলে সুন্দর বাগান। তখন সারা মানবজাতির সামনে আমাদের জাতি মাথা উঁচু করে রাখতে পারবে। তখন আমাদের জননী, সুন্দর পোশাক পরে সমানভাবে বিশ্বের সব মায়ের হাত ধরতে পারবে।

এই গৌরবোজ্জ্বল দিন খুব দূরে নয়, নিকট ভবিষ্যতেই। বন্ধুগণ, এ বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চিত।

অনুবাদ ॥ সব্যসাচী দেব

অ্যান্ ফ্র্যাঙ্ক

১৯২৯ সালের ১২ই জুন ফ্রাঙ্কফোর্টে অ্যান্ ফ্র্যাঙ্কের জন্ম। পিতা অটো ফ্র্যাঙ্ক। ১৩ বছরের ডাচ্ কিশোরী অ্যান্ ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরী বিশ্ব সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এই অনবদ্য ডায়েরীটি পড়তে পড়তে বুদ্ধিদীপ্ত কিশোরী অ্যানের অনুভূতি, উপলব্ধি, পরিবেশ সৃষ্টির বলিষ্ঠতা, চরিত্রের বিশ্লেষণ, বিচক্ষণতা এবং সুচারু কল্পনা পাঠককে প্রতিটি মুহূর্তে অভিভূত করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের জার্মানী হল্যাণ্ড দখল করে। এই সময় নাৎসীদের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে অ্যান্ ফ্র্যাঙ্কের পরিবার আর একটি ইহুদী পরিবারের সঙ্গে আমস্টারডামে একটি বাড়ির চার তলার পিছনের দিকে কয়েকটি কুঠরিতে লুকিয়ে থাকে। প্রতিটি মুহূর্তে শঙ্কার সঙ্গে লড়াই করতে করতে প্রায় দুটি বছর পার করে দেয় এখানে।

এই বিভীষিকাময় পরিবেশেই অ্যানের বিশ্বখ্যাত ডায়ারীটির জন্ম। দুই পরিবারের প্রতিটি মানুষের সুখদুঃখ, হাসি কান্না, হিংসা দ্বেষ আর স্নেহ-ভালবাসার এক জীবন্ত ছবি অ্যান ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরী। সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা এবং সামরিক ঘটনাগুলিকে বালিকা অ্যান নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যেভাবে বিচার করেছে তা পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে।

অ্যান্ ফ্রাঙ্কের প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে আছে তার ডায়েরীর পাতায় পাতায়—

'মৃত্যুর পরও আমি বেঁচে থাকবো আর সেজন্য ঈশ্বরকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কেননা·· আমার মনের ভাবকে, ভাষায় রূপ দেবার ক্ষমতা দিয়ে তিনি পাঠিয়েছেন আমাকে এই পৃথিবীতে।' সভ্যতার শত্রু হিট-লারের নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে সদ্য প্রস্ফুটিত কিশোরী অ্যানও শেষপর্যন্ত রক্ষা পায়নি। ১৯৪৪ সালে আত্মগোপনকারী ইহুদী পরিবার দুটি প্রতারিত হয়। সবাই ধরা পড়ে নাৎসীদের হাতে। তারপর আউস্‌উইৎজ্ কন্‌সেন-ট্রেশান ক্যাম্প, আউস্‌উইৎজ্ থেকে বেল্‌সেন। এই বেলসেন বন্দী শিবিরেই টাইফাস রোগে অ্যান্-এর মৃত্যু ঘটে ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে। কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্পে বন্দীদের মধ্যে মৃত্যুই ছিল স্বাভাবিক আর জীবন দুর্ঘটনা। সেই নিয়ম অনুসারেই যুদ্ধ শেষ হলে দেখা যায় একমাত্র অ্যানের বাবাই জীবিত আছেন। অ্যানের পরিণতি লক্ষ লক্ষ ইহুদীর মতো হলেও এক জায়গায় স্বতন্ত্র।

অ্যান্‌রা ধরা পড়ার পর এস্-এস্ বাহিনী অ্যান্‌দের বাসস্থানটি তছনছ করে কিন্তু এক বাণ্ডিল কাগজ তাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিছুদিন পরে এক ঝাড়ুদার জঞ্জালের মধ্যে অ্যানের লেখা কাগজপত্র আবিষ্কার করেন। মিয়েপ ও এলি নামে দু'টি মেয়ে গোপনে অ্যানেদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এদেরই হাতে অ্যানের লেখাগুলি তুলে দিয়েছিলেন সেই ঝাড়ুদার। যুদ্ধের শেষে অ্যানের পিতা আমস্টারডামে ফিরে এসে লেখাগুলি হাতে পান।

নাৎসীরা অ্যান্‌কে শেষ করে ফেলেছিল বিপজ্জনক সন্দেহে কিন্তু তারো চেয়ে যা বিপজ্জনক, অ্যানের সেই লেখাগুলির দিকে তাদের নজর পড়েনি। অ্যান্ চলে গেছে কিন্তু রয়ে গেছে তার কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর, অ্যানের ডায়েরী, যতদিন মানবসভ্যতা বিরাজ করবে ততদিন ফ্যাসিবাদের শত্রুতা করে যাবে। অ্যান্ ঠিক এতটাই শক্তিধর। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠকে নীরব করে দেওয়া হয়েছে ইতিহাসের এক দুঃসময়ে। রক্ষা পেয়েছে অ্যানের কণ্ঠ, এক শিশুর অস্ফুট আবেদন কিন্তু সেই অস্ফুট স্বরই জানিয়ে দেয় সেদিনকার কথা, লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন কিভাবে বেঁচে বর্তে ছিল, কি ভাবত তারা, কি খেত, কোথায় ঘুমাত···এই শিশু কণ্ঠই কিন্তু নরঘাতকদের অমন হুঙ্কারকে ছাপিয়ে কালজয় ক'রে আজো সরব।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে অ্যানের ডায়েরী। সংখ্যা? বিশ, তিরিশ পঞ্চাশ লক্ষ—তারও ঢের বেশি হতে পারে এবং ক্রমেই তা আরো বাড়বে। ডায়েরীটি ছাড়াও অ্যানের আরো কিছু লেখা—গল্প, স্মৃতিকথা, নীতিকথা, প্রবন্ধ ও একটি উপন্যাসের খসড়া পাওয়া গেছল উদ্ধারকৃত কাগজের মধ্যে। 'টেল্‌স্ ফ্রম দা হাউস বিহাইণ্ড' নামে একটি সঙ্কলনে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বইয়ে সংযোজিত লেখাটি অ্যানের লেখা অসমাপ্ত উপন্যাসের খসড়ার অংশবিশেষ। অ্যান্-এর জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠক আনের্স্ট স্নাবেল-এর লেখা 'দা ফুট স্টেপ্‌স্ অফ অ্যান্ ফ্র্যাঙ্ক' বইটি পড়তে পারেন। অ্যান্‌কে যারা চিনতেন এরকম প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষের সঙ্গে কথোপ-কথনের ও প্রচুর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই বইটি লেখা হয়েছে। অ্যান্‌কে চিনত এরকম দু'জনকে মাত্র জিজ্ঞাসাবাদও করেননি, নামোল্লেখও করেননি লেখক। কারণ এই দু'জন মানুষ নয়। এদের মধ্যে একজন অ্যান্‌দের ধরিয়ে দেবার জন্য ও অপর জন, অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও অ্যান-এর হত্যার জন্য দায়ী।

ক্যাডির কথা

অ্যান্ ফ্র্যাঙ্ক

চোখ মেলে চেয়ে প্রথমেই ক্যাডি লক্ষ্য করল ওর চারদিকের সব কিছুর রঙই সাদা। শেষ যে কথাটা ওর মনে আছে তা হল কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'গাড়ি! গাড়ি! গেল, গেল!' তার পরেই ও পড়ে গেল। আর অমনি সব কিছু অন্ধকার।

ডান পা আর বাঁ হাতে সুতীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করে ক্যাডি অজান্তেই কাতরে উঠল। এর পরেই সাদা টুপিটার মাঝখান থেকে একটা সহৃদয় দৃষ্টি ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

—বাছারে খুব ব্যথা লাগছে না? কি হয়েছিল তোমার? কিছু মনে করতে পারছ কি? সিস্টার জিগ্‌গেস করলেন।

—কই না তো···

সিস্টার মৃদু হাসলেন। কষ্ট হচ্ছিল তবু ক্যাডি বলে চলল—হ্যাঁ···একটা গাড়ি, আমি পড়ে গেলাম তারপর আর কিছু না।

—আচ্ছা, এবার তোমার নামটা বল্লুতো। তাহলে তোমার বাবা মা তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। ওদেরও আর উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হবে না।

ক্যাডির মধ্যে একটা ভয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।···কিন্তু, কিন্তু আর···

আর কিছু ও বলতে পারল না।

—ঘাবড়িও না। তোমার মা বাবা খুব বেশীক্ষণ হল তোমাকে ছেড়ে নেই। আমাদের এখানে তুমি মাত্র ঘণ্টা খানেকের মতো আছ।

ক্যাডি মুখ টিপে একটু হাসল।—আমার নাম ক্যারোলিন ডরোথেয়া ভ্যান অ্যালেটেনহোভেন। ছোট করে ক্যাডি। আর আমি থাকি জুলডার এ্যামস্টেলানে ২৬১ নম্বরে।

—তোমার কি বাবা মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?

ক্যাডি জবাবে মাথা নাড়ল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ক্যাডি, তাছাড়া যন্ত্রণাও হচ্ছিল খুব। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

সিস্টার অ্যাঙ্ক, ছোট্ট সাদা ঘরটার দিকে নজর রাখছিলেন—বিছানার ওপর শুয়ে থাকা ক্যাডির ছোট্ট ম্লান মুখটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন উনি…কেমন নিশ্চিন্তে বালিশে শুয়ে আছে, যেন কিছুই হয়নি। আসলে কিন্তু রাস্তা পেরোনোর সময় মোড় ঘুরে ছুটে-আসা একটা গাড়িতে চাপা পড়েছে মেয়েটা। ডাক্তার বলেছেন ওর পায়ের দুটো হাড় ভেঙেছে, বাঁ হাতটা ছড়ে গেছে, বাঁ পায়েও চোট লেগেছে ভাল রকম।

কে যেন দরজায় টোকা দিল। মাঝারি চেহারার এক ভদ্রমহিলা, সঙ্গে দীর্ঘাকৃতি এক সুদর্শন ভদ্রলোক। সিস্টার ওদের ভেতরে আসতে বললেন। উঠে দাঁড়ালেন সিস্টার অ্যাঙ্ক। এরা নিশ্চয় ক্যাডির মা-বাবা। মিসেস অ্যাল্‌টেনহোভেনকে খুবই উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। সজল দৃষ্টিতে উনি মেয়ের দিকে তাকালেন। ক্যাডি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, এসব কিছুই তার নজরে পড়ল না।

—দয়া করে বলুন সিস্টার, ওর কি হয়েছিল। ওর জন্যে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে শেষটায় ভাবলাম ও কোন দুর্ঘটনায়… না…না…

—ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম। আপনার ছোট্ট মেয়ে ইতিমধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছে।

সিস্টার অ্যাঙ্ক কেসটার যতটুকু জানেন খুলে বললেন। ব্যাপারটা যতখানি সম্ভব হালকা করে বলে নিজেও যেন অনেকখানি স্বস্তিবোধ করে খুশী হয়ে উঠলেন। কে বলতে পারে যে মেয়েটা সত্যি সত্যি ভালো হয়ে উঠবে না। সবাই ওখানে দাঁড়িয়েই কথা বলাবলি করছে এমন সময় ক্যাডির ঘুম ভেঙে গেল। সিস্টারের কাছে একা থাকার সময় ও যেটুকু অসুস্থ বোধ করছিল বাবা মাকে দেখে তা

যেন শতগুণ বেড়ে গেল। রাজ্যের চিন্তা ঝড়ের বেগে তেড়ে এল। নানা রকম ভয়াবহ কল্পনা ওকে ঘিরে ধরল। মনে হল যেন সারা-জীবনের মতো ও পঙ্গু হয়ে গেছে, যেন ওর একটা হাত নেই, এমনি সব কত বিভীষিকাময় চিত্র।

ইতিমধ্যে মিসেস ভ্যান অ্যালটেনহোভেন দেখলেন যে ক্যাডি জেগে গেছে। উনি বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।—খুব ব্যথা করছে? কেমন আছ এখন? আমি কি তোমার কাছে থাকবো? কি চাই সোনা তোমার?

ক্যাডির পক্ষে জবাব দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। মাথা নাড়ল। ও যেন চায় এই ঝামেলাটা এখনই শেষ হয়ে যাক।

ওর মুখ দিয়ে শুধু একটি কথাই বেরুল—বাবা।

মিঃ ভ্যান অ্যালটেনহোভেন বড় লোহার খাটটার একধারে বসেছিলেন। কোন কথা না বলে তিনি মেয়ের হাতটা চেপে ধরলেন।

ম্লান এক ফালি হাসি দেখা গেল ক্যাডির মুখে, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

দুর্ঘটনার পর একটা সপ্তাহ কেটে গেছে। এর মধ্যে ক্যাডির মা প্রত্যেক দিন সকালে বিকেলে এসেছেন। ওঁকে কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে দেওয়া হতনা। কেননা অনবরত আবোল তাবোল বকে উনি বাচ্চাটাকে ক্লান্ত করে দেন। আর সিস্টার, যাঁর দায়িত্ব ছিল সর্বদা ওকে দেখা শোনা করার, লক্ষ্য করছিলেন যে ক্যাডি মার চেয়ে বাবাকেই সর্বদা কাছে পেতে চায়।

এই ছোট্ট রোগিণীকে নিয়ে সিস্টারের তেমন কোন ঝামেলাই ছিলনা। ডাক্তারের চিকিৎসার পর যদিও ও খানিকটা ব্যথা অনুভব করত তবুও কখনও কোন অনুযোগ কি অভিযোগ করত না।

সিস্টার অ্যাঙ্ক যখন ওর পাশে কোন বই কি কোন বোনা নিয়ে

বসে থাকতেন ওর তখন সবচেয়ে ভাললাগত কোন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে। প্রথম কয়েকদিন কেটে যাবার পর ক্যাডি সব সময় না ঘুমোলেও খুব কমই কথা বলত। আর সিস্টার অ্যাঙ্ক ছাড়া আর কারো সঙ্গেই ও কথা বলতে ভালবাসত না। অ্যাঙ্ক খুবই শান্ত স্বভাবের এবং মৃদুভাষী। ওঁর শান্ত স্বভাবটাই ক্যাডিকে আকর্ষণ করেছিল। ও বুঝতে পারছিল এই মাতৃসুলভ স্নেহ এবং ভালবাসা থেকে ও আশৈশব বঞ্চিত। এমনি করেই ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে একটা পারস্পরিক আস্থা গড়ে উঠল।

দিন পনের কেটে গেল। এর মধ্যে ক্যাডি অ্যাঙ্ককে অনেক কথাই বলেছে। সুনিপুণ ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অ্যাঙ্ক ক্যাডির কাছে ওর মা-র সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। ক্যাডি যেন এবকম একটা ঘটনার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। যাতে ও ওব মনের কথাগুলো কাউকে বলতে পাবে।

—একথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি বোধহয় মনে কবছ যে আমি মার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি না?

—না তা নয়, তবে আমার মনে হয়েছে যেন মা-ব প্রতি তোমার ব্যবহার অনেক উদাসীন আর গা ছাড়া।

—ঠিকই মনে হয়েছে। সত্যিই আমি মা-র প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করি না। অবশ্য সে জন্যে আমার খুবই দুঃখ। মা যেন কেমন আলাদা ধরনের। ব্যাপারটা এমনিতে ভীষণ কিছু একটা নয়, কিন্তু যে সব ব্যাপার আমার ভাল লাগে, যা আমার মনকে ঘিরে থাকে সে সব কিছুর ওপরই যেন মা কেমন উদাসীন। আচ্ছা, সিস্টার অ্যাঙ্ক, তুমি বলনা, কেমন করে আমি আমার ব্যবহারটা এমন করতে পারি যাতে মা বুঝতে না পারেন যে ওঁব চেয়ে আমি বাবাকে বেশী ভালোবাসি? আমি তো জানি আমি ওর একমাত্র সন্তান, উনি আমাকে কতো ভালবাসেন।

—তোমার মা তোমার ভালই চান। কিন্তু আমার মনে হয়,

উনি এ ব্যাপারে রাস্তাটা সঠিক খুঁজে পাচ্ছেন না। হয়তো উনি এ বিষয়ে স্বভাবতই খানিকটা লাজুক প্রকৃতির ?

—উঁ হু, তা নয়, মা মনে করেন যে মা হিসেবে ওঁর মনোভাব একেবারে নিখুঁত। কেউ যদি ওঁকে বলে যে আমার সঙ্গে ওঁর ব্যবহারটা ঠিক হচ্ছে না তাহলে মা খুবই অবাক হবেন। মার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমস্ত কিছুর দোষ একা আমার। জানো সিস্টার অ্যাঙ্ক, আমি ঠিক তোমার মতো একজন মা-ই চেয়েছি। আমি একজন সত্যিকার মা চাই। আমার মা সে জায়গা কোনদিন দিতে পারবে না। এ পৃথিবীতে কোন মানুষই তার মনের মতো সব কিছু পেতে পারে না। যদিও বেশীর ভাগ লোকই ভাবে যে আমার কোন অভাব নেই। আমার খুব সুন্দর বাড়ি আছে। বাবা মার সম্পর্ক খুব ভালো। আমি যা চাই সবই ওঁরা দেন। তবুও একজন সত্যিকারের সহমর্মী মা কি একটা মেয়ের জীবনে দরকারী নয় ? আমি বুঝতে পারি মা-র মধ্যে অভাবটা কিসের। ওঁর মধ্যে অনুভূতি বলে কিছু নেই। সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয়ের আলোচনাটাও উনি নিতান্ত সাদামাটা ভাবে করেন। আমার ভেতরে কি হচ্ছে তা কখনই উনি বুঝতে চেষ্টা করেন না। তবু সব সময়েই বলবেন যে আমাদের ব্যাপারে ওঁর খুবই দরদ। ওঁর ধৈর্য আর কোমলতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। উনি একজন নারী, কিন্তু সত্যিকারের মা নন।

—ছি ক্যাডি, মার সম্বন্ধে অমন করে বলে না। হয়তো ওনার স্বভাব তোমার থেকে আলাদা ধরনের আর সম্ভবত উনি তোমার চেয়ে অনেক বেশী জানার জন্য তেমন সূক্ষ্ম বিষয়গুলো এড়িয়ে যেতে চান।

—তা আমি জানি না। আমার মতো একটা মেয়ে তার মা বাবার সম্পর্কে কতটুকু জানে। কিই বা সে জানতে পারে তার মা-র জীবন সম্পর্কে। শুধু এইটুকুই জানি যে আমার মাকে আমি বুঝতে পারি না। আর আমার মা-ও আমাকে বোঝেন না। তাই আমাদের মধ্যে কোন বিশ্বাস গড়ে উঠছে না।

—আর তোমার বাবা ?

—বাবা জানেন, মা আর আমার মধ্যে মতের মিল নেই। সিস্টার, বাবা খুব ভাল, মার কাছে আমি যা পাই না বাবা তা আমাকে পুষিয়ে দিতে চান। তবে বাবা এ বিষয়ে কোন কথা বলতে ভয় পান। আর মাকে আঘাত করে এমন কোন ব্যাপার বাবা এড়িয়ে যেতে চান। একজন মানুষ অনেক কিছু করলেও মায়ের স্থান পূরণ করতে পারে না।

—ক্যাডি, তোমার কথার প্রতিবাদ করতে আমার ইচ্ছে করলেও পারছি না। কেননা বুঝতে পারছি তোমার কথাগুলো ঠিক। তুমি আর তোমার মা বন্ধু না হয়ে তুজনে তুজনের বিরোধী। এটা সত্যিই ভারি তুঃখের ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে তুমি বড় হলে অবস্থাটা ভালোর দিকে যাবে ?

ক্যাডি প্রায় অজান্তেই কাঁধটা ঝাঁকালো।—সিস্টার, আমি ভীষণভাবে মার অভাব অনুভব করি। আমি এখন একজনকে চাই যার ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি আর সে-ও আমার ওপর আস্থা রাখতে পারে।

ক্যাডির কথা শেষ হলে সিস্টার অ্যাঙ্ককে খুবই গম্ভীর দেখাল। —শোনো ক্যাডি, এ বিষয়ে আর আমরা কোন আলোচনা করব না। তবে মনে হয় আমার কাছে মনের কথাগুলো বলেছ যখন তোমার ভালই হবে।

একঘেয়ে ভাবে সপ্তাহগুলো কেটে গেল। অনেকেই দেখতে এসেছিল ক্যাডিকে, ওর ছোট্ট বন্ধুর দল আর পরিচিতেরা সবাই আসা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ সময়টা ওর একাই কাটছিল। শরীরের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ওকে বসবার আর বই পড়বার অনুমতি

দেওয়া হয়েছিল। ওরা ওকে একটা বেড-টেবল এনে দিয়েছিল আর ওর বাবা এনে দিয়েছিলেন একটা ডায়েরী। অবসর মতো মাঝে মাঝে ডায়েরীর পাতায় ক্যাডি ওর ভাবনাগুলো লিখত। ও ভাবতেই পারেনি এতে এত বৈচিত্র্য আর আনন্দ পাবে।

হাসপাতালের জীবন রীতিমতো একঘেয়ে। রোজই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সব কিছুই চলেছে ঘড়ির কাঁটার মতো। কখনো কোন কিছুতে ভুল হয় না। চারিদিক শান্ত নিরালা। ক্যাডির হাতে পায়ে এখন ব্যথা না থাকায় ওর মন চাইত খানিকটা শব্দ, খানিকটা জীবনের স্পন্দন। তবু, সব কিছু সত্ত্বেও সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটে যেতে লাগল। কোন সময়ই ক্যাডি বিরক্ত বোধ করত না। ও যাতে একা একা ডানহাতে খেলতে পারে এমন ধরনের অনেক খেলনা ওকে সবাই দিয়েছিল। তবে ক্যাডি কখনই পড়ার বই পড়তে অবহেলা করতো না। বরং বেশ কিছুটা সময় ওর এগুলো নিয়েই কেটে যেত। এখানে ওর প্রায় মাস তিনেক থাকা হয়ে গেল। এবার খুব শিগগিরই ওর এখানে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। ওর হাড ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারে প্রথমে যেমন ভাবা হয়েছিল আসলে তেমন মারাত্মক কিছু হয়নি। আর ডাক্তাররা ভেবেছিলেন যে ও যখন অনেকটা সেরে উঠেছে, তখন সম্পূর্ণ সেরে ওঠার জন্যে এবার ওর কোন স্যানিটোরিয়ামে গিয়ে থাকাটাই ভাল।

পরের সপ্তাহে মিসেস অ্যালটেনহোভেন ওর সব জিনিসপত্র বেঁধে ছেদে নিলেন। মা আর মেয়েতে মিলে যাত্রা শুরু করল স্যানিটোরিয়ামের দিকে।

স্যানিটোরিয়ামে ক্যাডির দিনগুলো আরো নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। সপ্তাহে দুদিন কি একদিন ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসত। এখানে কোন সিস্টার নেই। সব কিছুই কেমন অদ্ভুত ধরনের। তবু এখানকার উজ্জ্বল সূর্যের আলো ওর পক্ষে খুবই উপকারী।

ধীরে ধীরে স্যানিটোরিয়ামের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাডি। হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হল। আবার হাঁটানোর প্রচেষ্টা চলল। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হত। কিন্তু ক্রমশ হাঁটাচলা সহজ হয়ে উঠল ক্যাডির কাছে। নড়াচড়া করতেও আর কষ্ট হয় না।

মোটামুটিভাবে হাঁটায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে একটা লাঠিতে ভর করে ও সিস্টারের সঙ্গে বাগানে বেড়াতে যেতে শুরু করল। বাগানে বেড়াতে ক্যাডির খুব ভালো লাগত। খুশী হয়ে উঠত। তাই এবার থেকে অনেকখানি সময় বাগানে বেড়ানোর অনুমতি পেয়েছে ক্যাডি। প্রত্যেক দিন নব উদ্যমে ক্যাডি বাগান পরিভ্রমণে যেতে লাগল। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ক্যাডি কল্পনা করত ও সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। খুশীতে ভরে যেত মনটা।

তিন সপ্তাহ বাদে সব পথঘাটগুলো ক্যাডির একেবারে নখদর্পণে এসে গেল। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন ও একা একা বেরোতে পারবে কিনা। খুব ভালো লাগল ক্যাডির।

—কাল সত্যি সত্যিই আমি একা বাইরে যেতে পারব ?

—নিশ্চয়ই, একেবারে একা পালিয়ে চলে যাও, যেন তোমাকে আর ফিরে আসতে না দেখি—ডাক্তার ঠাট্টা করে জবাব দিলেন।

হাতে ছড়ি নিয়ে ক্যাডি এবার বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হল। সত্যি এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এতদিন ওর সঙ্গে সিস্টার ট্রস থাকতেন। তবে প্রথম দিন ওকে বেড়াব ওধারে যেতে দেওয়া হয়নি। আধঘণ্টা বাদে ওয়ার্ড সিস্টার ওকে ফিরে আসতে দেখলেন। ওর গাল দুটো আজ অন্যদিনের চেয়ে বেশী তাজা দেখাচ্ছিল। সমস্ত দেহে ওর খুশীর ঝলমলানি।

—কি বেড়াতে খুব ভাল লেগেছে, তাই না ?

ক্যাডি সলজ্জ হেসে সিস্টারের প্রশ্নের জবাব দেয়।

এরপর থেকে প্রত্যেক দিনই ক্যাডিকে বাগানে দেখা যেতে লাগল। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে ওকে বেড়ার বাইরে খানিকটা যাবার অনুমতি দেওয়া হল। স্যানিটোরিয়ামের এই দিকটা খুবই নিরিবিলি। মিনিট দশেকের রাস্তা পেরোলে ওই বড়ো বড়ো ভিলাগুলো ছাড়া আশে পাশে আর কোন বাড়ি ঘর নেই।

ক্যাডি একটা সরু রাস্তার ধারে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী একটা বেঞ্চ আবিষ্কার করেছিল। এখন ও আরাম করে বসবার জন্য একটা কম্বল সঙ্গে করে নিয়ে আসে। প্রত্যেকদিন সকালে কাঠের গুঁড়িটায় বসে নানান কথা ভাবে···বই পড়ে। বই পড়তে পড়তে হঠাৎ বইটা নামিয়ে রেখে ও ভাবতে বসে···বইটা আমার কেন ভাল লাগছে ? তার চেয়ে কি এখানে বসে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখাটা অনেক ভাল নয়। বই-এর মেয়েটার অভিজ্ঞতার কথা পড়ার চাইতে নিজের মতো করে এই জগত আর তার অর্থের কথা চিন্তা করা অনেক ভালো নয়···

অনেক ভালো—চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা। ফুল, পাখী, গাছপালা···পায়ের কাছ দিয়ে মুখে করে কুটো নিয়ে এগিয়ে যাওয়া পিঁপড়ে···এ সবের কেমন একটা আকর্ষণ আছে। স্বপ্নের ঘোরে ক্যাডি বিভোর হয়ে পড়ে, ও যেন আগের মতো আবার যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারছে। হাঁটছে, দৌড়চ্ছে। ক্যাডি ভাবে এই দুর্ঘটনার পর সব রকম কষ্ট সত্ত্বেও, এখানে এই বনের মধ্যে, স্যানিটোরিয়ামে আর হাসপাতালের নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতার মধ্যে ও আবিষ্কার করতে পেরেছে যে, একজন মানুষ সবার থেকে স্বতন্ত্র, তার নিজস্ব বোধ, চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গী আছে। এ অনুভব ওর আগে কখনও হয়নি আর ওর আশে পাশে যারা আছে তাদের নিয়েও

আগে কখনো এমন করে ভাবেনি। এমন কি ওর মা বাবাকে নিয়েও নয়।

সিস্টার অ্যাঙ্ক ওকে বলেছিলেন—তোমার মা এত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন যার ফলেই জীবনের সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো এড়িয়ে যেতে চান।

সত্যিই তো—ও ওর মা বাবার জীবনের কি এমন জানে যার জন্য মা-র সম্বন্ধে সেদিন ও অমন করে বলতে পেরেছিল! আজকের এই অনুভবের আগে সে সম্বন্ধে ও কিছু জানতে পারেনি বলেই কি অমন মর্মান্তিক উত্তর দিতে পেরেছিল! জবাবটা কি অসত্য নয়! একটা শিশু তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক শিক্ষিকা সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে, যা জানে তা কি বহির্জীবনের সম্পর্ক নয়। মনের মধ্যে ক্যাডি এক গভীর লজ্জা অনুভব করতে লাগল যদিও ও জানেনা অন্যদের সম্পর্কে ও কি ভাবে জানতে পারবে। ক্যাডি মনে মনে স্থির করল যদি ও ওদের বিশ্বাস করতে পারে তবেই ওদের সম্পর্কে ও খোলা-খুলি জানতে পারে। একজন মেয়ে বন্ধু ওব যদি থাকত তাহলে তার সঙ্গে সব কথা আলোচনা করে ও হালকা হতে পাবতো। অবশ্য ম -ও তো ওর মনের কথা কোনদিন পরিষ্কারভাবে জানতে চায় নি।

খুব হাসিখুশি স্বভাবের ক্যাডি। আর কথা বলতে খুব ভাল-বাসে। নিজেকে একা মনে হয়েছে এমন দিন ওর জীবনে খুব কমই এসেছে। আব সেই একাকীত্ব বোধ একেবারেই ভিন্ন ধরনের। এ বিষযে অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ভেবেও নিজেকে বোঝানোর মতো কথা ও খুঁজে পেল না।

(ক্যাডি সুস্থ হয়ে ফিরে যাবার পর থেকে পরবর্তী অধ্যায় শুরু হচ্ছে)

ইহুদীদের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটল না। ১৯৪২ সালে এদের অনেকেরই ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। জুলাই মাসে শুরু হল ষোল বছরের ছেলে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া।

ভাগ্যক্রমে ক্যাডির বন্ধু মেরীকে ওরা যেন ভুলেই গিয়েছিল। পরে শুধু তরুণদেরই নয় সবাইকেই ভুগতে হয়েছে। পুরো শরৎ আর শীতকালটা জুড়ে ক্যাডিকে অনেক ভয়াবহ ঘটনা সহ্য করতে হয়েছে। দিনের পর দিন প্রতি সন্ধ্যায় রাস্তায় ট্রাকের শব্দ, দরজা বন্ধ করার আওয়াজ আর শিশুদের আর্তনাদ শুনতে পেত। প্রদীপের আলোর নীচে বসে মিঃ এবং মিসেস ভ্যান অ্যালটোন-হোভেন আর ক্যাডি পরস্পরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করত—ওদের সকলের চোখেই একই প্রশ্ন—আগামীকাল কে হারিয়ে যাবে?

ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় ক্যাডি ঠিক করল ওর বন্ধু মেরীর সঙ্গে দেখা করে ওকে একটু উৎসাহিত করে আসবে। সেই সন্ধ্যায় রাস্তায় অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী গণ্ডগোল ছিল। ক্যাডি হুপকেনদের বাড়ির কলিং বেল তিনবার বাজালে মেরী নীচে নেমে এসে প্রথমে সাবধানে জানলা দিয়ে দেখল। তারপর বাড়ির সবাই যেখানে কাজে বেরুবার পোষাক পরে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে তৈরী হয়ে নীরবে অপেক্ষা করছিল সেখানে ওকে নিয়ে গেল। সকলেই খুব মনমরা হয়ে বসে আছে। ক্যাডি ঘরে ঢুকল। কিন্তু কেউ ওর সঙ্গে কোন কথা বলল না। ওরা যেন মাসের পর মাস এমন ভাবে বসে আছে। এই ভয়ার্ত ম্লান মুখগুলোর দৃশ্য অত্যন্তই ভীতিজনক। দরজা বন্ধের শব্দ কানে এলেই বসে-থাকা মানুষগুলো আতঙ্কে কেঁপে উঠছিল।

দশটার সময় ক্যাডি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল। ও বুঝতে পারল এভাবে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। যেন অন্য এক জগতের বাসিন্দা ওরা…ওদের কোন কাজেই ক্যাডি লাগতে পারবে না। এদের মধ্যে যাকে তবু কিছুটা সতেজ মনে হচ্ছিল সে মেরী।

মেরী ক্যাডিকে দরজার কাছে পৌঁছে দিয়ে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ক্যাডি টর্চ হাতে বাড়ির দিকে এগোতে লাগল। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে এমন সময় শব্দটা

কানে আসতেই ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার ওই কোণ দিয়ে কয়েকটা পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনল ও। মনে হল এক রেজিমেণ্ট সৈন্যের পায়ের শব্দ। ক্যাডি অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেলেও খুব ভালই বুঝতে পারছিল কারা এগিয়ে আসছে আর এর অর্থই বা কি। কেউ যাতে ওকে দেখতে না পায় তারজন্য ক্যাডি টর্চটা নিভিয়ে একটা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। হঠাৎ একটা লোক হাতে পিস্তল বাগিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা ওর দিকে তাকাল। ঔদ্ধত্যের প্রকাশে ওর মুখটা ভয়াবহ। "এদিকে আয়"—বলে একটা পুরুষের হাত ক্যাডিকে টেনে নিয়ে চলল।

"আমি এক সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান পরিবারের মেয়ে স্যার।" সাহস করে এইটুকুই বলতে পারল ক্যাডি। ওর সারা হাত পা ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল···শুধু ভাবছিল এই বর্বরটা ওকে নিয়ে কি করতে চায়। ও জানত যে করেই হোক লোকটাকে ওর আইডেন্টিটি কার্ডটা দেখাবার চেষ্টা করতে হবে।

"সম্ভ্রান্ত মানে কি বলতে চাইছিস তুই ? আইডেন্টিটি কার্ডটা দেখা ?" ক্যাডি ওর ব্যাগ থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটা বার করল। "আস্ত গাধার দল"। কিছু বোঝার আগেই ক্যাডি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওর নিজের ভুলে ক্ষেপে গিয়ে জার্মানটা "সম্ভ্রান্ত" খৃষ্টান মেয়েটিকে একটি জবরদস্ত লাথি কষিয়েছে। সব ব্যথা বেদনা ভুলে ক্যাডি তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে ছুটল।

এই ঘটনার পর ক্যাডির একবারই মাত্র মেরীর ওখানে যাবার সুযোগ হয়েছিল। একদিন বিকেলে ও সব কাজ ফেলে রেখে ছুটি করে নিয়েছিল। হপকেন পরিবারের বাড়িটাতে ঢোকবার আগেই ও প্রায় নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিল যে মেরী আর ওখানে নেই। বাড়িটার দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে দেখল ওটা বাইরে থেকে সীল করা। ওর মধ্যে এক নিদারুণ হতাশা জেগে উঠল।

ভাবল, কে জানে, মেরী এখন কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে চলল। বাড়ি পৌঁছেই ও ছুটে গেল ওর ছোট্ট ঘরটায়। দরজা বন্ধ করে দিল। কোট পরা অবস্থায়ই বিছানায় মুখ গুঁজে একটানা মেরীর কথা ভেবে চলল।

ও যখন এখানে থাকতে পারে তখন মেরীকে কেন চলে যেতে হল। ও যখন সুখে থাকতে পারে তখন কেন মেরীর জীবনে এই দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এল? ওদের দুজনের মধ্যে তফাতটা কোথায়? ওরা দুজনে কি একই রকম নয়। কি অপরাধ করেছে মেরী? আর হঠাৎই যেন মেরীকে ও মনশ্চক্ষে দেখতে পেল, পরণে ছেঁড়া জামা কাপড়, আতঙ্কে পাণ্ডুর, একটা সেলে মেরী বন্দী হয়ে আছে। অত্যন্ত ম্রিয়মাণ বড় বড় দুটো চোখ। ক্যাডি আর সহ্য করতে পারল না। ও হাঁটু মুড়ে বসে অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার তালে তালে ওর দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ওর চোখের সামনে বার বার মেরীর অসহায় চোখ দুটো ভেসে উঠতে লাগল। কিন্তু ও জানে কোন সাহায্যই ও করতে পারবে না।

মেরী···আমাকে ক্ষমা করো···ফিরে এস মেরী।

ক্যাডি ওর চোখের সামনে যে দুর্বিসহ ঘটনাগুলো ঘটতে দেখেছে তার যুক্তি হিসেবে কি বলবে বা ভাববে তার কিছুই ও বুঝতে পারল না। দরজা বন্ধ হবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের কান্নার শব্দ ছাড়া কিছুই আর ওর কানে ঢুকছিল না। যে অস্ত্রধারী বর্বরটা ওকে কাদায় ফেলে দিয়েছিল তেমনি একদল লোককে ও দেখতে পেল আর তাদের মধ্যে সহায়হীনা মেরী একা।

অনুবাদ ॥ প্রকাশ চন্দ্র

ফ্রিৎস্ শুলৎজে

ফ্রিৎস্ শুলৎজের জন্ম ১৪ই এপ্রিল, ১৯০৩ সালে জার্মানীর লাইপজিগে। নিম্নমধ্যবিত্ত পিতা-মাতার চিন্তাধারার সঙ্কীর্ণতায় ক্ষুব্ধ ফ্রিৎস্ শুলৎজে ১৯২৫ সালে তাদের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, উদ্দেশ্য চিত্রকর হবেন। লাইপজিগ শহরের "সরকারী চারুকলা এবং পুস্তক-প্রস্তুতি আকাডেমীতে" শিক্ষা শুরু করেন, পরে ড্রেসডেন শহরের "চারুকলা আকাডেমীতে"। ফ্রিৎস্ শুলৎজে কম্যুনিস্ট ছাত্র-সংসদের অনুষ্ঠানগুলিতে যাতায়াত করতেন এবং সেখানে মার্কস-লেনিন-এর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৩০ সালে এই শিল্পী ড্রেসডেন-এর "জর্মন বিপ্লবী শিল্পী সংসদে" যোগ দেন, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি "কলাবিদ্যা হল অস্ত্র ও শিল্পী দেউলিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনতার স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক", এই মূলমন্ত্রে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে উৎসর্গ করেন।

রুডোলফ রেন্নার এবং মার্টিন হোওপ-এর মতো জর্মন কমুনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা শিল্পী-সংসদের অধিবেশনে বক্তৃতা করতেন, তাঁদের প্রভাবে ফ্রিৎস্ শুলৎজে ১৯৩০ সালে জর্মন কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং সেই সময় থেকে পার্টির একজন অনলস কর্মী হয়ে ওঠেন। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত তাঁর ধারাবাহিক গ্রাফিকের কাজ "জর্মন রাজত্বের অবস্থা" এবং "ক্যাপিটালিজম"-এ তিনি ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিষ্ট মনোভাবের বিরোধীতা করেন এবং সেই সব কাজ শত শত অধিবেশনে বিক্রি হয়েছে।

১৯৩৩-এর শুরুতে ফ্রিৎস্ শুলৎজে লাইপজিগ-এ যান। সেই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেফতার হবার পূর্বমুহূর্ত অবধি তিনি এবং তাঁর স্ত্রী লিনোকাট সৃষ্টি করে যান। সেই সবের বিক্রয়লব্ধ অর্থ অবৈধ জর্মন কম্যুনিস্ট পার্টির ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাসের শহীদদের সাহায্যের জন্য ব্যবহার করা হয়। ড্রেসডেন-এর বন্দীশালায় এবং হোনষ্টাইন-এর কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পেও তিনি তাঁর শিল্পী-সত্তার সুযোগ নেন এবং তাঁর প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছবি আঁকেন।

১৯৩৪ সালে মুক্তি পাবার পর ফ্রিৎস্ শুলৎজে হিটলারের শাসন অপসারণের জন্য জর্মন কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রামে আবার অংশ গ্রহণ করেন। ড্রেসডেন-এর কম্যুনিস্টদের নির্দেশে তিনি কয়েকবার চেকোস্লোভাকিয়াতে যান এবং প্রাগ শহরের জর্মন কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ব্রাসেলস-এর অধিবেশনের সময় এবং জর্মন কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিল

সংক্রান্ত খবর পান। হেয়ারব্যার্ট বোখোভ, আলব্যার্ট হেনসেল এবং কার্ল ষ্টাইন-এর সঙ্গে ফ্রিৎস্ শুলৎজে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং সাধারণ হিটলার বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন। তাঁরা ড্রেসডেন-এর বড় বড় অস্ত্র-কারখানার ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর আগে এবং পরে হিটলারের রাজত্বের বিরুদ্ধে গোপন প্রচারের ব্যবস্থায় সাহায্য করেন।

এই বছরে ফ্রিৎস্ শুলৎজে তাঁর সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টি করেন, যার মধ্যে স্পেন-এর শ্রমিক এবং কৃষকদের নিয়ে আঁকা কিছু ছবি এবং উডকাট-এর মধ্যে স্পেন-এর স্বাধীনতা সংগ্রামী জনগণের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা প্রকাশ পায়।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রিৎস্ শুলৎজেকে গ্রেফ্তার করা হয়। তাঁর বহুকালের বন্ধু এবং সহকর্মী হেয়ারব্যার্ট বোখোভ, আলব্যার্ট হেনসেল এবং কার্ল ষ্টাইন-এর সঙ্গে তিনি এক বছর পরে বিচারকদের সামনে এসে দাঁড়ান। বিচারকরা ওই চারজন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং তার ঠিক পরই বার্লিন-প্ল্যোৎসেনসে-তে সেই মৃত্যুদণ্ড সম্পাদন করায়। সেদিন ছিল ৫ই জুন, ১৯৪২।

এই বইটির প্রচ্ছদের ছবিটি ১৯৩৪ সালে এঁকেছিলেন ফ্রিৎস্ শুলৎজে। নাম 'প্রিজ্‌ন রাউণ্ড' বা 'গেফ্যেঙগ্‌নিস্‌রুণ্ডগাঙ'। এই ছবি, শুলৎজে-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর স্ত্রীকে লেখা শেষ চিঠিটি Museum fuer Deutsche Geschichte, DDR, Berlin-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জীবন একটাই

ফ্রিৎস্ শুলৎজে

বার্লিন-প্লোৎসেনসে
৪ঠা জুন, ১৯৪২

আমার প্রিয়, খুকু হ্বাক্,

নিজেকে সংযত কর, শক্ত হও। তুমি তো চিরকালই আমার প্রিয়, সাহসী জীবনসঙ্গিনী ছিলে। আমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য, এই কঠিন আঘাত সহ্য করবার জন্য, তুমি তোমার অন্তরের শক্তির পরিচয় দেবে। আগামী কাল, ৫ই জুন, ভোর পাঁচটা পাঁচ মিনিটে আমার মৃত্যুদণ্ড পালন করা হবে। আমার বন্ধুদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, মৃত্যু অবধারিত। খুকু হ্বাক্, এবার তোমাকে একা এগিয়ে যেতে হবে তোমার জীবনের পথে। একা যাবে কিন্তু সেই দায়িত্ব, দুজন শিল্পীর দায়িত্ব তোমাকে একা বহন করতে হবে। তোমাকে আমার উদ্দেশ্য পালন করতে হবে, তোমাকে শক্ত হতে হবে আর আমাদের শিল্পীর পথের শেষে পৌছতে হবে। ভাবতেও এত চমৎকার লাগছে, যে আমাদের মধ্যে অন্তত একজন আমাদের সামনের লক্ষ্যের কাছে পৌছতে পারবে। বর্তমানে আমি সম্পূর্ণ শান্ত এবং মনের দিক থেকে প্রফুল্ল। অনিশ্চয় অবস্থাটাই ছিল সব-সময়ে যন্ত্রণাদায়ক, স্পষ্ট নিষ্পত্তি কখনো আমাকে বিচলিত করেনি। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, যে তুমি হ্বাল্ডহাইম-এ*, অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছ, তোমাকে না-খেয়ে কাটাতে হচ্ছে না। এই সময়টা তুমি নিশ্চয় টিকে যাবে। তুমি তোমার শিল্প প্রতিভাকে আরো উন্নত করবে আর যখন তোমার স্বাধীনতা ফিরে পাবে তখন তোমার সমস্ত শক্তি আমাদের শিল্পের জন্য নিয়োগ করবে। হয়তো তুমি সেই বুড়ো গ্রাবিণ্ডার, যে বিচালী বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তার ছবি

* তাঁর স্ত্রী এফা শুলৎজে-ক্লাবে বন্দী ছিলেন হ্বাল্ডহাইম-এর জেলখানায়

নর্মান বেথুন

কানাডার সন্তান হয়েও বেথুন সেই কমিউনিস্টদের একজন যাকে বিশেষ কোন দেশের সীমারেখার বাঁধনে বন্দী করা যায় না। পৃথিবীর তামাম মানচিত্রে মানুষের জীবন সংগ্রাম যেখানেই তাঁকে দাবী করেছে, তাঁকে আমরা সেখানেই পেয়েছি। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, যে কোন ন্যায় সংগ্রামের অক্লান্ত নির্ভীক যোদ্ধা. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন থোরেসিক সার্জেন ও শল্য চিকিৎসক বেথুন গেছেন স্পেনে, উঠতি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এসেছেন চীনে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে। কম্যুনিস্ট আদর্শের উজ্জ্বল উদাহরণ নর্মান বেথুন চিকিৎসা ক্ষেত্রের বাইরেও কবি, চিত্রকর, সৈনিক এবং শিক্ষক হিসাবে সাক্ষর রেখে গেছেন। চীনা মানুষ ভেবে পেত না কোন্ নামে তাঁকে ডাকবে—

ডঃ বেথুন আমাদের শিক্ষক।
ডঃ বেথুন আমাদের সহযোদ্ধা।
ডঃ বেথুন আমাদের চিকিৎসক।
ডঃ বেথুন আমাদের বন্ধু।
ডঃ বেথুন আমাদের আদর্শ।
ডঃ বেথুন আমাদের কমরেড।

লালফৌজের চিকিৎসক হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণবলি দেন ডক্টর বেথুন। যুদ্ধক্ষেত্রে বেথুনের নিত্য সহচর তুং (যাঁকে বেথুন তাঁর দ্বিতীয় সত্তা বলে সম্বোধন করতেন), বেথুনের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন: 'আমাদের সকলেরই একটা জীবন, কিন্তু ওনার অনেক জীবন। সমগ্র চীনের মানুষের কান্নাও আমাদের সেই শোককে শান্ত করতে পারবে না।...'

পিকিঙের কাছে শি চা চুয়াঙ্-এ আজো সারা দুনিয়া থেকে মানুষ এসে নীরবে মাথা নত করে দাঁড়ায় তাঁর স্মৃতিসৌধে. গ্রানাইট পাথর দিয়ে ঢাকা কবরের সামনে। তাঁর পাশেই সেখানে শায়িত আছেন ভারতের সন্তান আরেকজন আন্তর্জাতিক মানুষ—ডক্টর কোট্‌নিস। নর্মান বেথুনের কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে যাবার পথে তিনি নিহত হন।

নর্মান বেথুনের অবিস্মরণীয় জীবনের স্মরণীয় জীবনী "দ্য স্ক্যাল্‌পেল দ্য সোর্ড" সম্প্রতি বাঙলায় 'মহাচীনের পথিক' নামে অনূদিত হয়েছে।

নর্মান বেথুন

মাথার ওপরে কেরোসিনের বাতিটা একটা উজ্জ্বল মৌচাকের মতো নাগাড়ে গুঞ্জন সৃষ্টি করছে। মাটির দেওয়াল। মাটির মেঝে। মাটির বিছানা। সাদা কাগজের জানলা। রক্ত আর ক্লোরোফর্মের গন্ধ। ঠাণ্ডা। ভোর তিনটে, ১লা ডিসেম্বর, উত্তর চীন, লিন চু'র কাছে অষ্টম রুট বাহিনীর সঙ্গে।

ক্ষত-সমেত মানুষ।

ক্ষতগুলো ক্ষুদ্র শুষ্ক পুষ্করিনীর মতো কালো-খয়েরি মাটি মাখামাখি। ক্ষতগুলোর কিনারা ছেঁড়াখোঁড়া, কালো পচের ঝিল্লিযুক্ত। পরিপাটি ক্ষত, তারই নীচে গভীরে লুকিয়ে রেখেছে পুঁজ, বাঁধ-বাঁধা নদীর মতো বৃহৎ সবল মাংসপেশী আর তার চারপাশ কুরে চলেছে, উষ্ণ স্রোতস্বিনীর মতো মাংসপেশী ঘিরে তার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত। ক্ষত, বাইরে ছড়িয়ে পড়ছে, পচনশীল অর্কিড বা দলিত কার্নেশন, রক্ত-মাংসের বীভৎস পুষ্প। ক্ষত, দলা দলা কালো রক্ত বমনকারী, অমঙ্গলসূচক গ্যাসের বুদবুদ মিশ্রিত, দ্বিতীয় দফার এখনো ক্ষান্তিহীন রক্তস্রাবের তাজা ঝলকের ওপর ভাসমান।

পুরনো নোংরা ব্যাণ্ডেজগুলো চামড়ার উপর রক্ত-আঠায় চিটিয়ে রয়েছে। সাবধান। আগে বরং ভিজিয়ে নাও। উরুর মাঝ দিয়ে। পা'টা তুলে ধরো। এ তো দেখা যাচ্ছে বিরাট একটা ঢলঢলে লাল মোজার মতো। কি ধরনের মোজা? বড়দিনের মোজা। সেই সবল সুন্দর হাড়ের ডাণ্ডাটা বর্তমানে কোথায়? ডজন খানেক টুকরোয় পরিণত। আঙুলে করে এগুলো কুড়িয়ে নাও, কুকুরের দাঁতের মতো সাদা, তীক্ষ্ণ ও এবড়ো-খেবড়ো। এবার স্পর্শ করে ছাখো। আর কিছু পড়ে রইল কি? হ্যাঁ, এই যে। সব কটা হ'ল? হ্যাঁ। না না। এইখানে আরেকটা টুকরো। এই মাংসপেশীটা কি

নিষ্প্রাণ? চিমটি কাটো ওখানে। হ্যাঁ, এটা নিষ্প্রাণ। কেটে বাদ দিয়ে দাও। এটা সারবে কি করে? এককালের অত শক্তিশালী আর বর্তমানের এই ছিন্নভিন্ন, এই ক্ষতিগ্রস্ত, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মাংসপেশীগুলো কি করে তাদের সগর্ব আকর্ষণশক্তি ফিরে পাবে? টেনে ধরা, আলগা দেওয়া। টেনে ধরা, আলগা দেওয়া। কি মজাই না ছিল! এখন আর তা হবার নয়। এখন তা বিনষ্ট। এখন আমরা শেষ হয়ে গেছি। এখন আমরা নিজেদের নিয়ে কি করবো?

পরের জন। একেবারে শিশু যে! সতেরো! পেটে গুলিবিদ্ধ। ক্লোরোফর্ম। তৈরি? পেরিটোনিয়ালের উন্মুক্ত গহ্বর থেকে বেগে গ্যাস বেরোচ্ছে। পায়খানার গন্ধ। প্রসারিত অন্ত্রের গোলাপী নাড়ি। চারটে ছিদ্র। ওগুলো বুজিয়ে দাও। ফিতের বাঁধন পাকিয়ে নাও। বস্তিদেশ স্পঞ্জ ক'রে দাও। নল। তিনটে নল। বন্ধ করা কঠিন। ওকে গরম রাখো। কি ভাবে? ওই ইঁটগুলো গরম জলে ডুবিয়ে দাও।

পচ হচ্ছে অলক্ষ্যে বিস্তারশীল এক চতুর ব্যক্তি। এই লোকটা কি জীবিত? হ্যাঁ, বেঁচে আছে। কারিগরী অর্থে এখনো জীবিত। নাড়ির মধ্যে দিয়ে ওকে নুন-জল দাও। ওর দেহের অসংখ্য ক্ষুদ্র কোষগুলো হয়তো খেয়াল করতে পারবে। হয়তো স্মরণে আসবে উষ্ণ লবণাক্ত সমুদ্রের কথা, পিতৃপুরুষের বাড়ির কথা, প্রথম খাদ্যগ্রহণের কথা। নিযুত বছরের স্মৃতি সমৃদ্ধ কোষগুলো হয়তো স্মরণ করবে অন্যান্য জোয়ার ভাঁটার কথা, অন্যান্য সমুদ্রের আর সমুদ্র ও সূর্য হতে প্রাণের জন্মলাভের কথা। ফলে ওরা হয়তো ওদের ক্লান্ত ক্ষুদ্র মাথা উঁচু করবে, প্রাণ-ভরে পান করবে, জীবন ফিরে পাবার জন্যে আবার জুড়ে দেবে সংগ্রাম। এরকম একটা ফল পাওয়া যেতেও পারে।

আর এই একজন। ওকি আর কখনো ফসল তোলার সময় ওর বলদটার পাশে পাশে ছুটবে, আনন্দে খুশীতে চেঁচাতে চেঁচাতে? না,

ও আর কোনদিন দৌড়বে না। এক পায়ে দৌড়ানো যায় নাকি? ও কি করবে? কেন, বসে বসে অন্য বাচ্চাদের দৌড় দেখবে। তুমি আমি যা ভাববো, ও-ও তাই ভাববে। করুণা ক'রে কি লাভ? ওকে করুণা ক'রো না। করুণা ওর আত্মোৎসর্গকে ছোট করবে। চীনকে রক্ষা করতে চেয়েই ও এই কাজ করেছে। ওকে কোলে তুলে নিয়ে সাহায্য করো। আরে, এ তো শিশুর মতো হালকা। হ্যাঁ, তোমার শিশু, আমার শিশু।

মানব দেহ কি অপূর্ব, এর অঙ্গগুলো কি নিখুঁত, কি নির্ভুল এর গতিবিধি, কি বাধ্য, গর্বিত ও সবল। আর কি ভয়ানক যখন ক্ষত-বিক্ষত। জীবনের ক্ষুদ্র শিখাটি ম্লান থেকে ম্লানতর হয়, তারপর দপ ক'রে জ্বলে উঠে নিবে যায়। নিবে যায় যেমন মোমবাতি নিবে যায়। শান্তিতে সুস্থিরে। ফুরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সে তার প্রতিবাদ জানায়, তারপর আত্মসমর্পণ। যা বলার ব'লে নেয়, তারপর নীরব।

আরো আছে? চারজন জাপানী বন্দী। ওদের ভেতরে নিয়ে এসো। এখানে এই যন্ত্রণার সমাজে কেউ কারুর শত্রু নয়। রক্ত-মাখা পরিচ্ছদটা কেটে ফেল। ওই রক্তস্রাবটা বন্ধ করো। অন্যদের পাশে ওদের শুইয়ে দাও। আরে, এদের যে ঠিক ভাইয়ের মতো দেখাচ্ছে। এই সৈন্যরা কি পেশাদার নরঘাতক? না, এরা অপেশাদার সৈন্য। হাতগুলো মেহনতী মানুষের। এরা সৈন্যের সাজে শ্রমিক।

আর নেই। সকাল ছ'টা। সত্যি, কী ঠাণ্ডা এই ঘরটা! দরজাটা খুলে দাও। ওই দূরে গাঢ়-নীল পাহাড়টার ওপরে, পুবের দিকে একটা ম্লান আবছা আলোর রেখা দেখা দিচ্ছে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য উঠবে। শয্যাগ্রহণ ও ঘুম।

কিন্তু ঘুম আসবে না। এই নিষ্ঠুরতার, এই বোকামির কারণ কি? জাপান থেকে নিযুত মেহনতী মানুষ এলো নিযুত চীনা মেহনতী মানুষকে হত্যা বা ক্ষত বিক্ষত করতে। জাপানী শ্রমিকরা কেন

আক্রমণ করবে তাদেরই শ্রমিক ভাইদের, যারা স্রেফ বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষা ক'রে চলেছে? চীনাদের মৃত্যুর ফলে জাপানী মেহনতী মানুষেরা কি লাভবান হবে? না, লাভবান হওয়া আদৌ সম্ভব নাকি? তাহলে ঈশ্বরের দোহাই, বলো না কার লাভ হবে? এই খুনে অভিযানে জাপানী শ্রমিকদের পাঠানোর জন্যে কে দায়ী? এর থেকে কার লাভ? কি করে জাপানী শ্রমিকদের রাজী করাতে পারলো চীনা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে—ওদেরই দরিদ্র ভাই, ওদেরই দুঃস্থ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে?

এটা কি সম্ভব যে অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তি, এক সংখ্যালঘু শ্রেণীর জনা কয়েক এক নিযুত দরিদ্র মানুষ রাজী করিয়েছে আরেক নিযুত মানুষের ওপর আক্রমণ চালনায়, তাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে? যাতে ধনীরা আরো ধনবান হতে পারে?

ভয়ঙ্কর চিন্তা! ওরা কি করে এই দরিদ্র মানুষদের চীনে আসতে রাজী করাল? সত্যি কথাটা জানিয়ে দিয়ে? না, সত্যটা জানলে এরা কখনোই আসতো না। ওদের কি সে সাহস ছিল যে এই মেহনতী মানুষদের বলে, ধনীরা কেবল সস্তা কাঁচামাল, আরো বড় বাজার, আরো বেশী মুনাফাই চায়? না, ওরা এদের বলেছে যে পাশবিক যুদ্ধটা "জাতির অদৃষ্টে" আছে, এই লড়াই "সম্রাটের গৌরবের" জন্য, এই লড়াই "রাষ্ট্রের সম্মানে", এই লড়াই তাদের "রাজা ও রাজ্যের" জন্য।

মিথ্যা! নারকীয় মিথ্যা!

যত অন্যায় আগ্রাসী যুদ্ধের—যেমন এই যুদ্ধটার হোতাদেরও খুঁজে বার করা উচিত। খুঁজে বার করা উচিত তাদেরই মধ্যে থেকে যাদের এই অপরাধের মাধ্যমে লাভবান হবার সুযোগ রয়েছে। যেমন খুঁজে বার করা হয় হত্যা ইত্যাদি অন্যান্য অপরাধের হোতাদের। জাপানের আট নিযুত মেহনতী মানুষ, গরীব চাষী, কারখানার বেকার শ্রমিক—এরা কি লাভবান হবে? আগ্রাসী যুদ্ধের তামাম

ইতিহাসে, স্পেনের মেক্সিকো বিজয় থেকে ইংলণ্ডের ভারত দখল, ইটালীর ইথিয়োপিয়া ধর্ষণ—কোথাও কি দেখা গেছে যে এইসব "বিজয়ী" রাজ্যের শ্রমিকেরা লাভবান হয়েছে? না, এ ধরনের যুদ্ধে এরা কথনো লাভবান হয় না।

নিজেদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদই কি জাপানের মেহনতী মানুষের ভোগে লাগছে? ভোগে লাগছে কি সোনা, রূপো, লোহা, কয়লা, তেল? বহুপূর্বেই এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ওদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন এর মালিক ধনীরা, শাসক শ্রেণী। আর যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ওই খনিগুলো চালায় তারা চরম দারিদ্র্যে দিন কাটায়। কাজেই চীনের সোনা, রূপো, লোহা, কয়লা আর তেলের সশস্ত্র লুণ্ঠন বাবদ ওরা কি ক'রে লাভবান হবে? এক দেশের ধনী মালিকেরা নিজেরা মুনাফা লুটবে বলেই না অন্য দেশের সম্পদ করায়ত্ব করতে চাইছে? এরা কি চিরকালই তাই করেনি?

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জাপানের যুদ্ধবাজ আর পুঁজিপতিরাই সেই একমাত্র শ্রেণী যারা এই গণহত্যার, এই আইন-সিদ্ধ উন্মাদনার দরুণ লাভবান হতে পারে। ওই ধর্ম অনুমোদিত নরহত্যা, ওই শাসক শ্রেণী, আদত রাষ্ট্রই আজ আসামীর কাঠগড়ায়।

তাহলে কি আগ্রাসী যুদ্ধ, উপনিবেশ বিজয়ের যুদ্ধ, এ-সবই কেবল জাঁদরেল ব্যবসা? হ্যাঁ, তাই মনে হবার কথা। মিথ্যেই জাতীয় অপরাধের এই সব উদ্যোক্তারা চেষ্টা করছে গালভরা নানা অন্তঃসারশূন্যতার আর আদর্শের নিশানের পিছনে তাদের আসল উদ্দেশ্য গোপন করার। ওরা যুদ্ধ করে মানুষ মেরে বাজার দখল করতে, কাঁচামালের জন্যে করে ধর্ষণ। ওদের কাছে বিনিময়ের চেয়ে চুরিটাই সহজ, কেনার চেয়ে সহজ খুন করা। এই হল যে কোন যুদ্ধের গোপন রহস্য। ব্যবসা। মুনাফা। মুনাফা। রক্ত-মুদ্রা।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে সেই ব্যবসার আর রক্তের ভয়ঙ্কর নির্দয় দেবতা যার নাম মুনাফা। চির ক্ষুধার্ত শিশু-রক্তপিপাসু দেবতার

মতোই অর্থ চায় সুদ, চায় প্রতিদান। এবং এই লালসা মেটাবার জন্যে সে করবে না হেন কাজ নেই, লক্ষ লক্ষ নরহত্যা পর্যন্ত। সৈন্যবাহিনীর পিছনে থাকে যুদ্ধবাজরা। পিছনে লগ্নী পুঁজি আর পুঁজিপতিরা। রক্তসূত্রে ভাই, অপরাধের সূত্রে সাথী।

মানব জাতির এই শত্রুদের চেহারাটা কি রকম? ওরা কি কপালের ওপর কোন চিহ্ন রাখে যাতে দেখেই চেনা যায়,এড়িয়ে চলা যায় আর অপরাধী বলে অভিযুক্ত করা যায়? না। উলটে ওরাই হচ্ছে সম্মানিত জন। ওদের শ্রদ্ধা করা হয়। নিজেদের ওরা ভদ্রলোক বলে থাকে এবং অন্যেরাও ওদের ওই নামেই ডাকে। শব্দটার কি হাস্যকর প্রয়োগ। ভদ্রলোক! এরাই রাষ্ট্রের খুঁটি, ধর্মের খুঁটি, সমাজের খুঁটি। এরা এদের বাড়তি ধনসম্পদ থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দয়া-দাক্ষিণ্য চালায়। প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ সাহায্য করে। এরা এদের ব্যক্তিগত জীবনে দয়ালু ও বিবেচক। এরা আইন মানে, নিজেদের আইন, সম্পত্তির আইন। কিন্তু একটা চিহ্ন আছে যা দেখে এই ভদ্র বন্দুকধারীদের চেনা যায়। ওদের আর্থিক লাভের বহর কমিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাও অমনি ওদের মধ্যকার পশুটা একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে জেগে উঠবে, ওরা বর্বরদের মতো নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়াবে, পাগলদের মতো পাশবিক, ঘাতকদের মতো অনুতাপশূন্য। মানব জাতিকে যদি অগ্রসর হতে হয় তবে এই এদের মতো লোকগুলোকে বিলোপ করা দরকার। এরা যতদিন বাঁচবে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি আসবে না। মানব সমাজের যে-যে প্রতিষ্ঠান এদের বাঁচবার অনুমতি দেয় সেগুলোকে অবশ্যই লোপ করতে হবে।

এই লোকগুলোই ক্ষত সৃষ্টি করে

অনুবাদ ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ

জাক্ দেক্যুর

জাক্ দেক্যুর ছিলেন মার্কসবাদী, ফ্রান্সে তখন নাৎসী জার্মানির তাণ্ডবলীলা চলেছে, সে সময় যে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম চালিয়েছিলেন দেক্যুর তাঁদের অন্যতম। এ সময় ছিল বিশ্বাসঘাতক পেতাঁ সরকারের রাজত্ব। যে সব সংবাদপত্র প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়ে ফরাসী জনসাধারণকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল, গুপ্তভাবে প্রকাশিত Lettres Francaises (লেতর ফ্রঁসেস) তাদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী। জাক্ দেক্যুর, জঁা পোলহাঁ ও ক্লোদ মর্গা এই তিন জন এই বিপ্লবী সংবাদপত্রটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

এক শীতের সন্ধ্যায় মর্গা ও দেক্যুর একটি কাফেতে মিলিত হবেন বলে ঠিক হয়েছিল। আগে থেকেই গেস্টাপোর চক্রান্তের কথা জানতে পেরে মর্গা সেখানে আসেননি কিন্তু দেক্যুর পার পেলেন না। অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করেও তিনি কমরেডদের নাম শত্রুর কাছে উচ্চারণ করেন নি, তিনি প্রায় নিপাত্তা হয়ে গেলেন—তাঁর জেলে যাবার খবরও কমরেডরা পায় না। এর পর তাঁর অন্তিম চিঠিখানি তাঁর পরিবারের হাতে আসে।

দেক্যুর সম্বন্ধে জঁা পোলহাঁ লিখেছেন—"পেতাঁ সরকার মারফত যুদ্ধ বিরতির তিনমাস পর একদিন দেখি দেক্যুর বাইসাইকেল চেপে যাচ্ছে। আমাকে দেখে সাইকেল থামিয়ে বললো—যাকগে যাক, ফ্রান্স তার বিশ্বাস-ঘাতকতার ঠিক পুরস্কারই পেয়েছে, পেতাঁ এসেছে, কী এসে যায় তাতে ? লজ্জার পর আর একটি লজ্জা। এই তো !

"দেখতে ও ছিল খুব লম্বা আর ছিপছিপে, বেশ বিস্তৃত মুখ গহ্বরে কদাচিৎ হাসি ফুটত, শান্ত চাহনি কিন্তু সমস্ত মুখখানি কী দীপ্তিময়। ওকে দেখলে যে কোন মানুষেরই মনে হতে পারত—

" 'ও তো দ্বিধা করবার মানুষ নয়·· ···' "

ঝরা পাতা

জাক্‌ দেক্যুর

শনিবার, ৩০শে মে, ১৯৪২,
৬টা ৪৫ মিঃ

প্রিয় মা ও বাবা,

বেশ কিছুদিন ধরেই তোমরা আমার চিঠির প্রতীক্ষায় রয়েছো। এ চিঠিটা পাবে বলে আশা করনি। আমিও ভেবেছি এই যন্ত্রণাটা তোমাদের নাই বা দিলাম। সব সময় মনে রেখো তোমাদের আর আমার দেশের উপযুক্ত সন্তানই ছিলাম—শেষ পর্যন্ত আমাদের ভালবাসা অটুট থেকেছে।

দেখ, যুদ্ধেও তো আমার মৃত্যু হতে পারতো, এমন কি গত রাতের বোমাবর্ষণেও শেষ হয়ে যেতে পারতাম। তাই ত যে-মৃত্যুর একটা তাৎপর্য রয়েছে সে মৃত্যুর জন্য কোন ক্ষোভ নেই। তোমরা জান আমি কোন অপরাধ করিনি। আমার জন্য লজ্জা পাবার তোমাদের কিছু নেই, একজন ফরাসী হিসাবে আমি আমার কর্তব্য করেছি। আমার মৃত্যুকে ভয়ানক একটা দুর্ঘটনা বলেও ভাবি না। মনে রেখো ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর নানান দেশের হাজার হাজার সৈনিক সেই একই হাওয়ার আবর্তে প্রতিদিন জীবন হারাচ্ছে।

জানো, গত দুমাস ধরেই আজ সকালে যে ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে তা আশা করছি। তাই ত এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সময় পেয়েছি। কিন্তু যেহেতু আমি অধার্মিক, তাই মৃত্যু নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে ঠিক গাছ থেকে ঝরা পাতার মত মনে করি, জমে জমে পাতার মতো শিকড়ে সার দেবে। কেমন সার হবে তা নির্ভর করবে পাতার ওপর, আমি ফ্রান্সের যুবশক্তির কথা ভাবি—তাদের ওপরেই তো আশা ভরসা।

আমার সোনা মা ও বাবা,—বোধহয় আমাকে স্যুরেনে কবর

দেবে, ইচ্ছে হলে জিজ্ঞেস করতে পার মোমার্তর কবরখানায় আমাকে সরান সম্ভব কিনা।

এই দুঃখ দেবার জন্য আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। তোমরা আমার জন্য চিন্তা করছো গত তিন মাস এটাই আমাকে পীড়িত করেছে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার সব থেকে অস্থির লাগছে এই ভেবে যে, তোমাদের পুত্রহারা করে যাচ্ছি। আনন্দের বদলে তোমাদের যন্ত্রণাই বেশি দিয়েছি। সব কিছু সত্ত্বেও দেখ যে জীবন আমি যাপন করেছি, তাতেই খুশি—বড় মনোরম এ জীবন। সামান্য কয়েকটি অনুরোধ রয়েছে, যে মেয়েটিকে ভালবাসি তাকে একটি কথা বলে পাঠিয়েছি, যদি তার সঙ্গে দেখা হয়, মনে হয় শিগ্‌গিরই তা সম্ভব হবে, তাকে তোমাদের ভালবাসা জানিও। এটা আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, আরও ইচ্ছে হচ্ছে তোমরা ওর বাবা-মার ওপর একটু নজর রেখো। ওদের একটু সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁদের বলবে যে, এভাবে ওদের ছেড়ে যেতে আমারও বেশ খারাপ লাগছে। তবে এটা ভেবেই সান্ত্বনা যে আমার জায়গাটি তোমরা নেবে—তাদের একান্ত শুভার্থী হবে।

আমার ঘরে তাঁদের মেয়ের যা যা জিনিস রয়েছে, সে সব দিয়ে দিও। প্লেইয়াদের ভলিউম, ফঁতেনের উপকথা, ত্রিস্তান, চারটি ঋতু, দুটি জলরঙের ছবি, চার নম্বর পান্ডে দ্যু রোয় সরাইখানার মেনুকার্ড। যখন মুক্ত ছিলাম তখন কত ভাল খাবার সবাই মিলে একসঙ্গে খেয়েছি—এই শেষের দিনগুলিতে সে সব কত কথা মনে পড়ছিল। পরিবারের সবাই জোট বেঁধে সে সব একসঙ্গে খাবে কিন্তু দোহাই দুঃখ করবে না এ নিয়ে। যে সব সুখের দিন আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি হয়ত আরও কাটাতে পারতাম শুধু সেগুলির স্মৃতি নেড়ে চেড়ে তোমরা দিন কাটাবে, এ আমি মোটেই চাইনা। গত দুমাস একান্ত নির্জনে যখন দিন কাটাতে হয়েছে তখন কিছু পড়াশুনোও বারণ ছিল। সে সব দিনে, যখন যেখানে বেড়িয়েছি, মনে মনে সে সব

দিনের স্মৃতিচারণ করেছি। যে সব অভিজ্ঞতা সে সময় কুড়িয়েছি আর যা যা খেয়েছি, সব কিছু হুবহু ভেবেছি, একটা উপন্যাসের খসড়াও করে ফেলেছিলাম, তোমাদের কথা মন থেকে কোন মতেই সরাতে পারি না। আশা করছি দরকার হলে তোমরাও যথেষ্ট মনোবল ও সাহস দেখাবে। কোন তিক্ততাই পোষণ করবেনা।

বোনেদের আমার প্রাণভরা ভালবাসা জানিও। অক্লান্ত পরিশ্রমী আমার একান্ত অনুগত ডেনিস, আর মিশেল ও জে ডেনিসের সুন্দরী মা-টিকেও ভালবাসা জানিও।

১৭ই সিলভ্যাঁর সঙ্গে জব্বর একটা ভোজ খাওয়া হলো সে কথা ভাবতে কী যে আনন্দ হয়। আরও আনন্দ পাই নববর্ষের আগের রাতে পিয়ের ও রেনের সঙ্গে যে ভোজ খেয়েছিলাম সে কথা মনে পড়লে। খাবার কথায় দেখ কত গুরুত্ব দিচ্ছি। সিলভ্যাঁ আর পিয়েরকে আর সেই সঙ্গে সব থেকে প্রিয় বন্ধু জঁাকেও আমার অনেক অনেক ভালবাসা জানিও, ওর সঙ্গে কত যে মধুর মুহূর্ত কাটিয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ জানিও।

১৭ই সন্ধ্যায় ওর বাড়ি গেলেও আমায় এখানে আসতেই হতো। তাই দুঃখ করবার কিছু নেই।

চিঠির শেষে ব্রিজিতের জন্য ছোট একটা চিঠি জুড়ে দিচ্ছি। সেটা ওকে নকল করে দিও। ভগবান জানেন ওর কথা আমি কত ভেবেছি। প্রায় দু বছর সে তার বাবাকেও দেখতে পায়নি।

সুযোগ পেলে চাকরিতে আমার বদলে যে এসেছে তাকে বলবে সিনিয়রদের বলতে যে আমি এগমণ্টের শেষ দৃশ্যটির কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে ভাবি।*

* গোয়েটের নাটকের শেষ দৃশ্যে স্প্যানিশ ডিউক আলবার আজ্ঞায় বেলজিয়ান কাউন্ট এগমণ্টের শিরশ্ছেদ করা হয়। অভিযোগ, একটি তদন্তের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান চালিয়ে ছিলেন। তাকে হত্যা করার আগের রাত্রিতে এগমণ্ট যেন হুবহু চোখের সামনে দেখলেন যে তাঁর মৃত্যু নেদারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে। তাঁকে যেন বিজেতা হিসাবে শিরোমাল্য, মুকুট অর্পণ করা হচ্ছে।

আপিসে আমার সমস্ত সহকর্মী আর যে-বন্ধুটির জন্য যথেষ্ট নিষ্ঠা নিয়ে গোয়েটে অনুবাদ করছি, তাদের সকলকে আমার শুভকামনা জানিও।

এখন ঠিক আটটা। প্রায় খাবার সময় হ'ল। খাওয়া শেষ করেছি, কফিও। সব কিছুর প্রতি ঠিকঠাক নজর দিয়েছি।

আমার আদরের মা ও বাবা প্রাণভরে তোমাদের শেষ চুম্বন জানাচ্ছি। আমি তো তোমাদের একেবারে কাছেই রয়েছি। তোমাদের কথা ত কখনই ভুলতে পারি না।

তোমাদের
ড্যানিয়াল।

অনুবাদ ও পরিচিতি ॥ ছবি বসু

সাক্কো এবং ভানজেত্তি

মুসোলিনি ও তার স্যাঙাতেরা যখন এক ফ্যাসিস্ট ইতালী তৈরি করছেন, দু'জন আমেরিকাবাসী ইতালিয়ান তখন সাত বছর ধরে ম্যাসাচুসেটস-এর এক জেলে বন্দী জীবনযাপন করছেন। অথচ মুসোলিনীর আদর্শের ঠিক বিপরীতটাই এঁদের আদর্শ। ১৯২৭-এর ২৩শে আগস্ট ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে তাঁদের হত্যা করার আগেই তাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং সেই খ্যাতি সম্মান ও শ্রদ্ধা তাঁরা অবশ্যই ভোগ করে যাবেন যতদিন না স্বয়ং মানবসমাজকে ইলেকট্রোকিউট করা হবে। নিকোলা সাক্কো (১৮৯১-১৯২৭) ও বার্তোলোমিও ভানজেত্তি (১৮৮৮-১৯২৭), উভয়ের জন্ম ইতালীতে। ১৯০৮ সালে তাঁরা স্বতন্ত্র ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ম্যাসাচুসেট্স্-এর মিল্‌ফোর্ড এ একটি জুতোর কারখানায় দক্ষ কর্মী হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেন সাক্কো। ভানজেত্তি নানা রকম কায়িক কাজ করে জীবনধারণ করার পর শেষে মাছ ফেরি করা শুরু করেন প্লাইমাউথে। তারপর দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর সখ্য। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ক্যানন্-ফডার সৈন্য হবার কোনো ইচ্ছা না থাকায় তাঁরা ১৯১৭ ১৮ সাল কাটান মেক্সিকোয়।

১৯২০-এর ১৫ই এপ্রিল ম্যাসাচুসেট্স্-এর সাউথ পেনট্রিতে একটি জুতোর কারখানার কোষাধ্যক্ষ ও রক্ষীকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা ১৬০০ ডলার নিয়ে পালায়। সাক্কো ও ভানজেত্তি এই হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হন এবং তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা যে শুধু সৈন্যদলে নাম না-লিখিয়ে অপরাধ করেছিলেন তাই নয়, তাঁদের অপরাধ, তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং তারো চেয়ে বড় কথা, তাঁরা ছিলেন সাম্যবাদী, শ্রমিক শ্রেণীর লাল রাজনীতির প্রবক্তা।

বিচার নামে একটা প্রহসনের চেয়েও হাস্যকর অনুষ্ঠান এরপর মঞ্চস্থ হয় ডেড্‌হ্যাম-এর বিচারালয়ে। সেই বিচার-নাট্যের সর্বাধিপতি ছিলেন ওয়েব্‌স্টার থেয়ার। গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে ন্যায়বিচারের নামে নিপীড়কদের শ্রেণীস্বার্থ হাসিল করার কাজে যে কয়েকজন বিচারক পক্ষপাতদুষ্টতার ও অমানুষিক বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে হয়ত কুখ্যাততম হচ্ছেন বিচারক নামধারী ঘাতক ওয়েব্‌স্টার থেয়ার। সরকারী পক্ষের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অপরাধ প্রমাণ করার চেয়ে বেশী আগ্রহ দেখান সাক্কো ও ভানজেত্তির ব্যক্তি চরিত্রে, তাঁদের যুদ্ধে যোগ না-দেওয়া ও তাঁদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের

মতামতের ওপর। কিন্তু তারো চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ওই ডাকাতি ও নরহত্যার জন্য সত্যি যে দায়ী, সেই ব্যক্তি কিন্তু ইতিমধ্যেই তার স্বীকারোক্তি পেশ করেছিল এবং পেশ করেছিল সাক্কো ও ভানজেত্তির অতুলনীয় চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই। তার নাম সেলেস্তিনো ম্যাদাইরোস। তবু দু'সপ্তাহ ব্যাপী 'বিচারে'র পর সাক্কো ও ভানজেত্তি অপরাধী প্রমাণিত হলেন এবং সাত বছর ধরে 'আইনের যুদ্ধ' চালিয়ে 'গণতন্ত্র' তাঁদের 'ইলেকট্রোকিউট' করে খতম্ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন ১৯২৭-এর ১৯শে এপ্রিল। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করার পর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র সেদিন সাক্কো ও ভানজেত্তিকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিল এবং এইটাই এই গণতন্ত্রের সত্যিকার রূপ—হত্যা করার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে তখন সে বাক্-স্বাধীনতা দিতে কার্পণ্য করে না।

দীর্ঘ সাত বছর কারাবাসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন সাক্কো ও ভানজেত্তি। এই সময় তাঁদের লেখা চিঠি সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল, 'গণতন্ত্র'-এর ধিক্কারে শেয়াল কুকুর ও বাঘেরা ছাড়া আর সকলেই কানে আঙুল দিতে বাধ্য হয়েছিল। কারাগারে প্রেরিত হবার পর ভাল করে ইংরেজি না-জানার জন্য নিজেদের ব্যক্ত করতে তাঁরা অসুবিধায় পড়েন এবং তখন তাঁরা, বিশেষ করে ভানজেত্তি অসীম উৎসাহে শুরু করে দেন ইংরাজী-চর্চা। পরবর্তীকালে ভানজেত্তির কিছু উক্তি বিশ্বসাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছে। ভাবলে রোমাঞ্চিত হতে হয় যে, বিচারককে লেখা ভানজেত্তির একটি চিঠি, যেখানে তিনি সাক্কোর চরিত্র বর্ণনা করেছেন, সেটি পরবর্তীকালে অনেক কাব্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পুত্র ও কন্যাকে লেখা সাক্কোর দুটি চিঠি এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। চিঠি লেখার সময় সাক্কোর পুত্র দান্তের বয়স ছিল চোদ্দ আর কন্যা ইনেস্-এর তখনো সাত বছর পূর্ণ হয়নি। এই চিঠি দুটি ছাড়াও, মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষিত হবার প্রাক্কালে, ১৯২৭-এর এপ্রিল আদালতে সাক্কো ও ভানজেত্তির অন্তিম বিবৃতির অনুবাদ সংকলিত হল।

এই সময় বোস্টন শহরে 'এথেনীয়াম' নামে একটি ক্লাবে সেকালের সব মান্যগণ্যদের ও হোমরাচোমরাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। যেমন বিচারক থেয়ার, ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ইত্যাদির— এঁরাই মৃত্যুদণ্ড নির্মাণ ও ঘোষণা

করেছিলেন। এই ক্লাবে কোন বিদেশী, ইহুদী বা নিগ্রো কখনো প্রবেশাধিকার পায়নি। ১৯২৭-এর ২৩শে আগস্ট, সাক্কো ও ভানজেত্তি নিহত হবার পরের দিন সকালে দেখা গেল এই ক্লাবের পড়বার ঘরের প্রত্যেকটি পত্রিকার মধ্যে একটি করে চিরকুট গোঁজা রয়েছে। প্রত্যেকটি চিরকুটে একই কথা লেখা ছিল : 'আজ, নিকোলা সাক্কো ও বার্তোলোমিও ভানজেত্তি, যাঁরা মানব ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাঁরা আশা করেছিলেন আমেরিকায় সেই মানব ভ্রাতৃত্বের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে, তাঁদের নিষ্ঠুরতম মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এমন সব মানুষের সন্তানরা, যাঁরা বহুদিন পূর্বে এই আশার আর স্বাধীনতার দেশে পালিয়ে এসেছিলেন।'

হাওয়ার্ড ফাস্টের 'দা প্যাশন্ অফ সাক্কো অ্যাণ্ড ভানজেত্তি' বইটি সাক্কো ও ভানজেত্তির জীবনের এবং আদর্শগত সংগ্রামের এক অনবদ্য সাহিত্যিক দলিল।

আর আমাকেও একটু ভালবেসো

নিকোলা সাকো

আমার প্রিয়তম পুত্র ও সঙ্গী,

শেষ যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে সেদিন থেকেই আমি এই চিঠিটা লেখবার কথা ভেবেছি। কিন্তু এতদিনের অনশন ধর্মঘটের জন্য এবং ঠিক মতো নিজের কথা হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না— এই চিন্তার জন্য চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি।

সেদিন অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করেই তোমার কথা, তোমাকে চিঠি লেখার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম, আমার সে ক্ষমতা নেই, এক নাগাড়ে লিখে শেষ করতে পারব না। সে যাইহোক, আবার আমাদের মৃত্যু-পুরীতে নিয়ে যাবার আগে এটা আমি যে ভাবেই হ'ক লিখে ফেলতে চাই, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আদালত নতুন মামলা দায়ের করার আবেদন নাকোচ করা মাত্রই আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং শুক্রবার থেকে সোমবারের মধ্যে, কোন অঘটন না ঘটলে, ওরা আমাদের ঠিক মধ্যরাতের পর, ২৩শে আগস্ট ইলেক্ট্রোকিউট করে মারবে। কাজেই, এখন আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, ভালবাসা আর খোলা মন নিয়ে, যেমন ছিলাম আগে।

সেদিন আমি যে অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করেছি তার কারণ আমার মধ্যে তখন আর জীবনের লক্ষণ ছিল না। কারণ আজকের মতই সেদিনও আমি অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে যে প্রতিবাদ জানিয়েছি তা মৃত্যুর জন্য নয়, জীবনের জন্যই।

বাপি, তুমি কাঁদলে চলবে না, তোমাকে শক্ত হতে হবে, যাতে মাকে তুমি সান্ত্বনা দিতে পার। তোমার মা যদি কখনো মুষড়ে পড়ত তখন আমি যা-যা করতাম বলে দিচ্ছি। নিরালা গ্রামাঞ্চলে লম্বা একটা পথ পায়ে হেঁটে বেড়াবে, এখানে সেখানে বুনো ফুল

কুড়োবে, বিশ্রাম নেবে গাছের ছায়ায়, নদীর স্বচ্ছ জলধারা আর প্রকৃতিমাতার শান্ত স্নিগ্ধতার ঐকতানের মধ্যে। আমি নিশ্চিত যে তোমার মায়ের খুব ভাল লাগবে এবং তুমিও খুশী হয়ে উঠবে। কিন্তু দান্তে, একথা সবসময় মনে রেখো যে যারা দুর্বল, সাহায্য প্রার্থনা করছে, তাদের সাহায্য করা উচিত। যাঁরা অভিযুক্ত হয়েছেন, যাঁরা শিকার হয়েছেন, তাঁদের সাহায্য ক'রো কারণ তারাই তোমার সত্যিকার ভাল বন্ধু। তাঁরাই তোমার কমরেড, কারণ তাঁরাই লড়াই করেছেন এবং পরাজিত হয়েছেন, যেমন গতকাল লড়াই করেছিল তোমার বাবা ও বার্তোলো মুক্তির আনন্দ জয় করার জন্য ও দরিদ্র শ্রমিকদের জন্য এবং পরাজিতও হয়েছে। জীবনের এই সংগ্রামের মধ্যে তুমি অনেক ভালবাসা পাবে, তোমাকে অনেকে ভালবাসবে।

মৃত্যুপুরীতে আমি যখন শুয়েছিলাম তোমাদের কথা বারবার মনে পড়ত। এই যে দেওয়ালের পিছনে আমাদের তিন জনের আত্মাকে কবর দেওয়া হয়েছে, তার সুপ্ত যন্ত্রণা থেকে মাত্র এক পা এগোলেই তো সেই গান-গাওয়া শোনা যাবে, খেলার মাঠ থেকে ভেসে আসবে শিশুদের মিষ্টি কলকাকলি—যেখানে আছে শুধু জীবন আর মুক্তির আনন্দ। বার বার আমার মনে পড়ে তোমায় আর তোমার বোন ইনেস্‌কে। সবসময় তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি যে এই মৃত্যুপুরীতে আসনি তাতে আমি খুশীই হয়েছি। কারণ এখানে এলে এক ভয়ঙ্কর ছবি দেখতে হত তোমাকে, তিনজন যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে কিভাবে ইলেকট্রোকিউটেড হবার দিন গুনছে। তোমার তরুণ বয়সে এর কি প্রভাব পড়ত জানি না। কিন্তু আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে যদি তুমি এত সংবেদনশীল না হতে, তাহলে ভবিষ্যতে এই ভয়ঙ্কর স্মৃতি হয়তো তোমার খুবই কাজে লাগত। এই নিষ্ঠুর নিপীড়ন আর অন্যায় মৃত্যু কিভাবে দেশের গায়ে কলঙ্ক লেপন করেছে সেকথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে পারবে। হ্যাঁ, দান্তে, ওরা আমাদের দেহগুলোকে আজ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে, এবং করবেও তাই, কিন্তু

আমাদের মতাদর্শকে ওরা ধ্বংস করতে পারবে না, ভবিষ্যতের তরুণদের জন্য তা অটুট থাকবে।

দান্তে, তোমায় আবার বলি এই বিষণ্ণ দিনগুলোয় তোমার মা ও প্রিয়জনদের ভালবেসো, তাদের খুব কাছে কাছে থেক। আমি খুব ভাল করে জানি যে তোমার সাহস ও সদয় ভালবাসার জন্য ওদের অস্বস্তি অনেক লাঘব হবে। আর তুমি আমাকেও একটু ভালবাসতে ভুলে যাবেনা নিশ্চয়—ও বাপি, বাপি—আমি যে তোমার কথা কী ভাবি, সব সময় ভাবি!

আমার বুকভরা শুভাশিষ রইল সব প্রিয়জনদের জন্য, ভালবাসা আর চুমু রইল তোমার ছোট্ট ইনেস্ আর মায়ের জন্য। প্রাণভরা স্নেহের আলিঙ্গন নিও—

তোমার বাপি

পুনশ্চ: বার্তোলো তোমায় তার ভালবাসা জানাচ্ছে। আশা করি তোমার মা তোমাকে এই চিঠিটার মানে বুঝতে সাহায্য করবে কারণ আমি এর চেয়ে অনেক ভাল করে ও সহজ করে লিখতে পারতাম, কিন্তু আমি বড় দুর্বল।

প্রিয় ইনেস সোনা,

আমি চাই, আমি এখন তোমাকে যে-কথাগুলো বলতে যাচ্ছি সেগুলো তুমি যাতে বুঝতে পার। ঠিক অতটাই সহজ করে লিখতে চাই আমি কারণ তুমি যাতে তোমার বাবার আগ্রহের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাও তার জন্য আমি ব্যাকুল। আমি যে তোমায় ভীষণ ভালবাসি, তুমি যে আমার ছোট্ট সোনামণি।

এইটুকু বয়সে তোমাকে সব কথা বোঝানো খুবই শক্ত কিন্তু তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো যাতে তুমি বুঝতে পারো যে তোমার বাবার বুকের কতখানি তুমি জুড়ে আছ। সেটা যদি বোঝাতে নাও পারি, আমি জানি, এই চিঠিটা তুমি তুলে রেখে দেবে এবং ভবিষ্যতে

আবার পড়বে আর তখন সেই ভালবাসায় বুক-কাঁপা দেখতে ও অনুভব করতে পারবে ঠিক যেমনটা হচ্ছে এখন তোমার বাবার এই চিঠিটা লেখবার সময়।

আমি যে তোমার সঙ্গে, তোমার দাদা দান্তের সঙ্গে ও তোমার মায়ের সঙ্গে একটা ছবির মতো ছোট্ট খামার বাড়িতে বাস করতে পেরেছি সেইটাই আমার সংগ্রামী জীবনের সবচেয়ে মিষ্টি ও সবচেয়ে বড় সঞ্চয়। তোমার মুখ থেকে কত মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনেছি কত কোমল আদর পেয়েছি। তারপর গ্রীষ্মকালে ওক্ গাছের ছায়ার নীচে কুটীরে কেমন বসে থাকতাম তোমার সঙ্গে—তখন তোমায় জীবনের শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলাম, কি করে পড়তে হয় কিভাবে লেখে। দেখতাম তুমি ছুটে বেড়াচ্ছ, হাসছ, কাঁদছ আর গান গেয়ে এখান থেকে ওখান, এগাছ থেকে ওগাছ, হলদে সবুজ মাঠ ঘুরে ঘুরে বুনো ফুল কুড়োচ্ছ। স্বচ্ছ উজ্জ্বল নদীর জল থেকে উঠেই মায়ের আলিঙ্গনে ধরা পড়ছ।

আমি জানি তুমি খুব ভাল মেয়ে এবং নিশ্চয় তুমি তোমার মা দান্তে ও সব প্রিয়জনকেই ভালবাসো। আমি এও জানি যে তুমি আমাকেও একটুখানি নিশ্চয় ভালবাসো কারণ আমি যে তোমায় খুব ভালবাসি, অনেক অনেকখানি। তুমি তো জানো না ইনেস্, প্রতিদিন কতবার যে তোমার কথা মনে পড়ে। তুমি আমার বুকের মধ্যে আছ, চোখের মধ্যে আছ, এই বিষণ্ণ দেওয়াল ঘেরা কুঠরীটার আনাচে কানাচে, আকাশে এবং যেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ে তুমি সেখানেই আছ।

সব বন্ধু আর কমরেডদের আমার শুভাশিষ দিও আর আমাদের প্রিয়জনদের হু'বার করে দিও। তোমার দাদা আর মায়ের জন্য ভালবাসা আর চুমু রইল।

তোমার জন্য সবচেয়ে ভালবাসা ভরা চুমু আর মুখে প্রকাশ করা যায়না এমন আদর রইল এমন একজনের কাছ থেকে যে

তোমাকে এতো ভালবাসে যে সারাক্ষণই তোমার কথা ভাবে। তোমাদের সবার জন্যে বার্তেলো অভিনন্দন জানাচ্ছে।

তোমার বাপি

শেষ বিবৃতি : ১৯শে এপ্রিল ১৯২৭

সাক্কো ও ভানজেত্তি

নিকোলা সাক্কো :

হ্যাঁ মহাশয়। আমি বক্তা নই। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে আমি তেমন পরিচিত নই। আমি জানি আমার বন্ধু আমাকে বলেছে, আমার কমরেড ভানজেত্তি সব কথা বিস্তৃতভাবে বলবে, তাই আমি ওকেই সুযোগ দিতে চাই।

এই আদালতের মতো নিষ্ঠুর কোন কিছুর কথা জীবনে আমি কোনদিন জানতে পারিনি, কখনো শুনিনি, কোন ইতিহাসেও পড়িনি। সাত বছর ধরে নিগৃহীত করার পরও ওরা এখনো আমাদের অপরাধী সাব্যস্ত করছে। আর যারা ভদ্রলোক তারা আজ এই আদালতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমি জানি আদালতের রায় হবে দুই শ্রেণীর সংঘাত, নিপীড়িত শ্রেণী বনাম ধনিক শ্রেণী। আমরা জনসাধারণের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করি বইয়ের মাধ্যমে, সাহিত্যের মাধ্যমে। আপনারা জনসাধারণকে নিগৃহীত করেন, জবরদস্তি চালান ও তাদের হত্যা করেন। আমরা সবসময়েই জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করি। আপনারা চেষ্টা করেন যাতে আমাদের সঙ্গে অন্য দেশের নাগরিকদের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয় পরস্পরকে যাতে তারা ঘৃণা করে। সেইজন্যেই নিপীড়িত শ্রেণীর একজন বলেই আমি আজ রয়েছি অভিযুক্তর আসনে। আপনিই সেই নিপীড়ক।

একথা আপনার অজানা নয় বিচারক—আপনি আমার সমস্ত

জীবনের কথা জানেন, জানেন কেন আমি আজ এখানে রয়েছি এবং সাত বছর ধরে আমাকে ও আমার অসহায় স্ত্রীকে অত্যাচার করার পরও আজ আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছেন। আমি আপনাকে আমার পুরো জীবনের কথা বলতে পারতাম কিন্তু কি লাভ হবে? আমি আগে যা বলেছি তা সবই আপনি জানেন এবং আমার বন্ধু—মানে আমার কমরেডই সেকথা সব বলবে কারণ ওর ভাষার জ্ঞানটা ভাল। আমি ওকে সেই সুযোগ দিচ্ছি। আমার কমরেড, শিশুদের প্রতি তার মনভরা ভালবাসা। আপনি সেই অসংখ্য দেশবাসীর কথা ভুলে গেছেন যাঁরা সাত বছর ধরে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের জন্য যাঁরা উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদের শক্তি আর দয়া। আপনি তাঁদের তোয়াক্কা করেন না। জনসাধারণ, কমরেড আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন অগণিত সংখ্যক বুদ্ধিজীবী যাঁরা এই সাত বছর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু তবু এই আদালত খুশী মাফিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি এখন ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে, জনসাধারণকে ও আমার কমরেডদের যাঁরা সাত বছর ধরে আমাদের পাশে আছেন, এই সাক্কো-ভানজেত্তি মামলার সঙ্গে। এবার আমি আমার বন্ধু ভানজেত্তিকে বলতে বলছি।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমার কমরেড মনে করিয়ে দিয়েছেন। আগেও বলেছি, বিচারক আমার পুরো জীবনের কথা জানেন, তিনি জানেন আমি কোনদিন অপরাধী ছিলাম না, কোনদিন না, অতীতে নয় বর্তমানে নয়, কখনোই নয়।

বার্তোলোমিও ভানজেত্তি :

হ্যাঁ, আমি এই কথাটাই বলতে চাই যে আমি নিরপরাধ। শুধু নিরপরাধই নয়, সারা জীবনে আমি কখনো চুরি করিনি, কাউকে হত্যা করিনি, কখনো রক্তপাত ঘটাইনি। এই কথাটাই আমি বলতে

চাই। এবং এইটাই সব নয়। আমি যে শুধু এই দুটি অপরাধের জন্য অপরাধী ন'ই তাই নয়, আমি যে জীবনে কখনো চুরি করিনি, খুন করিনি, রক্তপাত ঘটাইনি তাই নয়—বরং আমি সারাজীবন, যেদিন থেকে যুক্তি মাফিক ভাবতে শিখেছি, সেদিন থেকেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি যাতে পৃথিবী থেকে অপরাধ দূর করা যায়।

যাঁরা আমার এই হাত দুটোকে চেনেন, তাঁরা খুব ভাল ভাবেই জানেন যে অর্থের প্রয়োজনে আমায় রাস্তায় নেমে একজন লোককে খুন করার কোন দরকার পড়তে পারে না। আমি আমার এই হাত দুটো নিয়েই বাঁচতে পারি, এবং বেশ ভালভাবেই পারি। তাছাড়া, নিজের হাতে কাজ না-করেও আমি বেঁচে থাকতে পারি, কারণ আমার পাশে আছেন অজস্র মানুষ। স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার অনেক সুযোগই আমি পেয়েছি, সেই তথাকথিত উচ্চজীবন যাপন করার সুযোগ। ইচ্ছে করলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি-রোজগার আমি না-ও করতে পারতাম।

এবার আমি বলি, আমি যে শুধু সত্যিকার কোন অপরাধই করিনি তাই নয় (কয়েকটা পাপ হয়তো করেছি কিন্তু অপরাধ নয়), শুধু যে সারাজীবন পৃথিবীকে অপরাধ মুক্ত করার চেষ্টা করেছি তাই নয়—সরকারী আইন ও নৈতিকতা অনুযায়ী যা-যা অপরাধ সে তো আছেই, তাছাড়াও সরকারী আইন ও নৈতিকতা যে-সব অপরাধকে পরিশুদ্ধ করে—অর্থাৎ মানুষের হাতে মানুষের শোষণ ও নিপীড়নকে—আমি সেই অপরাধের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছি। কেন আমি আজ অপরাধী হিসাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, কেন আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনি আমায় শেষ করে দিতে পারেন তার সত্যিই যদি কোন কারণ থাকে তবে এইটাই সেই কারণ এবং এছাড়া আর কিছুই নয়।

মাপ করবেন, যিনি এই আদালতে প্রবেশ করছেন, তাঁর চেয়ে খাঁটি মানুষ আমার জীবনে আর আমি দেখিনি। আমি ইউজিন

ডেব্‌স্‌-এর কথা বলছি। যত দিন যাবে ততই ওনার নাম ছড়িয়ে পড়বে, ততই উনি জনসাধারণের আরো নিকটতর ও প্রিয়তম হয়ে উঠবেন, ওনার ঠাঁই হবে মানুষের হৃদয়ে। আত্মোৎসর্গ ও ভাল কাজ যতদিন প্রশংসিত হবে ততদিন ওনার মহিমা বৃদ্ধি কেউ রুখতে পারবে না।

আদালত, কারাগার ও জুরিদের সম্বন্ধে ওনার বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। যেহেতু উনি পৃথিবীটার একটু ভাল করতে চেয়েছিলেন সেইজন্যেই সেই বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স অবধি তাঁকে নিগ্রীহিত হতে হয়েছে, কুৎসা রটানো হয়েছে তাঁর নামে। এবং বাস্তবিকই কারাগার তাঁকে হত্যা করেছে। উনি জানেন আমরা নিরপরাধ। শুধু উনি কেন, বিশ্বের যে-কোন বোঝদার মানুষই সেকথা জানেন। শুধু এদেশেই নয়, অন্য দেশের মানুষও আমাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন—ইউরোপের মানবতার পুষ্পরাজি, নামকরা লেখক, ইউরোপের যত শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। বিজ্ঞানীরা, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদরা আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। বিদেশী রাষ্ট্রের জনসাধারণ আমাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন।

একি কখনো সম্ভব যে জুরীদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন, দুই বা তিন জন, যারা পার্থিব সম্মান ও জাগতিক সম্পদের জন্য নিজেদের মায়েদেরও দণ্ড দিতে পারে, এই রকম ক'জন লোকই ঠিক করছে আর বাকী সবাই, সমস্ত জগৎ ভুল করছে, একি কখনো সম্ভব? সমস্ত জগৎ বলছে এটা অন্যায়, আমি বলছি এটা অন্যায়। এটা ন্যায় কি অন্যায়, সেটা সত্যি যদি কেউ জানে তো জানি আমি আর জানেন এই ভদ্রলোক (বিচারক)। আপনি জানেন সাত বছর হয়ে গেছে আমরা কারাগারে রয়েছি। এই সাত বছরে আমরা যে কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা কোন মানুষের পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয় কিন্তু তবু, হে বিচারক, আপনি তো আমাকে দেখতে পাচ্ছেন,

এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, একটুও কাঁপছিনা, দেখতে পাচ্ছেন তো আমি আপনার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছি, কোন লজ্জা নেই, এতটুকু রঙ বদলাচ্ছে না মুখের, একটুও অনুশোচনা নেই, ভয়ও নেই।

ইউজেন ডেব্‌স্‌ বলেছেন যে, কমনওয়েলথ আমাদের বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ খাড়া করেছে তা দিয়ে একটা মুরগীছানা হত্যার দায়ে কোন কুকুরকেও বোধহয় অভিযুক্ত করতে পারত না আমেরিকার এই জুরীরা।

আমরা প্রমাণ করেছি যে এই পৃথিবীতে এমন একজন বিচারককে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে আমাদের প্রতি আপনার চেয়েও বেশী পক্ষপাতদুষ্ট বা নিষ্ঠুর। আমরা সেকথা প্রমাণ করে দিয়েছি। তবু আমাদের নতুন করে বিচার করতে অস্বীকার করা হয়েছে। আমরা জানি এবং মনে মনে আপনিও জানেন যে প্রথম থেকেই আপনি আমাদের বিরুদ্ধে, আমাদের চোখে দেখার আগের থেকেই আপনি জানতেন যে আমরা র‍্যাডিক্যাল, জানতেন যে আমরা নীচু তলার মানুষ।···

এমন একটা সময়ে আমাদের বিচার হয়েছে, যে সময়টা ইতি-মধ্যেই ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। আমি একথাই বলতে চাইছি যে এই সময়টায় আমাদের মতাদর্শের মানুষের বিরুদ্ধে, বিদেশীদের বিরুদ্ধে সারা দেশ এক বিক্ষোভ আর ঘৃণার হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত। আমার ধারণা—ধারণা না বলে নিশ্চিত বিশ্বাস বলাই ভাল যে আপনি এবং ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আমাদের বিরুদ্ধে জুরীদের আরো বিষিয়ে দেবার জন্য উত্তেজিত করতে বা আমাদের বিরুদ্ধে তাঁরা যাতে আরো পক্ষপাতিত্ব করেন তার জন্য আপনারা আপনাদের ক্ষমতা মতো চেষ্টার কোন কসুর করেননি।

জুরীরা আমাদের ঘৃণা করেছেন কারণ আমরা ছিলাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে। জুরীরা জানেন না যে, যুদ্ধকে অন্যায় মনে করে বলে, ও

কোন দেশকে ঘৃণা করে না ব'লে যে মানুষটা যুদ্ধের বিরোধিতা করে, সে আর গুপ্তচর এক নয়। একজন গুপ্তচর যুদ্ধের বিরোধিতা করে কারণ সে একটি দেশের বাসিন্দা হয়েও আক্রমণকারী দেশের পক্ষ নেয়। আমরা সে ধরনের মানুষ নই। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি জানেন যে আমরা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছি কারণ যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই যুদ্ধ চালানো হচ্ছে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করতাম যে এই যুদ্ধ ভ্রান্ত, এবং দশ বছর পার হবার পর সেই বিশ্বাস আরোই সুদৃঢ় হয়েছে কারণ এখন এক একটা দিন পার হচ্ছে আর আমরা আরো ভালভাবে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা—যুদ্ধের প্রভাব ও তার ফলাফলের ব্যাপারটা। আমরা এখন আগের চেয়েও আরো বেশী করে বিশ্বাস করি যে যুদ্ধটা ছিল অন্যায়। আমায় ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াতে হলেও আমি খুব খুশী হব যদি মানবসভ্যতার উদ্দেশে একথা বলার সুযোগ পাই যে : 'সতর্ক হয়ে দেখুন! মানবসভ্যতা নামক পুষ্পের সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছেন আপনারা। কিন্তু কি জন্যে? ওরা আপনাদের যা কিছু বলেছে, ওরা আপনাদের যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—সেটা পুরোটাই মিথ্যা, একটা বিভ্রান্তি, একটা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, একটা অপরাধ। ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মুক্তির। কোথায় মুক্তি? ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সমৃদ্ধির? কোথায় সমৃদ্ধি? ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল উন্নতির। কোথায় উন্নতি?'

যেদিন আমি চার্লসটাউন কারাগারে ঢুকি, সেদিন থেকে আজকের মধ্যে চার্লসটাউন কারাগারের বন্দী সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। কোথায় সেই নৈতিক সততা যা যুদ্ধ এনেছে পৃথিবীতে? যুদ্ধ থেকে যে আত্মিক উন্নতি আমরা অর্জন করলাম সেসব কোথায় গেল? কোথায় সেই অতি প্রয়োজনীয় জীবনের নিরাপত্তা? কোথায় গেল জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা? কোথায় গেল মানব চরিত্রের সততা আর সৎ প্রবৃত্তিগুলির প্রতি সমাদর আর শ্রদ্ধা? যুদ্ধের

আগে এই এখনকার মতো এত অপরাধ, এত দুর্নীতি, এত স্খলন কখনো দেখা যায়নি।...

সে যাইহোক, আমি আগেই বলেছি, আমি যে শুধু এই দুটো অপরাধের জন্য অপরাধী নই তা নয়, আমি জীবনে কোন অপরাধ করিনি—চুরি করিনি, হত্যা করিনি, রক্তপাত ঘটাইনি এবং অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। লড়াই করেছি এবং নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি সেইসব অপরাধকেও দূর করবার জন্য যা আইন এবং গীর্জার চোখে বৈধ ও নিষ্পাপ।

আমি এই কথাই বলি যে, একটা কুকুর, একটা সাপ বা জগতের সবচেয়ে নীচ ও হতভাগ্য কোন প্রাণীকেও যেন বিনা অপরাধে অপরাধী হয়ে আমার মতো যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আসলে যে-কারণে আমি যন্ত্রণা পেয়েছি তাব জন্য সত্যই আমি দোষী। কারণ আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি একজন র‍্যাডিক্যাল বলেই এবং সত্যিই তো আমি একজন র‍্যাডিক্যাল। আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি একজন ইতালিয়ান বলে, এবং সত্যিই তো আমি একজন ইতালিয়ান। আমার যন্ত্রণা পাবার জন্য আমি যতটা না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী আমার বিশ্বাস কিন্তু আমার বিশ্বাস যে অভ্রান্ত সে বিষয়ে আমি এতই নিশ্চিত যে আপনি যদি আমায় দু'বার হত্যা করতে পারতেন আর আমি যদি দু'বারই পুনর্জন্ম পেতাম তাহলে প্রাণ পেয়ে আমি আবার সেই কাজই করতাম যা আমি ইতিপূর্বে করেছি।

নিজের কথা অনেক বললাম, কিন্তু সাক্কোর কথাই বলা হয়নি। সাক্কোও একজন শ্রমিক, ছেলেবেলা থেকেই শ্রমিক, একজন দক্ষ কারিগর, কাজকে সে ভালবাসত, ভাল কাজ করত, ভাল মাইনে পেত, ব্যাঙ্কে কিছু সঞ্চয় ছিল। তার স্ত্রী যেমন ভাল তেমনি সুন্দরী, দুটি অপূর্ব সন্তান আছে আর ছোট্ট একটা বাড়ি, বনের ধারে ছোট্ট একটা নদীর প্রান্তে। সাক্কো মানেই একটা হৃদয়, একটা বিশ্বাস,

একটা চরিত্র, একটা মানুষ, প্রকৃতি ও মানব প্রেমিক। সাক্কো এমন একটা মানুষ যে সবকিছু দিয়ে দিয়েছে, সব উৎসর্গ করে দিয়েছে মুক্তির উদ্দেশে এবং মানবসমাজের প্রতি তার ভালবাসার জন্য—অর্থ, বিশ্রাম, পার্থিব আকাঙ্ক্ষা, তার স্ত্রী, তার সন্তান, নিজেকে এবং নিজের জীবনকেও সে ত্যাগ করেছে। সাক্কো কখনো চুরি করা বা হত্যা করার স্বপ্নও দেখেনি। ও এবং আমি সেই শৈশব থেকে শুরু করে আজ অবধি কখনো এমন এক টুকরো রুটি অবধি কিনিনি যা আমাদের কপালের ঘামের বিনিময়ে অর্জিত নয়। এ ঘটনা কখনোই ঘটেনি।

হ্যাঁ, আমি হয়তো সাক্কোর চেয়ে ভালভাবে বক্তৃতা দিতে পারি কিন্তু বার বার, অসংখ্য বার, ওর প্রাণভরা কণ্ঠে যখন সুমহান বিশ্বাস ধ্বনিত হতে শুনেছি, যখন ওর চরম আত্মত্যাগের কথা চিন্তা করি, যখন মনে পড়ে যায় ওর বীরত্বের কথা, নিজেকে আমার ক্ষুদ্র মনে হয়—ওর মহত্বের পাশে নিতান্তই ক্ষুদ্র। আমি তখন বাধ্য হই আমার চোখ থেকে অশ্রুকে সরিয়ে দেবার জন্য লড়াই চালাতে। এই যে মানুষটাকে চোর, হত্যাকারী বলা হয়েছে, যাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, তার সামনে যাতে কেঁদে না ফেলি তার জন্য আমার কণ্ঠাগত হৃদয়ের ব্যাকুল স্পন্দনকে প্রশমিত করতে হয়।

সাক্কোর নাম কিন্তু মানুষের হৃদয়ে, মানুষের কৃতজ্ঞতার মধ্যেই বেঁচে থাকবে চিরকাল আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ও তোমাদের হাড়-গুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সময়, তখন তোমাদের নাম, তোমাদের কানুন, প্রতিষ্ঠান ও তোমাদের অলীক দেবতা শুধু অতীত যুগের আবছা এক স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে। যে-যুগে মানুষ মানুষের প্রতি নেকড়ের মতো ব্যবহার করত…

আমার যা বলার বলা হয়ে গেছে। ধন্যবাদ।

অনুবাদ ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ

সরদার ভগৎ সিং

ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করার প্রচেষ্টাকে এখন মুখ্যত দু'টি শিবিরে ভাগ করা হয়—সন্ত্রাসবাদী শিবির ও অহিংস নামধারী আবেদন-নিবেদন-আপোসপন্থী শিবির। দ্বিতীয় শিবির সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই, সাম্রাজ্যবাদের উত্তরসূরী হিসাবে তারা এখন বৃটিশের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করছে। প্রথমোক্ত শিবির সম্বন্ধে একথা অবশ্যই বলবার আছে যে ভারতের অগ্নিযুগের বীরদের নিছক 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চালাবার অপপ্রচেষ্টা যারা করে তারা সাম্রাজ্যবাদের মুখের কথাই উদ্ধৃত করে। মনে রাখা দরকার ১৯১৮-এর রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা সেকালের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। ব্রিটিশের কারাগারে ও ফাঁসির মঞ্চেই ভারতের প্রথম কমিউনিস্টদের আত্মপ্রকাশ। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমস্যাকে যাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সমস্যার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন তাঁদেব সেদিন দু'টি ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শেষ অস্ত্ররূপ দেশজ সন্তানদের বিরুদ্ধে। ভগৎ সিং-এর জীবন সংগ্রাম ও মৃত্যুই এই উক্তির সেরা সমর্থক।

সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় ভগৎ সিং-এর পরিবারের নাম চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। ভগৎ সিং-এর পিতামহ সেই বিখ্যাত সরদার অর্জুন সিং যিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কারাগারে। অর্জুন সিং-এর তিন পুত্র কিষণ সিং, অজিত সিং ও স্বর্ণ সিং রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রাজশক্তির বিরুদ্ধে। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলার বংগা গ্রামে, ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সরদার ভগৎ সিং-এর যেদিন জন্ম হয়, সেদিন তাঁর পিতা বা দুই কাকার কেউই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। অজিত সিং তখন পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে চার হাজার মাইল দূরে বর্মার রাজধানী মান্দালয়ে কারারুদ্ধ। ভগৎ সিং-এর পিতা কিষাণ সিং ও অপর কাকা স্বর্ণ সিং রয়েছেন লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে। তাঁরা জমি বাজেয়াপ্ত বিল-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। ভগৎ সিং-এর জন্মের এক বছর পর স্বর্ণ সিং ব্রিটিশ কারাগারে প্রাণ হারান।

বংগা গ্রামের প্রাইমারী বিদ্যালয় থেকে পাশ করবার পর ভগৎ সিং লাহোরে

আসেন। প্রথমে খালসা স্কুল ও সেখান থেকে ডি. এ. বি. স্কুলে আসেন। এফ্. এ পাশ করে ভগৎ সিং ভর্তি হলেন লাজপত রায় স্থাপিত জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে। এখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন শুকদেব। জাতীয় নাট্য-সংস্থার সভ্য হিসাবে জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে তিনি সুবক্তা ও সু-অভিনেতারূপে চিহ্নিত হন। যথা সময়ে এফ্. এ পাশ করেন ভগৎ সিং। ইতিমধ্যে অনেক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সুযোগে ভারতব্যাপী এক সশস্ত্র গণ আন্দোলনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং-এর জন্য। ১৯১৫-এর ফেব্রুয়ারিতে বারোজন গদর বিপ্লবীর ফাঁসি হয়েছে। (কৃপাল সিং অবশ্য লণ্ডনে পালিয়েও রক্ষা পায়নি। ১৯৪৯-এ লণ্ডনের রাজপথে তার দেহটাকে বুলেট জর্জরিত করে লুটিয়ে দিয়েছিল কোন এক অজানা দেশপ্রেমিক।) বুড়ী বালামের তীরে সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়েছেন চিত্তপ্রিয়, বাঘা যতীন প্রমুখ। এদিকে বিপ্লবীদের মরণপণ লড়াই চলছে, ওদিকে ভারতের কংগ্রেসের আবেদনপন্থীরা প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে সহায়তা করছে ইংরাজদের। ইংরাজ প্রভু তাদের আশ্বাস দিয়েছে 'স্বরাজ' দেবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই কালে গান্ধীর সত্যাগ্রহী ভূমিকা আদতে ইংরাজ তোষণ ভিন্ন কিছুই নয়। যুদ্ধ একদিন শেষ হল কিন্তু ধোঁয়াটে স্বরাজ-টুকুও দিল না ইংরাজ। তারা দিল মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার, দিল "রাওলাট বিল", অর্থাৎ সে-যুগের মিসা, বিনা বিচারে আটক রাখার বিধান। আবার শুরু হল আন্দোলন আর গান্ধীর সত্যাগ্রহ। এর পরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা – জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড: ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯। গান্ধীর ইংরাজ প্রভুকে বিশ্বাস ও বিপ্লববাদের বিরোধিতার জন্য চরম মূল্য দিল পাঞ্জাব। যে অমৃতসরে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস অধিবেশন বসেছিল, সেখানেই প্রতিশ্রুত স্বরাজের বদলে ইংরাজরা জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে ভারতের মানুষের জন্য উপহার দিল সাড়ে ষোলশ রাউণ্ড গুলি। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বহু পুরস্কৃত হলেও যথার্থ প্রাপ্য পেয়েছিলেন ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ। সেদিন ইংল্যাণ্ডের ক্যাক্সটন হলে উধম্ সিং-এর গুলি ডায়ারের হৃৎপিণ্ড চিনে নিতে ভুল করেনি)।

রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাই ভগৎ সিং-এর ভবিষ্যত নির্ধারিত করে দেয়। এফ্. এ পাশ করার পর বিবাহ প্রস্তাব নাকোচ করে গৃহত্যাগ করলেন তিনি ১৯২৩-এর

শেষার্ধে। এলেন দিল্লীতে। দিল্লীতে তিনি বলবন্ত সিং ছদ্মনামে 'অর্জুন' দৈনিক পত্রের সংবাদদাতার কাজ গ্রহণ করেন। তারপর দিল্লী থেকে আসেন কানপুরে এবং গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'দৈনিক প্রতাপ' এর সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন। কানপুরে বাস কালেই বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ও দিনে-কুলি-রাতে-বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গণেশশঙ্করের জন্যই ভগৎ সিং কানপুরের রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের মুখ্য অধ্যাপকের পদটি লাভ করেন। মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে তিনি বাড়ি যান তারপর আবার ফেরার। এবার তিনি এলেন লাহোরে, উঠলেন সতীর্থ শুকদেবের বাড়ি। ১৯২৪ সালের নভেম্বরে ভগৎ সিং তাঁর সহযোগীদের নিয়ে স্থাপন করলেন নওজোয়ান ভারত সভা। রক্তের অক্ষরে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে সভার সদস্যরা শুরু করলেন প্রচার অভিযান। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে তাঁরা ইংরাজ অত্যাচারের কাহিনী, পরাধীন দেশবাসীর কথা বর্ণনা করতেন আর মুক্তির জন্য জাগিয়ে তুলতেন অদম্য বাসনা। এরপর সারা পাঞ্জাবে গড়ে উঠতে শুরু করে নওজোয়ান ভারত সভার বিভিন্ন শাখা। লায়ালপুরে নওজোয়ান ভারত সভায় অধিবেশনে ভাষণের জন্য ভগৎ সিং নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে মুক্তি পাবার পর বহিষ্কৃত হন পাঞ্জাব থেকে। পাঞ্জাব থেকে কানপুর, কানপুর থেকে বেলগাঁও। ১৯২৬ এর ১৫ই মার্চ 'প্রতাপ'-এ তিনি বব্বর অকালী আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে ছদ্মনামে 'হোলির দিন রক্তের দাগ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি অমৃতসর থেকে 'আকালী' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে লাহোরের রামলীলা উৎসবের সময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করে ইংরাজরা এবং অকারণে ভগৎ সিংকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় এক বছর কারাভোগের পর তিনি মুক্তি পান এবং লাহোরে এক দুধের দোকান খোলেন। অর্থাৎ, বিপ্লবীদের যোগাযোগ কেন্দ্র। এই সময়কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কাকোরী ট্রেন লুট (১৯২৫) ও চারজন বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিস্মিল, রাজেন লাহিড়ী, আসফাকুউল্লা খাঁ ও ঠাকুর রোশন্ সিং-এর ফাঁসি (১৯২৭)। পাঞ্জাবের শহনশাহ চক্-এ আত্ম-গোপনকারী ভগৎ সিং নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। মার্ক্সবাদের• তত্ত্ব ও রুশবিপ্লবের ইতিহাস অনুধাবন করে তিনি নতুন চেতনায় নতুন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এবার নওজোয়ান ভারতসভার পরিবর্তে গঠিত

হয় 'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। গুপ্তাবাস ত্যাগ করে উত্তর-প্রদেশ, কানপুর, বেনারস. আগ্রা প্রভৃতি ভ্রমণ করে ঝাঁসিতে আসেন ভগৎ সিং। ঝাঁসিতেই বসে বিপ্লবীদলের অধিবেশন। যোগ দেন প্রায় ষাটজন পুরুষ ও আটজন নারী। কাকোরী মামলার ফেরারী চন্দ্রশেখর আজাদও উপস্থিত হন এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সাম্যবাদী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য-প্রণালী স্থির হল—পুলিশ আমলা হত্যার চেয়ে জনজাগরণের কাজ অগ্রাধিকার পাবে। কর্মীরা ভাগ হলেন দু'দলে—প্রথম দলের কাজ অস্ত্র সংগ্রহ ও ভীতি-প্রদর্শন মূলক কার্যকলাপ আর দ্বিতীয় দলের কাজ জনতার মধ্যে প্রচার কার্য। বুন্দেলখণ্ডের অরণ্য নির্ধারিত হল অস্ত্র শিক্ষার স্থান।

পরবর্তী ঘটনা: ১৯২৮শে সাইমন কমিশনের আগমন। ব্রিটিশ প্রভুর 'স্বরাজ' দানের প্রতিশ্রুতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষাবলম্বন করা সত্ত্বেও 'স্বরাজ' না-পাওয়ায় গান্ধীর অভিমান ভরা আবেদনে সাড়া দিয়ে সাইমন কমিশন ভারতে এল ১৯২৮ শে। দেখা গেল প্রতিশ্রুতি মাফিক কমিশনের সদস্যদের অর্ধেক ভারতবাসী হওয়া দূরস্থান, তাদের মধ্যে একজনও ভারতবাসী নেই। ভারতীয়দের প্রবল বিক্ষোভের মধ্যে কমিশন এল লাহোরে, ১৯২৮-এর ৩০ শে অক্টোবর। পুলিশের নিষেধ অমান্য করে এবং যোঁয়াটে স্বরাজ নয়, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল বেরোল, হাতে কালো পতাকা, নেতৃত্বে লালা লাজপত রায়, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ অকংগ্রেসী নেতারা। পুলিশ লাঠি চালাল, মারাত্মক ভাবে আহত হলেন লাজপত রায়। হাসপাতালে ১৭ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটল। স্তম্ভিত পাঞ্জাব শুনল পাঞ্জাব-কেশরীর প্রয়াণ সংবাদ। চন্দ্রশেখর যাদবের সভাপতিত্বে জরুরী অধিবেশন বসল হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির।

'হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ-ই মৃত্যু'! বদলা নিতে হবে। অত্যাচারী অপরাধী ঘাতক পুলিশ ডি এস্ পি স্যাণ্ডার্সের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেন ভগৎ সিং ও শিবরাম রাজগুরু। সহায়ক চন্দ্রশেখর আজাদ। তিনজনে আশ্রয় নিলেন ডি. এ. বি কলেজের ছাত্রাবাসে। সমস্ত লাহোর অবরোধ করা হল। কিন্তু ফাঁকি দিলেন বিপ্লবীরা। সাহেবের বেশে ভগৎ সিং, তাঁর স্ত্রী পরিচয়ে সহকর্মী ভগবতীচরণের সহধর্মিণী দুর্গাদেবী ও আরদালিরূপে শিবরাম রাজগুরু অমৃতসরগামী পাঞ্জাব মেলে চড়ে পালিয়ে গেলেন।

ভগৎ সিং এরপর কলকাতায় আসেন। ভবানীপুরে হাজরা পার্কের পশ্চিমে যতীন দাসের মেসে কয়েকদিন কাটান। ভগৎ সিং-এর আমন্ত্রণে উত্তর ভারতে আসেন যতীন দাস। যতীন দাসের সাহায্যে আগ্রায় প্রথম বোমার কারখানা খোলা হয়, তারপর লাহোর ও শাহারানপুরে আরো দুটি কেন্দ্র। শুধু বোমা নির্মাণ শিক্ষাই নয়, যতীন দাস উত্তর ভারতে রিভলবার সরবরাহও করেন। বোমা তৈরির পর বুন্দেলখণ্ডের জঙ্গলে তার পরীক্ষা করা হয়। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক সূর্য সেনের দল পরবর্তী কালে হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির সদস্য হন।

পরের ঘটনা—কুখ্যাত মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিতরা সেই সবে সংগঠিত করছেন শ্রমিক শ্রেণীকে। বোম্বের মজদুর সঙ্ঘ মিল-মালিকদের বিরুদ্ধে শুরু করেছে আন্দোলন। শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বোম্বের সূতাকল ধর্মঘট থেকে স্থাপিত হয়েছে 'লাল বাতটা'—অর্থাৎ 'লাল পতাকা' ইউনিয়ন—মিল মজুরদের ইউনিয়ন। ১৯২৯ এর ২৯শে মার্চ পাঞ্জাব, বাংলা, উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাইয়ের ট্রেড ইউনিয়নের ও শ্রমিক-কৃষক পার্টির বত্রিশ জন কমিউনিস্ট নেতা গ্রেপ্তার হন। শুরু হয় মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ডাঙ্গে, শওকত ওসমানী, পি. সি. জোশী প্রমুখ অভিযুক্তদের মধ্যে দু'জন ব্রিটিশ কমরেডও ছিলেন। ব্রিটিশ প্রজাদেরও যাতে এরপর প্রয়োজন পড়লে ভারত থেকে বিতাড়িত করা যায় তার জন্যে আনা হল পাবলিক সেফ্‌টি বিল্। তারপর এল 'ট্রেড্‌স্ ডিস্‌পুট বিল্'—শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য। এর প্রতিবাদে জনসমর্থন সৃষ্টি করার জন্য ১৯২৯-এর ৮ই এপ্রিল দিল্লীতে সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলি হলে অধিবেশনের সময় বোমা ছোঁড়েন ভগৎ সিং আর প্রচারপত্র বিলি করেন তাঁর সঙ্গী বটুকেশ্বর দত্ত। প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হয় আর তার পরেই ধ্বনিত হয়—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং-এর পালাবার কোন পরিকল্পনা ছিল না, পরিকল্পনা ছিল প্রচারের। তাঁরা ঘোষণা করেন, বোমা তাঁরা মানুষ মারতে ছোঁড়েননি, ফাঁকা জায়গা দেখেই ছোঁড়া হয়েছিল। সত্যিই কেউ হতাহতও হয়নি। তাঁরা শুধু এটাই চেয়েছিলেন যে, বধিরের কাণেও এই আওয়াজ যেন পৌছয়। পুলিশ যখন তাদের গ্রেপ্তার করতে গেল তাঁরা ধ্বনি দিলেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হ'ক। নিপাত যাক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের শ্রমিক বিরোধী চক্রান্ত। ব্রিটিশ সার্জেন্টের হাতে তাঁরা একটি পত্র

তুলে দেন। লাল খামের ওপর লাল হরফে লেখা: হিন্দুস্তান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মি…স্যাণ্ডার্স মরেছে আর আমরা নিয়েছি লালাজীর মৃত্যুর বদলা।

৮ই এপ্রিল থেকে ১৩ই জুলাই অবধি বিপ্লবীরা দিল্লীর দুটি থানায় ও জেলে বন্দী ছিলেন। দিল্লীর সেশন জজের আদালতে ৭ই মে কেসের শুনানি আরম্ভ হয় এবং বন্দীদের তরফ থেকে ভগৎ সিং-এর এক লিখিত জবানবন্দী 'কেন আমরা বোমা ছুঁড়েছি?' পাঠ করে শোনান বিপ্লবী পক্ষের উকিল ডঃ আসফ আলি। এই জবানবন্দী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহান দলিল:

'আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে আমরা কালাদেরও এই আওয়াজ শোনাব, আর যারা এই বর্তমান সময়কে উপেক্ষা করছে তাদের হুঁশিয়ারি দেবো।…

'…আমরা ওই কাল্পনিক অহিংসার সমাপ্তি ঘোষণা করে দিয়েছি, যার নিরুপযোগিতা সম্বন্ধে নয়া জামানার মনে কোন রকম সন্দেহই আর অবশিষ্ট নেই।…আমাদের দৃষ্টিতে বলপ্রয়োগ তখনই অন্যায় হয় যখন তা আগ্রাসী রীতিতে করা হয় এবং আমাদের দৃষ্টিতে এটাই হিংসা। কিন্তু, শক্তির প্রয়োগ যখন কোন বিহিত সাধনের (সমাজ-সম্মত) উদ্দেশ্যে করা হয়, তখন তা নৈতিক দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গতই হয়।

'…বিপ্লব মানব জাতির জন্মগত অধিকার। স্বতন্ত্রতা প্রতিটি মানুষেরই এমন এক জন্মসিদ্ধ অধিকার যা কোন পরিস্থিতিতেই হরণ করে নেওয়া যায় না।'

১২ই জুন (১৯২৯) বোম্ কেসের মামলায় অভিযুক্ত দু'জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল। বটুকেশ্বর দত্ত স্থানান্তরিত হলেন লাহোর সেণ্ট্রাল জেল-এ। ১৫ই জুন তাঁরা দু'জনেই রাজনৈতিক বন্দীর যথোচিত মর্যাদার জন্য শুরু করলেন অনশন ধর্মঘট। ভগৎ সিং-ও স্থানান্তরিত হলেন লাহোর জেলে ২৫শে জুন। ১৩ই জুলাই হাইকোর্টের রায়ে দণ্ডাদেশ অপরিবর্তিত রইল। ভগৎ সিংহকে পাঠান হল মিয়াঁওয়ালি জেলে। ইতিমধ্যে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'-র আসামী হিসাবে বন্দী হয়েছেন যতীন দাস ১৪ই জুন, ১৯২৯। তাঁকেও আনা হয়েছিল লাহোরে। ১৩ই জুলাই থেকে বোস্ট্রাল জেলে তিনি শুরু করেন আমরণ অনশন এবং অনশনের ৬৩তম দিন, ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তারই মধ্যে ১০ই জুলাই, শুরু হয়ে গেছে ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা (স্যাণ্ডার্স হত্যা)। তার আগেই ভগৎ সিংকে আনা হয়েছে লাহোর।

আমরণ ভগৎ সিং তাঁর কারাবাস কালকে প্রচারের কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর চিঠি বিবৃতি ইত্যাদি জনমানসে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯শে ডিসেম্বর কাকোরী শহিদদের স্মৃতিসভা উদযাপিত করেন ভগৎ সিং কারাবন্দীদের নিয়ে। ১৯২৯-এ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মডার্ণ রিভিউ'-এ 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির ব্যাখ্যা করেন খুনখারাপী আর অরাজকতা হিসাবে। তারই যুক্তিনির্ভর প্রবল প্রতিবাদ আসে ভগৎ সিং ও শ্রী দত্তের কাছ থেকে ২৩শে ডিসেম্বর। ওই দিনই ভাইসরয় লর্ড আরউইনের ট্রেনে বোমা ফাটালে অহিংস নেতারা তার তীব্র সমালোচনা করেন আর ভগৎ সিং ২৬শে জানুয়ারি ১৯৩০-এ জেলে বসে লেখেন—'বোমার দর্শন' :

"গান্ধীজী ঘোষণা করেন, অহিংসার সামর্থ্য তথা আত্মপীড়ন প্রণালীর ওপর ওনার এই আশা রয়েছে যে এগুলি একদিন বিদেশী শাসকদের হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁদের মনোভাব সেই অনুযায়ী গঠিত করবে। এখন উনি তাঁর সামাজিক জীবনকে এই অতি চমৎকার 'প্রেম সংহিতা' প্রচার করার জন্য সমর্পিত করে দিয়েছেন।...কিন্তু উনি কি বলতে পারেন যে ভারতে ক'জন শত্রুর হৃদয় পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের তিনি ভারতের বন্ধু তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন? কজন, ওভায়ার, ডায়ার বা রীডিং আর আরউইনকে তিনি ভারতের বন্ধু তৈরি করেছেন? যদি কাউকেই তিনি পরিবর্তন করতে না পেরে থাকেন তাহলে ভারত তাঁর এই বিচারধারার সঙ্গে কি করে একমত হবে যে, উনি অহিংসা দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ইংল্যাণ্ডকে রাজী করাবেন যাতে তারা ভারতকে স্বাধীনতা দেবে বলে স্বীকার করে! গান্ধীজী যে রূপে সত্যাগ্রহর প্রচার করেন, বাস্তবিক ভাবে তা এক আন্দোলন, এক ধরনের বিরোধিতা, যার অবধারিত পরিণাম হল সমঝোতা (আপোষ) এবং সেটা স্পষ্ট দেখাও গেছে। কাজেই স্বাধীনতা আর গোলামীর মধ্যে কোন সমঝোতা হতে পারেনা এটা আমরা যত শীঘ্র অনুধাবন করবো ততই মঙ্গল।'

স্পেশাল ট্রাইবুনালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি শুরু হয়। ভগৎ সিং-রা গ্রহণ করেন 'গো স্লো' পদ্ধতি, যত সময় নেওয়া যাবে ততই প্রচার কার্য চালাবার সুযোগ পাওয়া যাবে বেশী। ১৯৩০-এর ২২ই মে বিচারধীনদের

সঙ্গে ট্রাইবুনালের সদস্যদের কথা কাটাকাটিহয়, বন্দীদের হাতকড়া পরিয়ে আদালত থেকে বার করে দেওয়া হয়। এই সুযোগে বন্দীরা এবার আদালত বর্জন করলেন। মামলা বন্ধ হয়ে গেল। শেষে সরকার নতুন অর্ডিনেন্স জারী করল যাতে বন্দীদের অনুপস্থিতিতেও মামলা চালানো যায়।

১৯৩০ এর ২৪শে জানুয়ারী। লেনিন দিবস। ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীরা লাল স্কার্ফ পরে এলেন আদালতে। বিচারকের কাছে তাঁদের আর্জি—তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভাপতির কাছে টেলিগ্রাম মারফৎ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে দিতে হবে। আমৃত্যু মাকর্সবাদের প্রতি অবিচল ছিলেন ভগৎ সিং এবং মার্ক্সবাদ অধ্যয়ন থামাননি। ১৯৩০ এর ২৪শে এপ্রিল লাহোর জেল থেকে তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু জয়দেব গুপ্তকে নিম্নলিখিত বইগুলি পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরি থেকে পাঠাতে অনুরোধ করেন: মিলিটারিজম—কার্ল লিবনেখ্‌ট্‌, হোয়াই মেন্ ফাইট—রাসেল্, সোভিয়েট অ্যাট ওয়ার্ক, কোলাপ্স অফ সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল, লেফ্‌ট উইং কমিউনিজম, মিউচুয়াল এড্ (প্রিন্স ক্রোপোটকিন), ফিল্ডস ফ্যাক্টরিজ অ্যাণ্ড ওয়ার্কশপ্‌স্, সিভিল ওয়ার ইন্ ফ্রান্স (মার্ক্স), ল্যাণ্ড রেভোলিউশান ইন্ রাশিয়া, স্পাই (আপটন সিন্‌ক্লেয়ার) এবং হিস্টোরিকাল মেটিয়ারিলিজম (বুখারিণ)।

১৯৩০এর ৭ই অক্টোবর স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে ভগৎ সিং শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির আদেশ হল। তাঁরা মার্জনা ভিক্ষা করলেন না। শ্রী প্রাণনাথ মেহরা ছিলেন অভিযুক্ত পক্ষের অ্যাডভোকেট। ১৯৩০-এর ১৯এ মার্চ তিনি ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, তাঁরা যদি মার্সি পিটিশন (দয়া প্রার্থনা) করেন তবে ফাঁসির আদেশ মকুব হয়ে যাবে। ভগৎ সিং তাঁকে পিটিশন তৈরি করে আনতে বলেন। প্রাণনাথ সারা রাত পরিশ্রম করে পরের দিনই দরখাস্তের খসড়া নিয়ে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে দেখা করেন। ভগৎ সিং হেসে জানান—তাঁদের আবেদন তাঁরা ইতিমধ্যেই গভর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই আবেদনের শিরোনাম ছিল—'ফাঁসি নয়, আমাদের গুলি করে মারতে হবে'। ভগৎ সিং লিখেছিলেন যে, তাঁরা একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন. কাজেই যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাঁদের একমাত্র গুলি করেই মারাই বিধি সম্মত।

কারারুদ্ধ অবস্থায় অসংখ্য চিঠি বিবৃতি ও জবানবন্দী ছাড়াও তিনি কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ড্রিমল্যাণ্ড'

নামে একটি কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা। দক্ষিণ ভারতের এক কারাগারে বসে এই বইটি লিখেছিলেন লালা রামসরণ দাস। গদর পার্টির আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১-এর ১৫ই জানুয়ারি 'ফাঁসির আসামী' ভগৎ সিং এই ইংরাজী গ্রন্থেব যে ভূমিকা লেখেন তাব মধ্যে হিংসা-অহিংসা, ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি দার্শনিক বিষয়ে তাঁর সুগভীর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত হয়। এ ছাড়াও তিনি রচনা করেন আত্মকথা, ডোর টু ডেথ্, আইডিয়াল অফ সোশ্যালিজম, স্বাধীনতার লড়াইয়ে পাঞ্জাবের প্রথম উপহার ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ গ্রন্থে কিছু অংশ ব্যতীত বাকী বইগুলি সবই হারিয়ে যায়। এ এক অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতি।

লাহোর সেন্ট্রাল জেলে গোপনে, ভারতবাসীর চোখের অন্তরালে ১৯৩১-এর ২৩শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ২২ মিনিটে ইংরাজের ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিলেন ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু। ফাঁসির মঞ্চে তাঁরা গান গাইতে গাইতে উঠে ছিলেন—

'শহিদের চিতায় রবে চিরদিন দেশের জন্য মৃত্যু ববণকারী মানুষের নিশানা—'

নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয় স্বজনদের হাতে মৃতদেহ সমর্পণ করা উচিত কিন্তু তা না করে রাত্রির অন্ধকারে সামরিক বাহিনী বিপ্লবীদের শবদেহ নিয়ে গেল ফিরোজপুরের (বর্তমান হাসেনওয়ালা) নিকটে শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরে। টর্চ আর লণ্ঠনের আলোয় কেরোসিন আর পেট্রোল ঢেলে শবদাহ করা হল। কিন্তু খবর গোপন থাকেনি। ভগৎ সিং-এর বন্ধু জয়দেব গুপ্তের সঙ্গে রাত্তিরেই নদীর তীরে এসে পৌছলেন বিপ্লবীর ভগ্নী অমর কৌর। অর্ধদগ্ধ অস্থি নিয়ে ফিরে এলেন তাঁবা। পরদিন সকালে সেই অস্থি নিযে লাহোরের পথে পথে বেরোল মিছিল। বিপ্লবীরা মানুষের শেষ অভিবাদন গ্রহণ করলেন

বর্তমানে সেই হাসেনওয়ালায়, শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের ছোট্ট একটি শ্মশানে আজো প্রতি বছর, ২৩শে মার্চ বসে তিন দিনের একটি শহিদ-মেলা।

না কথা এখনো ফুরোয়নি। ভগৎ সিং-এর বক্তের ছিটে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গায়েই লাগেনি। সেই রক্তে জাতির জনক 'মহাত্মা'-র হাত কলুষিত। ভগৎ সিং এবং তাঁর সহকর্মীদের যখন ফাঁসির হুকুম হল সারা দেশ এহ রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। ওদিকে গান্ধী তখন বড়লাট আর-উইনের সঙ্গে চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনা করছে। সাধারণ মানুষের দৃঢ বিশ্বাস ছিল যে ভগৎ সিং-দের ফাঁসি হবেনা, কারণ গান্ধীর প্রধান শর্তই হবে

রাজবন্দীদের মুক্তি। শুধু ভারতবাসীই নয় ইংল্যাণ্ডের হাউস অফ কমন্সের কয়েকজন সদস্য আরউইনকে ১৯৩১-এর ৬ই মার্চ এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের যেন ক্ষমা করা হয়'। কিন্তু তা হলনা, গান্ধী তার চরিত্র অনুযায়ী বন্দীমুক্তি সর্ত বাদেই চুক্তিতে সই করতে সম্মত হন। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে আরউইনের বিবরণে আমরা দেখি—'Mr. Gandhi thought for a moment and then said, "Would your Excellency see any objection to my saying that I pleaded for the young man's life?"

'I said that I had none if he could also add that from my point of view he did not see what other course I could have taken.'

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তিন জন বিপ্লবীর মৃত্যুদণ্ডের পর এক শহিদ স্মৃতি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে যোগদান করতে গান্ধীকে অনুরোধ জানালে গান্ধী জানান, "স্মৃতি রক্ষার ব্যাপারে আপনাদের সহিত আমার যোগদানের অর্থ তাদের অতীত কার্যাবলী আমি সমর্থন করি।… কারও স্মৃতিরক্ষা নিঃসন্দেহে বুঝায় স্মৃতিরক্ষাকারী তাদের কার্য অনুসরণ করবেন। আমার বংশধরদের এই প্রকার কার্য অনুসরণ করবার এটা একপ্রকার আমন্ত্রণ মাত্র। এই জন্য এই স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে জড়িত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

ভারতের ইতিহাসে ভগৎ সিং আর গান্ধীর এই স্বতন্ত্র দুটি ভূমিকা পাশাপাশি অধ্যয়ন করলে তবেই বিপ্লবীদের প্রকৃত মহত্ত্ব আর অহিংসার ভেকধারীদের উদ্দেশ্যমূলক নৃশংসতা স্পষ্ট হবে।

বোমা নিক্ষেপের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সম্বন্ধে হাইকোর্টে আপিল করার সময় ভগৎ সিং যে বয়ান পেশ করেন তার বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হয়। এই লেখাটি ভগৎ সিং-এর চিঠি ও বিবৃতির সঙ্কলন, বীরেন্দ্র সিন্ধু সম্পাদিত 'সরদার ভগৎ সিং—পত্র আউর দস্তাবেজ' থেকে গৃহীত।

আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিন

সরদার ভগৎ সিং

মাই লর্ড,

আমি উকিল বা ইংরেজী ভাষার বিশেষজ্ঞ নই ; না আমার কোন ডিগ্রী আছে। তাই আমার কাছ থেকে কোনো ধারালো ভাষণ আশা করা উচিত নয়। আমার শুধু প্রার্থনা, যে বক্তব্য আমি পেশ করছি তার ভাষাগত ত্রুটির দিকে যেন নজর দেওয়া না হয়— শুধু তার যথাযথ অর্থের প্রতিই যেন মনোনিবেশ করা হয়। অন্য সমস্ত বিষয়গুলি উকিলের ওপর ন্যস্ত করে শুধু একটি বিষয়ের ওপরই আমার চিন্তাধারা ব্যক্ত করব। বিষয়টি এই মোকদ্দমায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টা হচ্ছে, আমি কি চেয়েছিলাম এবং আমি কি ধরনের অপরাধী।

এটা সাদামাটা কোন মামলা হয়, খুবই জটিল। তাই আপনার সুবিধার্থে অন্য কারো পক্ষে বিষয়টিকে আরো পরিস্ফুট করে তোলা সম্ভব নয়। আমি এক বিশেষ ঢং-এ ভেবেছি এবং সেই ভাবনা কার্যকরী করেছি। আমার ইচ্ছে, এদিকে দৃষ্টি রেখে তবেই আমাদের উদ্দেশ্য এবং অপরাধের গভীরতা বিচার করা হোক। সুপ্রসিদ্ধ আইন বিশারদ সালোমনের অভিমত, কোন ব্যক্তিকেই তার অপরাধী আচরণের জন্যে সাজা দেওয়া চলে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধের উদ্দেশ্য আইন পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

সেসন জজের আদালতে আমি একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করেছিলাম। সেই বক্তব্যে আমার উদ্দেশ্য এবং আমি কি চেয়েছিলাম তার ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সেশন জজ মহোদয় তাঁর এক কলমের খোঁচায় বলেছেন, "সামগ্রিকভাবে ধরলে, অপরাধ সংঘটিত করার যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে তা আইনের কাজকে প্রভাবিত করে না এবং আমাদের দেশে আইনানুযায়ী রায় দানের সময় উদ্দেশ্য

এবং ইচ্ছার কথা কচিৎ কখনো বিবেচনা করা হয়।” অর্থাৎ তিনি আমার সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

মাই লর্ড, এরকম এক পরিস্থিতিতে যোগ্য সেশন জজের উচিত ছিল, অপরাধের গুরুত্ব পরিণাম থেকে নিরূপণ করা বা আমার বক্তব্যকে মনোবৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কিন্তু তিনি এর কোনটাই করেননি।

বিচার্য বিষয় হচ্ছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে যে-বোমা দুটি নিক্ষেপ করেছি তাতে কারো কোন শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়নি। কিন্তু আমাদের যে সাজা দেওয়া হয়েছে তা শুধু কঠোরতমই নয়, তার থেকে প্রতিশোধমূলক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে, যতক্ষণ না অভিযুক্তদের মানসিকতার কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তাদের আসল উদ্দেশ্যেরও কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। উদ্দেশ্যের কথা সম্পূর্ণ-ভাবে বিস্মৃত হলে সবার প্রতি অন্যায় করা হয়। উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিব সামনে না রাখলে বিশ্বের বড় বড় সেনাপতিদের নিছক হত্যা-কারী বলে মনে হবে। সরকারী ট্যাক্স আদায়কারীকে চোর জোচ্চোর এবং ন্যায়াধীশদের ওপর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আরোপ করা যায়। সমাজ এবং সভ্যতা তখন খুন রাহাজানি ও জালিয়াতিতে ভরা বলে মনে হবে। উদ্দেশ্যকে যদি উপেক্ষা করা হয়, তবে আইনের হুকুমনামা কোন অধিকার বলে সমাজের লোকদের ন্যায়েব পথে চলতে বলে? উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করলে প্রতিটি ধর্ম প্রচারককে মিথ্যার প্রচারক বলে মনে হবে। এবং অনেক পয়গম্বরের ওপর অভিযোগ বর্তাবে, তাঁরা কোটি কোটি সাদাসিধে এবং অজ্ঞ মানুষদের ভ্রষ্ট করেছে। উদ্দেশ্যকে ছেঁটে বাদ দিলে হজরত ইশাকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, শান্তি ভঙ্গকারী এবং বিদ্রোহ প্রচারকারী বলে মনে হবে। আইনের চোখে তাঁরা ‘ভয়ঙ্কর ব্যক্তি’ হিসেবে চিহ্নিত হবেন। কিন্তু আমরা তাঁকে উপাসনা করি,—তাঁর মূর্তি আমাদের হৃদয়ে

আধ্যাত্মিকতার স্পন্দন সৃষ্টি করে। কেন করে? কারণ তাঁর প্রেরণাদৃপ্ত প্রচেষ্টার মধ্যে এক মহান উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। সে যুগের শাসকশ্রেণী তাঁর উদ্দেশ্যকে চিনতে বা বুঝতে পারেননি—তারা তাঁর উদ্দেশ্যের বাহ্যিক প্রয়োগকেই দেখেছে। কিন্তু সেই সময় থেকে আজ অবধি উনিশ শ' বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা কি তখন থেকে আজ অবধি কোনই উন্নতি করিনি? আমরা কি একে শুধু ভুল আখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হব? তাই-ই যদি হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে মানুষের আত্মত্যাগ, মহান শহিদদের প্রচেষ্টা সবই ব্যর্থ। বিংশ শতাব্দী আগে আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আজও ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি!

আইনের চোখে উদ্দেশ্যের প্রশ্ন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল ডায়ারের উদাহরণ ধরুন। ডায়ার গুলি চালিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ এবং নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করেছে। কিন্তু সামরিক আদালত তাকে গুলি করে হত্যা করার নির্দেশ না দিয়ে বরং তাকে লক্ষ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেছে। আর একটা উদাহরণের ওপর দৃষ্টি দিন, শ্রীখড়্গ বাহাদুর সিংহ নামে এক গোর্খা তরুণ কলকাতায় এক ধনী মারোয়াড়িকে ছুরিকাঘাতে নিহত করে। তার হত্যার উদ্দেশ্যকে যদি একদিকে ঠেলে রাখা যায় তবে খড়্গবাহাদুরের মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত। কিন্তু তাকে কয়েক বৎসরের সাজা দেওয়া হয়েছে এবং সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আইনের মধ্যে কি এমন ফাঁক আছে যাতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল না—তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ সিদ্ধ হল না? সে আমাদের মতোই অপরাধ স্বীকার করেছিল, কিন্তু তার প্রাণ বেঁচে গেল এবং সে এখন মুক্ত। আমার জিজ্ঞাস্য, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল না কেন? উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তার কাজ বা অ্যাকসন আমাদের কাজের চেয়ে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর এবং জটিলতাপূর্ণ। তার সাজা লঘু হয়েছে, কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল ভালো। সমাজকে সে এমন

এক জোঁকের কামড় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে—যে জোঁক বেশ কিছু সুন্দরী তরুণীর রক্ত চুষে খাচ্ছিল। শুধুমাত্র আইনের মর্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই শ্রীখড়গ বাহাদুরকে কয়েক বৎসরের সাজা দেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত সাংঘাতিক ভুল। এই সিদ্ধান্ত ন্যায়ের বুনিয়াদী সিদ্ধান্ত অর্থাৎ, 'আইন মানুষের জন্যে, মানুষ আইনের জন্যে নয়'—এই সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। সুতরাং এমন কি কারণ ঘটতে পারে যাতে আমাদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়,—অথচ শ্রীখড়গ সিংহের মুক্তি সম্ভব? এটা সুস্পষ্ট যে, তাকে সামান্য সাজা দেওয়ার সময় তার উদ্দেশ্যর প্রতি নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। তা না হলে কোন ব্যক্তি হত্যা করলে সে ফাঁসীর সাজা থেকে কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না। অথচ আমরা সেই একই আইনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। বঞ্চিত হবার কারণটা তবে কি এই যে, আমরা যা কিছু করেছি তা সরকারের বিরুদ্ধে? বা আমরা যা কিছু করেছি তার একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে?

মাই লর্ড, এরকম এক পরিস্থিতিতে আমাকে বলার অধিকার দেওয়া হোক, যে-হুকুমনামা এইরকম এক ঘৃণ্য কাজের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে, মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়, সেই হুকুমনামার বলবৎ থাকার কোন অধিকার নেই। এই হুকুমনামা যদি কায়েম থাকে তবে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আরো হাজার হাজার মানুষের রুধির আইনের গর্দানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। আইন যদি উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি না দেয়, তবে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না স্থায়ী শান্তিও আসতে পারে না।

আটার মধ্যে বিষ মেশানো উচিত নয়। এতে ইঁদুরের প্রাণনাশ হয় ঠিকই, কিন্তু এই আটায় যদি মানুষের প্রাণ যায় তবে তা হত্যার অপরাধের সামিল হবে। সুতরাং এই আইন যুক্তি সম্মত নয়, বরং এই আইন ন্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। এই ধরনের আইনকে

সমূলে ধ্বংস করা উচিত। ন্যায়বিরোধী এ ধরনের আইনের জন্যে শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর যোদ্ধামানুষ বিদ্রোহ সংগঠিত করেছেন।

আমাদের মোকদ্দমার তথ্য সম্পূর্ণ ভাবে জটিলতাহীন। ৮ই এপ্রিল, ১৯২৯, আমরা সেন্ট্রাল এ্যাসেম্বলিতে দু'টি বোমা ছুঁড়ি। বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন আহত হন। হলের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়, বহু দর্শক এবং সদস্য বাইরে বেরিয়ে যান। অল্পক্ষণের মধ্যেই নিস্তব্ধতা ছেয়ে যায়। আমি এবং আমার সাথী বি, কে দত্ত* নিশ্চুপ হয়ে দর্শক-গ্যালারিতে বসে থাকি। গ্রেফতারের জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। আমাদের গ্রেফতার করা হয়। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে আমাদের সাজা দেওয়া হয়। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণে মাত্র চার-পাঁচজন সামান্য আহত হয়ে ছিলেন। বেঞ্চের সামান্যই ক্ষতি হয়েছিল। আর আমরা যারা এই অপরাধ করেছিলাম, কারো হস্তক্ষেপের আগেই স্বেচ্ছায় ধরা দিই। সেশন জজ নিজেই স্বীকার করেছেন, পালাতে চাইলে আমরা পালাতে পারতাম। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছি। এবং আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্যে বক্তব্য পেশ করেছি। আমরা সাজার ভয় করি না। আমার বক্তব্য থেকে কয়েকটি পরিচ্ছেদ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতির দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি সম্পূর্ণ ক্ষতিকারক। আমাদের বক্তব্য সামগ্রিক ভাবে অধ্যয়ন করলে সুস্পষ্ট হবে, আমরা মনে করি দেশ এক সঙ্গীন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সেজন্যে উচ্চ কণ্ঠে হুঁশিয়ারী দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আমরা আমাদের চিন্তানুসারে হুঁশিয়ারী দিয়েছি। হয়তো আমরা ভুল করেছি। আমরা যে ভাবে ভেবেছি তার সঙ্গে বিচারক মহাশয়ের ভাবনার ফারাক থাকতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের

* বটুকেশ্বর দত্ত।

মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া হবে না এবং আমাদের ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক—এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা আমার বক্তব্যে উপস্থিত করেছি, তা আমাদের উদ্দেশ্যের মুখ্য অংশ আর সেইটাই পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ সম্পর্কে আমাদের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভুলভাবে। পিস্তল আর বোমা বিপ্লব আনে না, কিন্তু ইনক্লাবের তলোয়ারকে মতাদর্শের শানে ঘষে শানিত করে তোলা যায়, আর আমরা তাই-ই করতে চেয়েছিলাম। আমাদের ইনক্লাবের অর্থ পুঁজিবাদী যুদ্ধের সংকটকে খতম করা। মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাকে বাস্তবায়িত করার যে প্রক্রিয়া, সেটা না বুঝে বা অনুভব করে সে সম্পর্কে রায় দেওয়া উচিত নয়। আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়।

আর একটা বিষয় বা পয়েন্ট সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। বোমার শক্তি সম্পর্কে যদি আমাদের জ্ঞান না থাকত তবে আমরা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীকেলকর, শ্রীজয়কর ও শ্রীজিন্নার মতো সম্মানিত জাতীয় নেতাদের উপস্থিতিতে কেন বোমা ছুঁড়লাম? আমরা আমাদের নেতাদের জীবন কেন বিপন্ন করে তুলব? আমরা কি উন্মাদ? আমরা যদি সত্যই উন্মাদ হতাম তবে আমাদের পাগলা-গারদে না পাঠিয়ে জেলখানায় রাখা হল কেন? বোমা সম্পর্কে আমরা বেশ ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল। সে জন্যেই আমরা এমন সাহসিক কাজ করেছি। যে বেঞ্চগুলোতে লোক বসেছিল তার ওপর বোমা ছোঁড়া এমন কোন দুরূহ কাজ ছিল না। কিন্তু খালি জায়গায় বোমা নিক্ষেপ করা কঠিন কাজ ছিল। যারা বোমা নিক্ষেপ করেছিল তারা যদি সুস্থ মস্তিষ্কের না হত, তবে বোমা খালি জায়গায় না পড়ে বেঞ্চে পড়ত। সুতরাং আমার বক্তব্য, খালি জায়গায় বোমা নিক্ষেপ করার জন্যে আমরা যে হিম্মত দেখিয়েছি তার জন্যে

আমাদের পুরস্কার দেওয়া উচিত। মাই লর্ড, এই রকম এক পরিস্থিতিতে আমি মনে করছি, আমাকে সঠিক ভাবে বোঝা হয়নি। আমরা আপনার কাছে দণ্ডাদেশ লাঘব করতে বলছি না,—শুধু আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করার জন্যে হাজির হয়েছি। আমরা চাই, আমাদের সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার যেন না করা হয় বা অনুচিত রায় যেন না দেওয়া হয়। সাজার প্রশ্ন আমাদের কাছে গৌণ।

অনুবাদ ॥ কমলেশ সেন

প্যাট্রিস এমারি লুমুম্বা

"জনসাধারণের কাছে আমার কোন অতীত নেই, পিতামাতা নেই, পরিবার নেই, আমি শুধু একটা চিন্তা।

"দেশের জনগণ যতক্ষণ না নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হচ্ছেন ততদিন আমার ঘুমোবার কোনো অধিকার নেই।

"আমিই কঙ্গো, কঙ্গো আমায় তৈরি করেছে। আমি কঙ্গোকে তৈরি করছি।"

এই কণ্ঠ কালো আফ্রিকার এক কালো মানুষের, কিন্তু ব্যক্তিত্ব তাঁর অশনি সঙ্কেতের মতোই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল। তাঁর ক্ষণস্থায়ী জীবনটাও তাই সাম্রাজ্যবাদীদের মৃত্যু শমণ হেঁকে দিয়ে যায়।

তাঁর জন্ম ১৯২৫ এর দোসরা জুলাই, কঙ্গোর মান্কুরা জেলার ওনালুয়াতে। সেকেণ্ডারী পাশ করে স্ট্যান্লিভিলে পোষ্ট অফিসের কেরাণীর কাজে যোগ দেন ১৯৫৫-এ। গড়ে তোলেন ডাক কর্মীদের ইউনিয়ন তারপর তিনি বেল্‌জিয়ান সাম্রাজ্যবাদীদের পরাস্ত করবার জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে স্থান করে নেন। প্রগতিশীল নেতা হিসাবে ব্যাপক জনসমর্থন ছিল তাঁর। ফরাসী ছাড়াও কঙ্গোর সব ক'টি প্রধান ভাষা ছিল তাঁর আয়ত্তে। ১৯৬০-এর মে মাসে লুমুম্বার দল জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে ১৩৭টি আসনের মধ্যে ৪১টি দখল করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। অনিচ্ছুক বেল্‌জিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা বাধ্য হয় তাকে কোয়ালিশন ক্যাবিনেট গঠন করতে দিতে। লুমুম্বা নির্বাচিত হন কঙ্গোর প্রথম প্রধান মন্ত্রী। একই সঙ্গে বেল্‌জিয়ান শক্তি কঙ্গোর আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সুযোগ গ্রহণ ক'রে লুমুম্বা-বিরোধী দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষমতালোভীদের মদৎ দিতে শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদী বেল্‌জিয়ান শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কাতাঙ্গা ও দক্ষিণ কাসাই দখল করে নেয় বিচ্ছিন্নতাবাদী চক্র।

সদ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত লুমুম্বা ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌ এর হস্তক্ষেপ দাবী করেন। ইউনাইটেড্‌ নেশন্‌স্‌ নিরপেক্ষতার মুখোশ এঁটে সাম্রাজ্যবাদীদের সেই পুরনো খেলা ডিভাইড্‌-অ্যাণ্ড-রুল্‌ চালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়। তারপর লুমুম্বা সোভিয়েত হস্তক্ষেপের প্রস্তাব করা মাত্র কঙ্গোয় প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু তাঁকে

ক্ষমতাচ্যুত করে। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি পুনরনির্বাচিত করে তাঁকে কিন্তু সেনাবাহিনীর একটি অংশ, কর্নেল মোবুটুর নেতৃত্বে ও ইউনাইটেড্ নেশন্‌স্-এর ঘানা-বাহিনীর সাহায্যে লুমুম্বাকে বন্দী করে। লুমুম্বা সমর্থকরা তখন আবার সুসংগঠিত হবার জন্য স্ট্যানলিভিল্-এ ফিরে যান।

১৯৬১-র ১৭ই জানুয়ারি লুমুম্বা ও তাঁর দুই সঙ্গীকে প্লেনে করে মোয়াণ্ডায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ১৮ই জানুয়ারি তাঁদের নিয়ে আসা হয় এলিজাবেথ্‌স্‌ভিল্-এ। প্লেনের বেল্‌জিয়ান পাইলট পরে সাক্ষ্য দেন যে প্লেনে তিন বন্দীকে একত্রে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং আকাশপথে সারাক্ষণ তাদের প্রহার করা হয়। সেই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্লেনের কর্মী ও পাইলটরা নিজেদের কক্‌পিটের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন। এলিজাবেথ্‌স্-ভিল্-এ নামার পর তাঁদের মুগুর মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে জিপে তোলা হয়। সমস্ত ঘটনাই ঘটে ইউনাইটেড নেশন্‌স্-এর সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতেই। ১০ই ফেব্রুয়ারি ফ্যাসিস্টদের মধ্যে সুপ্রচলিত সেই সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি দেয় কাতাঙ্গা সরকার: লুমুম্বা সমেত বন্দীরা পলাতক। সত্তরের দশকের পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে এর পরের খবরটি সহজেই অনুমেয়—যথা নিয়মে যথা সময়ে ১৩ই ফেব্রুয়ারি জানা যায়, পলাতক বন্দীরা সামরিক রক্ষীর হাতে নিহত হয়েছেন। কাতাঙ্গার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন: 'আমি জানি কিছু লোক বলবে যে আমরা ওকে হত্যা করেছি। তা যদি বলে, তাহলে আমার উত্তর হল: প্রমাণ করো!' সত্যিই কিছু প্রমাণ করা গেল না, তবে সেটা কাগজে কলমে, সেটা ইউনাইটেড নেশন্‌স্ নিযুক্ত কমিশনের রায়। জনগণের রায় যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে। লুমুম্বা মুক্তিকামী বিবেকের অনির্বাণ দীপ। স্ত্রী-কে লেখা লুমুম্বার শেষ চিঠিটির অনুবাদ মুদ্রিত হল। উৎস: লুমুম্বা রচিত 'কঙ্গো মাই কানট্রি'র মুখবন্ধ।

ইতিহাসই একদিন বলবে

প্যাট্রিস এমারি লুমুম্বা

প্রিয়তমা আমার,

যে চিঠিটা লিখছি সেটা তোমার কাছে পৌঁছবে কিনা, বা কখন পৌঁছবে বা চিঠিটা তুমি যখন পড়বে তখনও আমি বেঁচে থাকবো কি না জানিনা। আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি এতদিন ধরে যে সংগ্রাম চালিয়ে আসছি তার মধ্যে কখনোই ক্ষণেকের জন্যেও সেই পবিত্র উদ্দেশ্যের অন্তিম সাফল্য সম্বন্ধে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। এই পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য আমি ও আমার সঙ্গীরা আমাদের জীবন পুরোপুরি নিবেদন করেছি। দেশের জন্য আমরা চেয়েছি সম্মানজনক জীবনধারনের অধিকার, অমলিন মর্য্যাদা ও অবাধ স্বাধীনতা লাভের অধিকার। কিন্তু বেল্‌জিয়ান সাম্রাজ্যবাদীরা আর তাদের পশ্চিমী দোসররা কখনোই তা চায়নি এবং এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভাবে সমর্থন যুগিয়েছে ইউনাইটেড নেশান্‌স্‌-এর কিছু উচ্চপদাসীন ব্যক্তি।

এই যে সংস্থাটি, যার ওপর আমরা পূর্ণ আস্থা রেখেছিলাম এবং যাদের কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম, তারাই আমাদের কিছু সহযোদ্ধাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করেছে এবং কয়েকটিকে ঘুষ দিয়ে বিপথগামী করেছে। সত্যকে বিকৃত করা ও আমাদের স্বাধীনতাকে অসম্মানিত করার কাজে এরাই হয়েছে সহায়ক। এছাড়া আর কি-ই বা বলতে পারি। সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমে জীবিত বা মৃত, মুক্ত অথবা বন্দী, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন ব্যক্তি 'আমি'র ব্যাপারটা বড নয়। আসল হল কঙ্গো, আসল হল আমাদের দরিদ্র দেশবাসী যাদের কাছে স্বাধীনতা এখন একটি বন্দী খাঁচার চেহারা ধারণ করেছে আর সেই খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে বহির্জগৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কখনো দয়াময় চোখে, আবার কখনো মহা উল্লাসে, আনন্দে।

কিন্তু আমার বিশ্বাসে কখনোই চিড় ধরবে না। আমি জানি এবং আমার হৃদয় দিয়ে আমি অনুভব করছি যে, আজ হোক কি কাল, আমার দেশের মানুষ তাবৎ শত্রুর কবল থেকে, কি আভ্যন্তরীণ কি বৈদেশিক শত্রুর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করবেই এবং তাদের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হবে প্রতিবাদের ঐকতান—না। ঔপনিবেশিক-বাদের লজ্জা আর অধঃপতনকে তারা মেনে নেবে না। সূর্যের স্বচ্ছ উজ্জ্বল আলোয় আবার তারা উদ্ধার করবে তাদের মর্য্যাদা।

আমরা একা নই। আফ্রিকা এশিয়া ও পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে যত মুক্ত স্বাধীন মানুষ রয়েছেন, তাদের সবাইকেই পাওয়া যাবে লক্ষ লক্ষ কঙ্গোবাসীর পাশে। সাম্রাজ্যবাদীরা আর তাদের ভাড়া-করা কুত্তারা যতদিন না আমাদের দেশ ছেড়ে যাচ্ছে ততদিন কঙ্গোবাসীর সংগ্রাম থামবে না। এবার আমার ছেলেমেয়েদের কথা বলি, ওদের আমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর হয়তো ওদের কখনো দেখতে পাবো না। ওদের আমি এই কথাটাই বলতে চাই যে, পুনর্বার আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করার যে পবিত্র কর্ম সাঙ্গ করার জন্য আমি চেষ্টা করেছি তা আমি ওদের মুখ চেয়েই করেছি, করেছি প্রত্যেক কঙ্গোবাসীর মুখ চেয়ে। কারণ, মর্য্যাদা বিনা মুক্তি থাকতে পারে না, ন্যায় বিনা মর্য্যাদা থাকতে পারে না আর স্বাধীনতা বিনা স্বাধীন মানুষ থাকতে পারে না।

বর্বরতা কি নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার—কোনোভাবেই আমাকে দিয়ে কখনো ক্ষমাভিক্ষা চাইয়ে নেওয়া যাবে না। কারণ পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে এবং পবিত্র নীতিকে বর্জন করে বাঁচার চেয়ে মাথা উঁচু ক'রে বিশ্বাসে অবিচল থেকে এবং নিজের দেশের অন্তিম সাফল্যে গভীর আস্থা রেখে মরাটাকে আমি শ্রেয় মনে করি। ইতিহাসই একদিন তার যা বলার আছে বলবে। তবে এই ইতিহাস ব্রাসেল্‌স্‌, প্যারি, ওয়াশিংটন বা ইউনাইটেড নেশান্‌স্‌-এ যে-ইতিহাস পড়ানো হয় সে-ইতিহাস নয়। এই ইতিহাস পড়ানো হবে সাম্রাজ্যবাদ আর

তাদের পুতুল অনুচরদের কবল থেকে মুক্ত দেশগুলিতে। আফ্রিকা স্বয়ং তার ইতিহাস রচনা করবে এবং সেই ইতিহাস হবে সাহারা মরুভূমির উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের এক মহান ও মর্য্যাদাপূর্ণ ইতিহাস।

প্রিয়তমা আমার, আমার জন্য তুমি কেঁদো না। আমি জানি যে আমার এই দেশ, আজকে যাকে এত যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে, সে তার স্বাধীনতা ও মুক্তিকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে নেবেই। কঙ্গো দীর্ঘজীবী হোক্। দীর্ঘজীবী হোক্ আফ্রিকা।

প্যাট্রিস্

অনুবাদ ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ

আর্নেস্টো চে গেভারা

"চে" এই শব্দটি উচ্চারণ ও প্রয়োগ অনুযায়ী বিস্ময়, আনন্দ, বিষাদ, অনুরাগ, আপত্তি বা সমর্থন—আবেগ অনুভূতির সমস্ত ভাবগুলিই প্রকাশ করতে পারে। এই অব্যয়টির প্রতি অনুরাগের কারণেই বিপ্লবীরা আর্নেস্টো গেভারার ডাক নাম দিয়েছিল 'চে'। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে এই ডাক নামই একদিন হয়ে উঠল ছদ্মনাম এবং এই ছদ্মনামেই সারা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষ চিনল আর্নেস্টো গেভারা-কে। গেভেরা নিজে বলেছেন: 'আমার কাছে আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান যা কিছু তারই প্রতীক হল এই 'চে' শব্দটি। এমনটি না হয়ে উপায়ও নেই। সত্যিই তো, আমার প্রথম নাম ও পদবীটি শুধু ক্ষুদ্র. ব্যক্তিগত ও তুচ্ছ কিছু ব্যাপার ব্যক্ত করে।'

আর্জেন্টিনার সন্তান, কিউবা বিপ্লবের সফল নায়কদের মধ্যে অন্যতম 'চে' যখন বলিভিয়ায় চলে গেলেন বিপ্লবের ডাকে, তখন সমস্ত বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছিল। না, দুঃসাহসে নয়, সত্যিকার বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার পরিচয় পেয়ে। বলিভিয়াতে সফল হলেও কি 'চে' থামতেন? সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়ার সমস্ত ভূখণ্ডে পরাজিত হবার আগে কি 'চে'-র অভিযান থামত? আমরণ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দুর্দমনীয় স্পর্ধায় তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে এক ঈর্ষণীয় যোদ্ধা, একটি সংগ্রামের সাফল্য যাঁকে সন্তুষ্ট করেনি, আত্মতৃপ্ত হয়ে কিউবা-র মানুষের হৃদয়ের আশ্রয় তিনি ভোগ করতে পারেন নি।

'চে'-র পরিচিত জীবনের কথা উল্লেখ না করে শুধু তাঁর মৃত্যুর ঘটনা ও তার পরবর্তী একটি অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করছি যা "চে" সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ভীতিকে সুস্পষ্ট করবে।

১৯৬৭-এর ৮ই অক্টোবর বলিভিয়ার রণাঙ্গনে সম্মুখ যুদ্ধে গ্রেপ্তার হন চে। আগেই তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। বিপক্ষ বাহিনীর ক্যাপ্টেন 'চে'-কে চিনতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে যায়। চে ধরা পড়বেন, বিশ্বাস করাও যেন···সঙ্গে সঙ্গে চে এবং তাঁর সহযোদ্ধা উইলিকে কড়া পাহারায় নিয়ে আসা হয় হিগেরায়। পরের দিন আরেক সহকর্মী চিনোকেও আনা হয়। একটা ইস্কুল বাড়িতে রাখা হয় তাঁদের। পরের দিন ভোরে সি-আই-এর গোয়েন্দারা আসে হেলিকপ্টারে করে। চে-কে দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করে এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তরা। কথা

বলেছিলেন চে, তবে সেটা ওই স্কুলের তরুণী এক শিক্ষিকার সঙ্গে। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা তাঁর একটা স্প্যানিশ বাক্যে বানান ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কোন কথা বলাতে না পেরে শেষে সি আই এ-র এক দালাল তাঁকে প্রশ্ন করে, 'কি ভাবছেন এখন ?'

'বিপ্লবের মৃত্যু নেই, এই কথাটাই ভাবছি।' মৃত্যুর আগে এই চে-র শেষ কথা।

এরপর সি-আই এ-র দালালরা রেডিও যোগাযোগ ক'রে আদেশ গ্রহণ করে মার্কিন সরকারের। বেলা দেড়টায় রক্ষীরা ঘরে ঢুকে টমিগান চালিয়ে হত্যা করে ভিলি চিনো আর চে-কে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে চিৎকার করে বলে যায় ভিলি—'আমি গর্বিত—মৃত্যুর সময় আমি চে-র পাশে আছি।'

শরীরে ন-টা বুলেট বেঁধার চিহ্ন, তার মধ্যে দুটো মোক্ষম, তবু সরকারী পক্ষের বালখিল্য দাবী—চে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন! হিগেরা-টা যে যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে সেটা তাঁরা ভুলে গেলেন।

এখন চে তো নিহত হলেন কিন্তু তারপর? কবর দিলে জায়গাটা হয়ে উঠবে বিপ্লবীদের তীর্থ। পুড়িয়ে ফেলা? তারপর যদি কেউ বিশ্বাস না করে যে চে সত্যিই মারা গেছেন। সাধারণ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস 'চে' মারা যেতে পারেন না, ধরা পড়তে পারেন না। অপরাজেয় 'চে' মৃত্যুর পরেও অপরাজেয় হয়ে থাকবেন, এই আতঙ্কে শত্রুরা তাঁর মুখের প্লাস্টার-ছাঁচ তুলে নিল, কনুই থেকে তাঁর দুটো হাত কেটে রেখে দিল! এগুলো প্রমাণ—অনস্বীকার্য প্রমাণ যে 'চে' নিহত হয়েছেন। তাছাড়া তার ডায়েরিটাও রইল। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে :

কিন্তু কথা চাপা রইল না। দু' দিনের মধ্যেই কিউবাতে চে-র মৃত্যু সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হল এবং স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রো ঘোষণা করলেন যে, চে খুন হয়েছেন। ৮ই অক্টোবরকে 'বীর গেরিলা দিবস' রূপে প্রতি বছর পালন করার প্রতিজ্ঞা নেওয়া হল। শুধু তাই নয়, পরের বছর জুলাই মাসে সমস্ত দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে কিউবা ছেপে দিল চে গেভারার 'বলিভিয়ার ডায়রি'। বলিভিয়ার সরকার আর তাদের মার্কিন প্রভুরা প্রচার করল—এটা জাল ডায়েরি'। কাস্ত্রো ফটো দেখালেন মূল ডায়েরির। সি আই এ ঘোরতর বিপদে পড়ল। ডায়েরিটা তারা হুবহু ছাপতে চায়নি, অদলবদল করে ছাপবার জন্যেই দেরী করছিল কিন্তু ডায়েরিটা গেল কি করে কাস্ত্রোর হাতে?

না, শুধু ডায়েরিই নয়, চে-র দুটি হাত, তার মুখের প্লাস্টারের আদল, সবই এসেছিল কাস্ত্রোর কাছে।

ফিদেল কাস্ত্রো যেদিন ডায়রির ব্যাপারটা জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন তার ষোলদিন পরে নিখোঁজ হলেন বলিভিয়ার রাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তনিও আর্গেদাস। তাঁর খোঁজ মিলল চিলিতে। তিনি জানালেন, বেশ কয়েক বছর আগে তিনি ছিলেন সি. আই. এর এক এজেন্ট। কিন্তু বলিভিয়ায় সি. আই. এর মানবতা-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ তাঁর ভুল ভাঙিয়েছে। এই শয়তানদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করাব জন্য ও কৃত কর্মের অপরাধের বোঝা থেকে হালকা হবার জন্য তিনিই চে-র ডায়েরি দুটি হাত ও মুখের ছাঁচ পাচার করেছেন। এই দুঃসাহসী দেশপ্রেমিকের সততা আরো প্রমাণিত হয় পরবর্তী কালে। সবার বাধা সত্বেও প্রাণের আশংকাকে তুচ্ছ করে তিনি ফের ফিরে যান বলিভিয়ায়। নিজের দেশে ইয়াঙ্কী প্রভু সমর্থিত সরকারের আদালতে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, 'হ্যাঁ—আমিই চে-সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র পাচার করেছি এবং করেছি দেশপ্রেমিক হিসাবেই। গেভারা একজন সত্যিকারের বীর। সারা আমেরিকার আদর্শ।' এখানে উল্লেখযোগ্য, আর্গেদাসের সঙ্গে চে-র কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, চে-র সঙ্গে কখনো সাক্ষাত হয়নি তাঁর।

বিচারের পর আর্গেদাসকে এক অজ্ঞাত আততায়ী গাড়ি থেকে গুলি ছুঁড়ে বধ করার চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে প্রাণে রক্ষা পেয়ে তিনি মেক্সিকো দূতাবাসে আশ্রয় নেন ও পরে হাভানায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

বিশ্বের জনসাধারণ আর্গেদাসের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন মৃত্যুর পরেও 'চে'-কে অপরাজেয় রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

কিউবা থেকে বিদায় নিয়ে বলিভিয়ায় যাবার সময় ফিদেল কাস্ত্রো ও সন্তানদের উদ্দেশে চে-র লেখা কয়েকটি চিঠির অনুবাদ সংযোজিত হল এই গ্রন্থে। চিঠিগুলি আনুমানিক ১৯৬৫ এর মধ্যভাগে লেখা।

বিদায়, কিউবা

আর্নেস্টো চে গেভারা

হাভানা (কৃষিকাজের বছর)

ফিদেল, ।

এই মুহূর্তে আমার মন ফিরে ফিরে যাচ্ছে মারিয়া অ্যান্টোনিয়ার বাড়িতে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকারের দিনটিতে। মনে পড়ে যাচ্ছে কেমন ভাবে সেদিন তুমি আমাদের যাত্রার কথা পেড়েছিলে আর সেই যাত্রার তোড়জোড়ের কথা।

একবার আমাদের জিজ্ঞাসা করা হল যদি আমাদের মৃত্যু হয় তবে খবরটা কাকে জানাতে হবে। এরকম পরিণতির সম্ভাবনা যে আছে এই বাস্তব সত্য সেদিন আমাদের সবাইকে বিস্মিত করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে আমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করেছিলাম যে বিপ্লবে (মানে সত্যিকারের বিপ্লবে) হয় তুমি জিতবে নয় তোমাকে মরতে হবে। বিপ্লবের পথে এগোবার সময় বহু প্রাণকে কবর দিয়ে যেতে হয়েছে।

আগের চেয়ে এখন আমরা অনেক বেশী পরিণত-মনেব, তাই যা ভাবি বা করি তার মধ্যে নাটকীয়তা অনেক কম। তবু অবস্থা এখনও সেই একই আছে। যে মহান কর্তব্য আমাকে কিউবার বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করেছিল বোধ করি তা আংশিক ভাবে পালন করতে আমি সক্ষম হয়েছি। ফিদেল, আজ আমি তোমাকে ছেড়ে, আমার কমরেডদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ছেড়ে চলে যাচ্ছি তোমার দেশের মানুষকে, যারা আমারও আপনজন হয়ে উঠেছে।

পার্টি নেতৃত্বে আমার পদটিতে আমি সরকারী ভাবে ইস্তফা দিচ্ছি। মন্ত্রী হিসেবে আমার পদ এবং মেজর পদটিও আমি পরিত্যাগ করছি এবং পরিত্যাগ করছি কিউবার নাগরিকত্ব। সরকারী ভাবে কিউবার সঙ্গে কোন সম্পর্কই আর আমার রইল না। তবে ভিন্ন

ধরনের যে সম্পর্ক অবশ্যই রইল যা আমার এই সব পদের মতো পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।

পেছনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করছি যে যতখানি সম্ভব সততার সঙ্গে একনিষ্ঠ ভাবে বিপ্লবের বিজয়কে সুদৃঢ় করবার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। আমার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল, সিয়েরা মিয়েস্ত্রায় প্রথম মুহূর্ত থেকে যে বিশ্বাস তোমার ওপর আমার ছিল তার চেয়ে আরো অনেক বেশী বিশ্বাস আমার থাকা উচিত ছিল। একজন নেতা ও বিপ্লবী হিসেবে তোমার গুণগুলো নিরূপণ করার ক্ষেত্রে আমি অনেক দেরী করেছি। এক স্মরণীয় কালের মধ্যে আমি জীবন কাটিয়েছি আর তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমি গর্ব অনুভব করেছি যে ক্যারিবিয়ান সংকটের সবচেয়ে অগ্নিগর্ভ এবং দুঃসহ দিনগুলোতেই আমি আমার জনসাধারণের সঙ্গে থেকেছি। রাজনীতিবিদ হিসেবে তুমি যে অনন্য প্রতিভার অধিকারী সে সময়েই তার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছিল। আমি এজন্যেও গর্বিত যে সেদিন আমি নির্দ্বিধায় তোমাকে সমর্থন করেছি। এবং চিন্তাধারা ও মতাদর্শ এবং বিপ্লবের মন্দ দিকটির ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিন্ন।

বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য কিছু অংশে আমার সামান্য সহযোগিতার প্রয়োজন পড়েছে। যে কাজ এই অবস্থায় আমি করতে পারি তা তোমার পক্ষে করা সম্ভব নয়, তার কারণ কিউবার এক মহান দায়িত্বভার এখন তুমিই বহন করছ। কাজেই তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এবার এসেছে।

তুমি নিশ্চয় বুঝবে যে এই চলে যাওয়ার জন্যে আমি একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করছি। সংগঠক হিসেবে আমার উজ্জ্বলতম আশাগুলি ত্যাগ করে, আমার সবচেয়ে প্রিয় জনসাধারণকে ত্যাগ করে আমি চলে যাচ্ছি। ছেড়ে চলে যাচ্ছি এমনই এক দেশের জনগণকে যাঁরা আমাকে তাঁদের সন্তানের মতো গ্রহণ করেছিলেন।

এই বিচ্ছেদ আমার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে। নতুন এক রণক্ষেত্রে যোগ দিতে যাবার সময় আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি সেই বিশ্বাস যা একদিন তুমি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলে। সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি আমার আপনজনেদের বৈপ্লবিক চেতনা আর এই সচেতনতা যে আমি আমার পবিত্রতম কর্তব্য পালন করেছি, অর্থাৎ যেখানেই সাম্রাজ্যবাদ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এই বোধ আমার প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় করে তুলেছে…কষ্ট যা পেয়েছি তাকে অনেক গুণ পুষিয়ে দিয়েছে।

আমি আবার বলছি, অন্যের সামনে আদর্শ হওয়া ভিন্ন আমার এই সিদ্ধান্তের জন্য কিউবার কোন রকমই দায় দায়িত্ব নেই। আব আমি যখন অনেক দূরে থাকবো সেদিন যদি আমার শেষ সময়টি এসে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্তেও আমি ভাববো আমার এই দেশের মানুষের কথা, বিশেষ করে তোমার কথা। তুমি আমাকে যা শিখিয়েছ, যে উদাহরণ আমার সামনে তুলে ধরেছ তার জন্য তোমাকে জানাই আমার ধন্যবাদ। ফিদেল আমি শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে চেষ্টা করবো। বরাবরই আমি আমাদের বিপ্লবের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত রেখেছি, আজও তা অক্ষুন্ন রয়েছে। যেখানেই যাই কিউবান বিপ্লবী হিসেবে আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন থাকবো এবং সেই ভাবেই কাজ করে যাবো। আমার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের একেবারে নিঃস্ব করে রেখেই আমি চলে যাচ্ছি, তবু এ চিন্তা আমাকে কোন রকম ভাবেই বিপর্যস্ত করছে না। বরং ঠিক এমনটি হওয়াতেই আমি খুশী। ওদের জন্যে আমি কিছুই চাইনি…কারণ রাষ্ট্র ওদের যা দেবে তা ভরণ পোষণের ব্যাপারে এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে যথেষ্ট।

তোমাকে ও আমাদের জনসাধারণকে আরো অনেক কথাই লিখতে পারতুম কিন্তু আমার মনে হয় তা অতিশয়োক্তি হবে। যা

আমি প্রকাশ করতে চাই ভাষায় তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, শুধু শুধু কাগজ নষ্ট করে কোন লাভ নেই।

"Hasta la Victoria Siompre ! Patria o Muerte !"*

(অল্‌ওয়েজ ফর ভিক্‌টরি ! হোমল্যাণ্ড অর্ ডেথ !)

সত্যিকার বিপ্লবী আগ্রহ নিয়ে তোমাকে আমি আলিঙ্গন জানাচ্ছি।

"চে"

"আমার মা ও বাবাকে"

আমার প্রিয় বুড়ো মানুষরা (গুরুজনেরা),

আবার আমি রেজিল্যাণ্ডের পাঁজরগুলোর ওপর পা ফেলেছি, আবার আমি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছি।

প্রায় দশ বছর আগে আমি তোমাদের আরেকটা বিদায় পত্র লিখেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে আরো ভালো সৈনিক ও আরো ভালো ডাক্তার হতে না পাবার জন্যে আক্ষেপ করেছিলাম। শেষ ব্যাপারটা আমাকে আর আকর্ষণ করে না, কিন্তু এখন আর আমি সৈনিক হিসেবে খুব একটা খারাপ নই।

তারপর থেকে মূলতঃ কিছুই পরিবর্তিত হয়নি, হয়েছে শুধু এটাই যে আমি এখন আরো সচেতন, আমার বিশ্বাস দৃঢ় শিকড় গেড়েছে এবং পরিশুদ্ধ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যেসব মানুষ নিজেদের মুক্ত করার জন্যে লড়াই করছে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন ফাঁক নেই। অনেকে আমাকে অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বলবে। কথাটা ঠিকই। কিন্তু আমি এক বিশেষ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান করি। আমি তাদেরই একজন যারা নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তাদের নির্ভুলতা প্রমাণ করতে চায়।

হয়তো এই আমার শেষ প্রচেষ্টা। আমি সেরকম কোন

---

* কিউবান বিপ্লবের শ্লোগান

সমাপ্তির জন্য উদগ্রীব নই। কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্যভাবে এটা সম্ভাবনার সীমার মধ্যেই রয়েছে। তাই যদি হয় তবে তোমরা আমার এই শেষ আলিঙ্গন গ্রহণ করো।

আমি তোমাদের চিরদিনই খুব ভালবেসেছি। কিন্তু ভালবাসা প্রকাশ করতে পারিনি। আমার সরাসরি ব্যবহারের জন্যে মনে হয় কখনো কখনো লোকে আমায় ভুল বুঝেছে। তাছাড়া আমাকে বোঝাও সহজ ছিল না। এবার কিন্তু তোমরা আমার মুখের কথাই বিশ্বাস করে নিও। আমার প্রতিজ্ঞাকে একজন শিল্পীর একাগ্রতা নিয়ে আমি নিখুঁত করে তুলেছি, এবার সেই মনোবল আমার দুর্বল পা আর ক্লান্ত ফুসফুসকে ঠেলে দিচ্ছে কাজের মধ্যে। আমি আমার পরিকল্পনা কার্যকরী করবো। মাঝে মধ্যে বিংশ শতাব্দীর এই দীন ভাগ্য কবে আসা সৈনিকের কথা ভেবো।

সিলিয়া, রোবার্তো, জুয়ান মার্তিন, পোতোতিন, বিয়েত্রিস এবং সবাইকে আমার ভালবাসা দিও।

তোমাদের অবাধ্য ছেলের কাছ থেকে তোমাদের জন্য উত্তপ্ত আলিঙ্গন রইল—

“আর্নেস্টো”

প্রিয় হিলদিতা,

আজ তোমাকে যে চিঠি লিখতে বসেছি তা তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে অনেক দিন পরে। মনে রেখ আমি তোমার কথা ভাবছি। আশা করছি তুমি তোমার জন্মদিনে খুশী হয়ে উঠবে। তুমি এখন প্রায় মহিলা হয়ে উঠেছ, তাই কতকগুলো অর্থহীন আবোল-তাবোল শব্দ ভরিয়ে নিছক একটি শিশুসুলভ চিঠি তোমায় লিখতে পারি না।

একথা তোমার অবশ্য জানা প্রয়োজন যে আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছি এবং এখানে দীর্ঘদিন আমায় থাকতেও হবে। কারণ আমাকে আমার সর্ব শক্তি নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যদিও আমার এই অবদান তেমন কিছু নয়, তবু তার

প্রয়োজন আছে। আশা করি তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে গর্ব অনুভব করবে ঠিক যেমন আমি তোমাকে নিয়ে করি।

মনে রেখ সামনে আরো অনেক বছর লড়াই রয়েছে। এমন কি তুমি যেদিন বড় হয়ে উঠবে, সেদিন তোমাকেও এই লড়াই-এ সামিল হতে হবে। এর মধ্যে তুমি অবশ্যই একজন সাচ্চা বিপ্লবী হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করবে। তার মানে হল এবার থেকে তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে পড়াশুনো করতে হবে। ন্যায়ের পক্ষ সমর্থনে সর্বদা তৈরী থাকবে। তাছাড়া তুমি সব সময় তোমার মায়ের কথা শুনবে এবং নিজের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা রাখবে না। সময় মতোই তা আসবে।

স্কুলে সবচেয়ে ভালোদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে। সবচেয়ে ভালো বলতে সব দিক দিয়েই ভালো। তুমি নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি—পড়াশোনা এবং বিপ্লবী আচরণ বা অন্যভাবে বললে, কাজের ব্যাপারে দায়িত্ববোধ, মাতৃভূমি এবং বিপ্লবের প্রতি ভালোবাসা, কমরেডশিপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

তোমার বয়সে আমি এরকম ছিলাম না, কিন্তু আমি বড় হয়েছিলাম ভিন্ন এক সমাজে, যেখানে মানুষ ছিল মানুষের শত্রু। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি ভিন্ন এক সময়ে বাস করার সুযোগ পেয়েছ। তোমার উচিত এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

মাঝে মাঝে তোমার ছোট ভাইবোনদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে ভুলবে না। তারা যাতে সুন্দর স্বভাবের অধিকারী হয়, অধ্যয়নে পরিশ্রমী হয় সেই উপদেশ দেবে। আর সবচেয়ে বেশী নজর দেবে তোমার ছোট এলাইদিতার প্রতি, যে বড় দিদি হিসেবে তোমার দিকেই শ্রদ্ধাভরে চেয়ে আছে।

ঠিক আছে মহোদয়া, আবার বলি তোমার জন্মদিন শুভ হোক। তোমার মা জিনাকে আমার আলিঙ্গন জানিও আর তোমার আমার

এই বিচ্ছেদের পুরো সময়টা জুড়ে রইল এই বিরাট উত্তপ্ত আলিঙ্গনটা—

তোমার বাবা

"আমার ছেলেমেয়েরা"

প্রিয় হিলদিতা, এলাইদিতা, ক্যামিলো, সিলিয়া এবং আর্নেষ্টো,

যদি কোনদিন তোমরা এই চিঠি পড়ো তাহলে বুঝবে আমি আর তোমাদের সঙ্গে নেই।

আমার সম্বন্ধে তোমরা খুব বেশী স্মরণ করতে পারবে না, বিশেষ করে ছোটরা তো কিছুই মনে করতে পারবে না।

তোমাদের বাবা ছিল এমন একজন মানুষ যে তার মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করে গেছে এবং নিশ্চিতভাবে তার বিশ্বাসে স্থির থেকে জীবন অতিবাহিত করেছে।

অবশ্যই তোমরা সাচ্চা বিপ্লবী হয়ে বড় হয়ে উঠবে। অধ্যয়নে পরিশ্রমী হবে এবং সেই কারিগরী বিদ্যা তোমাদের দখলে আনতে হবে যার সাহায্যে প্রকৃতিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই। যে কথাটা সবচেয়ে বেশী মনে রাখা প্রয়োজন তা হল—বিপ্লব। ব্যক্তি হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই খুবই তুচ্ছ।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পৃথিবীর যেখানেই অন্যায় সংঘটিত হক না কেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের গভীর অনুভূতি যেন সদা জাগ্রত থাকে। একজন বিপ্লবীর এই গুণটিই সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয়।

বিদায় আমার সন্তানগণ···আশা রাখি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

তোমাদের জন্য রইল তোমাদের বাবার বিশাল একটা চুমু আর প্রবল আলিঙ্গন—

অনুবাদ ॥ রমা ভট্টাচার্য

মুনীর চৌধুরী

১৯২৫ সালে ঢাকার মাণিকগঞ্জে জন্ম। আদি নিবাস নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানাধীন গোপাইর বাগ গ্রাম। ১৯৪৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স সহ বি. এ, ১৯৪৭ সালে ইংরাজীতে এম. এ এবং ১৯৫৪ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ. পাশ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পাশ করেন।

খড়ম

মুনীর চৌধুরী

মসজিদের সামনে একজোড়া খড়ম। রাত্রির অন্ধকারে এশার নামাজের পর একে একে সবাই চলে গেছে, সবার শেষে গেছে সবচেয়ে পরহেজগার ফজু ব্যাপারী। মজবুত খড়ম জোড়া তারই। সারাদিন পায়ে থাকে। অজু করা দেহ মাটির স্পর্শ পায় শুধু এই এশার নামাজের পর। রাত্রির অন্ধকারে একমাত্র খড়ম থেকে পৃথিবীতে নামে ফজু ব্যাপারী। সমস্ত দিনের মধ্যে নোংরা মাটি অজু নষ্ট করবার মত সুযোগ পায় এই প্রথম।

সাড়ে চার টাকা দরে ধানের মণ কিনে সওয়া চার টাকা দরে বিক্রি করেও নেকবখত আলেম ফজু ব্যাপারীর মণ প্রতি চার আনা লাভ থাকে। সাধারণের কাছে এ রহস্যের সমাধান অসম্ভব। এমন কি গ্রামের মাতব্বররাও এ বিষয়ে কোন দিনও বিশেষ গবেষণা করতে সাহসী হননি। খোদার যে প্রিয় বান্দা, খোদার রহমতে তার ভাগ্য অনেক রকমেই খুলতে পারে। গ্রামবাসীরাও তাই বিশ্বাস করতো। পাক শরীরে, পাক মনে হালাল রোজগারের চেষ্টা করলে খোদা তার উন্নতি না করেই পারেন না। সমস্ত দিনের মধ্যেই সব সময়ে পাক থাকতেও তারা দেখেছে ঐ একমাত্র ফজু ব্যাপারীকেই। চালের বস্তার পাশে চৌকির ওপর পাল্লা সামনে সারাদিনই তো ফজু ব্যাপারী ওখানে বসে থাকে অথচ অজু নেই, এমন কথা কোন ক্রেতাই কখনও বলতে পারবে না। যদিই বা এক আধবার পায়খানা-পেসাব করবার জন্য তাকে উঠতে হয় তবু আবার দোকানে এসে বসবার আগেই অজু করে এসে বসা চাই। মেটে রংয়ের পরিচ্ছন্ন খালি গায়ে ফর্সা লুঙ্গি পরে। মাথায় বাঁশের পরিচ্ছন্ন টুপী পরে হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ধরে দাঁড়ি পাল্লা। হাঁ করে ক্রেতার দল দেখে কি করে অবলীলাক্রমে এক হাতের টানে

পাল্লাটা ওপরে উঠে যাচ্ছে। একদিকে আধমণি বাটখারা, অন্যদিকে আধমণ ওজনের ধান। একটুও হাত কাঁপছে না নড়ছে না। সাদা দাড়ি কেঁপে উঠেছে, কাঁধে পিঠের পেটানো মাংসপেশীগুলো থরে থরে ফুলে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়, পেছনের সুসজ্জিত চালের বস্তার খয়েরী পাহাড়ের মত। পঞ্চাশ বছরেও অস্থিমাংসের এই অদ্ভুত বলিষ্ঠতা, এ শুধু খোদার হুকুমেই সম্ভবপর। পাক, নেক লোকই এ শক্তির অধিকারী হতে পারে। কেউ কেউ তাই চালের বস্তা নিয়ে যাবার আগে ভক্তির আবেগে কদমবুছিও করে ফেলে। ঘুণাক্ষরেও ফজু ব্যাপারীকে সন্দেহ করার মতো পাপ চিন্তা ওরা মনের মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। কোনদিন চালের বস্তা দ্বিতীয়বার ওজন করে তার ওজনের পরিমাপ পরীক্ষা করে দেখবার অসম্ভব কল্পনা ওদের মনে জাগেনি। আর যদিই বা দেখত, আর যদিই মাপে সে কম ধরা পড়তো—তখন ওরা হয়তো নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস করতো··· কিন্তু ফজু ব্যাপারীকে—!

হাট খোলার মধ্যিখানে বিরাট একটা বটগাছ। কচি সবুজ পাতা ভোরের কাঁচা আলোতে ঝলমল করছে। সাদা, ঠাণ্ডা, আঠাল মাটিতে গতদিনের হাটের ভাঙা গুড়ের হাঁড়ির টুকরো, বারীদের ফেলে যাওয়া হলদে শুকনো কলাপাতা, শিশিরে ভেজা খড়ের দলা। এমনি আরো বহু ছোটখাট ময়লা এখানে সেখানে জড় হয়ে রয়েছে। সূর্য তখনও পুরোপুরি ওঠেনি। মতি ডাক্তারের ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ। উল্টো দিকের বেনে দোকানের মালিক বসির উল্লা কারী শুধু তার দোকানের সামনের জায়গাটুকু ঝাড় দিয়ে ঘরের ঝাপি তুলে, সুপুরী গাছের তক্তার মাচায় বসে সুর করে কোরাণ শরীফ পড়ছে। পাকা বটফলের গোটা খেয়ে বটঘুঘুর ঝাঁক তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। স্বল্প সূর্যের আলোয় ওদের নরম পাখা তেতে উঠেছে। পত্ পত্ করে হলুদ মাখান ছাই রংগা পাখীগুলো ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

কাঠের পুলের ওপর দিয়ে খড়ম ঠুকে খালের ওপার থেকে ফজু ব্যাপারী আসছে। পুলের মধ্যিখানে একবার নেমে নিয়মিত গলায় জিজ্ঞেস করল—

: কৌগা হাইলি আইজ?

: অতনাই ছৌগা।

পুলের নীচ থেকে উত্তর দিল কালা মাঝি। মাথার উপর লুঙ্গি জড়ানো উলঙ্গ বলিষ্ঠ দেহ নাভি পর্যন্ত পানির মধ্যে, দুহাত দিয়ে কাঁটাঝোপ সরিয়ে একটা বাঁশের 'আন্তা' তুলছে। আর তার মধ্যে একটা এক বিঘত লম্বা শ্যাওলা পুষ্ট চিংড়ি মাছ ছপ্‌ছপ্‌ করে লাফাচ্ছে। মনে মনে কালা একবার ব্যাপারীকে ছালাম করল। নেক লোককে দেখলেও বরাত ফেরে। বাকী 'আন্তা'টা দেখে ঠিক করে কালা লুংগি জড়িয়ে উঠে পড়ে। আটটা চিংড়ি হয়েছে। কিন্তু শুধু চিংড়ি মাছ দিয়ে কি হবে? অসুখে পড়া মেয়েটা কি খাবে? আগুনে পুড়িয়ে মরিচ দিয়ে সে নিজে না হয় এক বেলা চালিয়ে দেবে, কিন্তু মেয়েটা? একটা চিংড়ি হঠাৎ তার মৃত প্রায় লম্বা ঠ্যাংয়ের চিমটি দিয়ে কালার হাতের গোশত কেটে বসিয়ে দেয়।

মেয়েটার ক্ষুধার চিৎকার ভোর রাতে তার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে। বৌকে সে তাই লাথি মেরে ঘর থেকে বেরিয়েছে। বেরিয়েই মনে হয়েছে লাথিটা তার নিজের গায়েই মারা উচিত ছিল। বুকে দুধ থাকলে আরফাণী মেয়েটাকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু না থাকলে? মায়ের গোশত মেগে খেলে, বোধহয় তাও পারতো। কালা শিউরে ওঠে। আরফাণীর বিয়ে হয়েছে মাত্র বছর চারেক হবে, কিন্তু ওর বুকের দিকে চাইলে কালার নিজের বুকই কেঁপে ওঠে। কেমন যেন বাদুড়ের মতো কুঁক্‌ড়ে চেপ্টে আছে!

: বেগগুন কি ইছা নিরে?

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করল মতি ডাক্তার। কালা মাথা নাড়ল রোজকার মতো ভয়ে ভয়ে। মতি ডাক্তার কি বলবে

তা সে জানত। শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। চিংড়ি মাছ নাকি পানির পোকা, ওতে রক্ত নেই। চিংড়ি মাছ ক্রমাগত বেশী খেলে নাকি রক্ত সাদা হয়ে যায়, রক্তে পোকা হয়—কিন্তু তার ওই "আস্তায়" এ সময়ে খালে যে চিংড়ি ছাড়া আর কিছুই উঠে না। সে কি করবে।

: কাইল যে তোর মাইয়ার লাই কুইলাইন মিচকার দিলাম হেইডার হেয়সা কৈরে কালা?

বলতে বলতে মতি ডাক্তার ওর হাতের খলুই থেকে গোটা চারেক বাছাই করা বড় চিংড়ি তুলে নিয়েছে। ভ্রু কুঁচকে মাছগুলোকে নিরীক্ষণ করে সে বলতে থাকে—

: এক ছার গুড় গুড়া এনা। তা আ কাইল আরও চাইরগা দিছ, হেইলেই সাইরব।

বলে ডাক্তারখানার মধ্যে পা বাড়ায়। কালা কোন রকমে উচ্চারণ করে—

: ডাগদর সাব, আঁর মাইয়া বাঁইচব ত?

ডাক্তার মুখ খিঁচিয়ে উঠে—

: বাঁইচত ন' ক্যা? বাঁইচব। খোদা বাঁচাইলে বাঁইচত ন' ক্যা।

কালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

: হাকৃকরি চাই রইছত ক্যা? খাওয়া, দাওয়া। খাওয়াইলেই মানুষ বাঁচে বুঝ্যত? তোর মাইয়া বাঁইচব।

কালার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে। সে টলতে টলতে সরে যায়। ডাক্তার তখনও গর গর করছে—

: বাঁইচত ন ক্যা? বাঁচে কিন্তু ক্যাল আঁর কুইনাইনের হানি আর ইছা খাই বাঁচে না।

দুহাত দিয়ে কালা দুকান চেপে ধরে। শেষেরটুকু সে শুনতে চায় না। নিজে জানলেও ডাক্তারের মুখে সে কথা শুনতে চায় না। একবার ইচ্ছা হয় এমন কথা বলবার আগে বাকী চিংড়ী ক'টাও ছুঁড়ে

মারে ডাক্তারের মুখে। চিংড়িগুলো সে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবে না। বৌকে সে আজ খেতে দেবে, মেয়েকে সে আজ খাওয়াবে—সাদা চিংড়ি নয়, সাদা চাল, সাদা দুধ। যা খেলে মানুষ বাঁচে, রক্ত লাল হয়।

হঠাৎ ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের দিকে চোখ পড়তেই সে আঁৎকে উঠল। কেরোসিন টিনের দোকানের কালো বেড়ার ওপর চুন দিয়ে লেখা—"এখানে মণ্ডতের কাপড় বিক্রী হয়।" ছোট কালেব বাড়ীর পাঠশালায় শেখা বিদ্যার উপর ও যথেষ্ট নির্ভর করতে পারে না। ফজু ব্যাপারীর চালের আড়তে মণ্ডতের কাপড় অর্থাৎ কাফনের কাপড়—কবর দেয়ার আগে যে কাপড়—

ভেতর থেকে দেখতে পেয়ে ফজু ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে—

: চাই রইছস্ ক্যা ? লাইগব নাকি কোনডা ?

: না, না।

কালা কোন রকমে চীৎকার করে উঠে।

: তোর মাইয়া ভালা নিরে আইজ ?

: আইন্তেগো দোয়া, আইন্তেগো দোয়া—বলতে বলতে কালা ছুটে হাটখোলা থেকে বেরিয়ে যায়। যাদের স্বাস্থ্য সুন্দর, যাদের পরণের কাপড় পরিষ্কার, 'অজুতে' পাক—তাদের কাছ থেকে কালা পালিয়ে বাঁচতে চায়। ফজু ব্যাপারীর মুখে তার মেয়ের অসুখের খোঁজ থেকে সে ত্রাণ পেতে চায়।

চাল না নিয়ে আজ সে বাড়ী ফিরবে না—এ সমস্যার সমাধান হল মুন্সী বাড়ীর বৈঠকখানায়। আধকানি জমি যদি সে নিড়াতে পারে তবে দেড় টাকা পাবে। তাও খোরাকী ছাড়া। কালা রাজী।

সকাল গড়িয়ে দুপুরের রোদ মাথার উপর তেতে উঠে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে, প্রায় হাঁটুজল ময়লা গাঁজাল পানিতে দাঁড়িয়ে কালা

আগাছা উপড়ে চলেছে। রোদে পুড়ে পিঠের চামড়া চড়্ চড়্ করছে। হাতের টানে এক আধ ফোঁটা পানি তাই গায়ে পড়লে সারা গা শির শির করে উঠে। মনে হয় যেন জ্বর আসছে, কাঁপুনি দিয়ে।

দু'দিনের অভুক্ত পেট। দু'রাত চালের দুঃস্বপ্ন দেখা চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। কচি ধানের সবুজ আর ঘাসের তামাটে সবুজ সব ওলট-পালট হয়ে যায়। ঘাস টানতে ধানের গোছা উপড়ে ফেলছে। দু'হাতে রগ টিপে কালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ মেলে দেখে সামনের সীমাহীন বাকী জমিটুকু। সবুজ জল-ফড়িংগুলো নাড়া পেলেই লাফাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মনে হয় আজ না জুম্মার দিন? জুম্মার নামাজ তো সে কখনও বাদ দেয়নি। আজ সে নামাজ পড়বে, আজ তার জীবনে উৎসব। আজ সে টাকা দিয়ে চাল কিনবে, দুধ কিনবে। রাস্তার উপরে এসে কালা আচমকা থেমে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠে। নিজের ভুলে নিজেই ও হেসে ফেটে পড়তে চায়। বাড়তি লুংগি তার শেষ হয়েছে যেদিন থেকে সরকারের পেয়াদা এসে তার কেরায়া নৌকা পঁচিশ টাকা আর ভবিষ্যতের অনেক প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পরণে লুংগিটা পরেছে একধারে হপ্তা-তিনেক ধরে। লুংগি পাক থাকবে কি করে? সে তো আর ফেরেস্তা নয়? আর বৌ-এর সঙ্গে সে তো ল্যাংটা হয়ে সংসার করতে পারে না যে রোজ ভোরে গোসল সেরে পাক লুংগি পরে সে ঘর থেকে বেরুবে? হাসতে হাসতে মুখ নীল হয়ে উঠে। আরো কালো হয়ে উঠে যখন অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেল তার বৌ আরফানী চীৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। পিছনে ছুটতে ছুটতে আসছে ফজু ব্যাপারী আর গ্রামের দু-চারজন গণ্যমাণ্য লোক। আরফানীর কাপড়ের বাঁধনে বাঁধনে না আছে

ইজ্জত, না আছে আব্রু। কালা মাঝির চোখের সামনে সমস্ত দিগন্ত জুড়ে হা হা করে, কানফাটা আর্তনাদ করে ছুটে আসছে।

কিছুই হয়নি। দিন চারেক ধরে অনবরত কেবল কয়েক ফোঁটা করে কুইনাইন মিক্সচারে বেঁচে থেকে এই ভোরবেলা কালার মেয়েটা ছটফট করে মরে গেছে।

ঘরের দাওয়ায় কালা গুম হয়ে বসে আছে। দুহাতে মাথা গুঁজে পায়ের দিকে মরা চোখে চেয়ে দেখে সেখানে একটা জোঁক অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চুষে পেট ফুলে উল্টে পড়ে আছে। সেই একটুখানি ক্ষীণ রক্তস্রোতের চারপাশের চামড়া পচা পানিতে ভিজে কেমন যেন সাদা আর ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া। ঘরের ভেতর থেকে আরফানী থেকে থেকে গোঙায়—

ঃ আঁই ভাত খাইয়ুম। আঁই মইত্তামন, আঁই মইত্তামন, আঁই ভাত খাইয়ুম।

কালা পা'টা একবার নাড়ে। দেখে নড়ে কিনা, মারবার জোর আছে কিনা। ফজু ব্যাপারী চলে গেছে। ফজু ব্যাপারীই দয়া করে সব করে গেছে। মায় নিজের দোকান থেকে কাফনের কাপড়-টুকু অবধি ধার দিয়েছে। যাবার সময় শুধু আরফানীকে বলে গেছে—কাফনের কাপড় ধার রাখা গুনাহ্। ওতে মুর্দার রূহ কষ্ট পায়। কাফনের বাবদ বাকী তিন টাকা তাই যেমন করেই হোক কাল ভোরেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আরফানী আবার কাতরাচ্ছে।

ঃ আঁই মইত্তামন, আঁই মইত্তামন, আঁই মইল্লে আঁরও কাফনের কাপড়ের দাম বাকী থাইকব। আঁই—

কালার পা মাথা সব ভারী হয়ে আসছে। কিছুই আর নড়তে চায়না। কানের কাছে আরফানীর অসংলগ্ন বিলাপ ওর স্নায়ুতন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করে আনতে চায়। কোন রকমে দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে একবার ঘরের দুয়ার অবধি আসে, তারপর সন্ধ্যার আবছা আঁধারে

পথ হাতড়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে কালা চলতে শুরু করে দেয়। দু' চোখ আটাল হয়ে বুজে আসে একটা অদ্ভুত ক্লান্ত শ্লথ ঘুমে।

বৃষ্টির ছাঁট লেগে যখন চোখ মেললে তখন দেখে চারদিকে ঘোর অন্ধকার। খালপাড়ের মরা তালগাছটার গোড়ায় মাথা দিয়ে সে শুয়ে। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। শুয়ে শুয়েই সব কথা মনে করতে লাগল। হাত পা সব ব্যথায় টনটন্ করছে।

মস্‌জিদের কাছে এসে হঠাৎ কি মনে করে তার সামনে বসে পড়ল। তক্তার আর মাটি সিঁড়ির সামনে। এশার নামাজও তখন শেষ হয়ে গেছে। সকলে চলে গেছে। সামনের সিঁড়ির ওপর একজোড়া খড়ম। শক্ত। বড়। ফজু ব্যাপারীর বলিষ্ঠ পায়ের দাগ। মসৃণ কাঠের উপর আরো কালো হয়ে ছাপ পড়েছে। পানি আর চামচার ঘষায় সে সুস্পষ্ট দাগের গর্ত থেকে আঙ্গুলগুলো স্পষ্ট গোণা যায়। গুণতে গুণতে কালা মাঝির চোখ জ্বল জ্বল করে উঠে : আঁই মাইত্তামন, আঁই মাইত্তামন।

নিঝুম রাত্রির আঁধারে পা টিপে কালা মাঝি ফজু ব্যাপারীর চান্দের দোকানের পিছন দিকের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা টিন নিঃশব্দে টিপে দেখছে কতখানি মজবুত। সড়াৎ করে সে হাতটা সরিয়ে নিল। ভেতরে যেন কারা আছে। কারা যেন নড়ছে। কালা কান পেতে টিনের সাথে চেপে ধরে, ধানের রেঁায়া রেঁায়া গন্ধ এসে কালার স্নায়ু বিবশ করে দিচ্ছে, আর ভেতর থেকে দ্রুত নিঃশ্বাস স্পন্দিত শব্দ।

: আহ! করস কি, এমুই সরি আয়। কাফনের উপর ছুচ্ছুত ক্যা? এমুই কাইত্যাই আয়।

খিল খিল করে একটা মেয়ে হেসে ওঠে—

: কাফনের কাপড় হি-হি হি-হি—বাঃ হেমুই যে আবার তঁর চাইলের বস্তা। অ'াই ইয়ানেই হুইত্তম, চাইলের বস্তার লগে ঠেস দিলে আর ডর কইত্ত না, হি-হি হি-হি।

আরফানীর বিকৃত হাসির কাকলিকে নিষ্পেষিত করে গর্জন করে উঠে ফজু ব্যাপারীর স্ফীত নাসার তপ্ত প্রশ্বাস।

পরের দিন ভোরের বেলায় বটঘুঘুর ঝাঁক যখন রোদের আঁচ পাওয়া মাত্র উড়ে চলে গেছে, যখন সদ্যস্নাত শান্ত সৌম্য ফজু ব্যাপারী তার দোকানে এসে বসেছে, তখন ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল কালা মাঝি। কোমর থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ফজু ব্যাপারীর সামনে রাখল। পরিচিত নোটের ভাঁজে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ফজু ব্যাপারী প্রশ্ন করল—

: কাফনের বাকী দিতে আইলা বুঝি বাবা।

: জি।

: আর কি দিউম? কিছু চাইল?

: না বাকী ট্যায়া দিয়া কাফনের কাপড় দেন।

চমকে উঠল ফজু ব্যাপারী।

: কাফনের কাপড়! কার লাই?

: আরফানীর লাই।

চমকে উঠেছিল শুধু এক মুহূর্তের জন্য—তারপরই ফজু ব্যাপারী পরিচ্ছন্ন হাতে কাপড় কাটতে শুরু করে, সাদা কাপড়, প্রমাণ মাপের স্ত্রীমুর্দাকে আগাগোড়া মুড়ি দেবার জন্য যতখানি দরকার।

জহির রায়হান

জন্ম ১৯৩৩শে, নোয়াখালি জেলার মজুপুর গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স সহ বি. এ পাশ করার পর চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এই পর্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় ছায়াছবি 'জীবন থেকে নেয়া' এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লিখিত প্রামাণ্য চিত্র 'Stop Genocide'।

কফিনের নীচে এক টুকরো উষ্ণ মাংস

জহির রায়হান

মানুষ হচ্ছে একটা ইচ্ছার নাম।
যার জন্ম আরেকটি ইচ্ছার অঙ্কুর থেকে।
যার জীবন তার এই ইচ্ছার ক্রীতদাস।
আর ইচ্ছা হলো এক সীমাহীন শূন্যতা।
যার ইতি নেই। যতি নেই। আকার নেই।

আমার কি যেন হয়েছে। রোজ ভাবি ডাক্তার দেখাবো। তাকে খুলে বলবো সব। কিন্তু কি যে বলবো কিছু ভেবে পাইনে। রাতে আমার ঘুম হয় না। একটুও না। মাঝে মাঝে হয়তো তন্দ্রা আসে। পরক্ষণে চমকে জেগে যাই। একটা দুঃস্বপ্ন আমাকে পেয়ে বসেছে। চোখ বুজলেই সেটা দেখি।

দেখি, আমি মরে গেছি। আর আমার মৃতদেহটা কফিনে আবৃত করে একটা খাটিয়ায় রাখা। চারটে লোক। চারজন মানুষ সেটাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে গোরস্থানের দিকে।

রোজ দেখি।

রোজ রাতে ঘুমুতে গেলেই দেখি।

অনেক কাঁদাকাটি করে বাবাকে চিঠি লিখেছি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু বাবা এখনো এলেন না।

মাকে লিখেছি।

মা নিরুত্তর।

হয়তো ওঁরা রাগ করেছেন আমার ওপর। কিম্বা আমাকে ভুলে গেছেন। মাগো, বাবাগো। আমি যে তোমাদের সেই ছোট্ট মেয়ে ইতু। যাকে তোমরা কোলে পিঠে করে মানুষ করেছো। কত স্নেহ করতে। আদর করতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মাগো, বাবাগো।

আহা, আমার সেই ছেলেবেলা।

ছেলেবেলার দিনগুলো মনে পড়ছে এখন।

ইচ্ছের পরে ঘুরে বেড়াতাম। পাড়ার দোকান থেকে লজেন্স কিনে খেতাম। দোকানীরা খুব ভালবাসতো আমায়। মাঝে মাঝে ছু একটা ফাউ খেতে দিতো।

মা আমার কোমরে একটা কালো সুতো বেঁধে তার সঙ্গে কয়েকটা তামার পয়সা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। হাঁটার সময় পয়সাগুলো টুং টাং শব্দ করতো। বেশ লাগতো আমার। সারাক্ষণ নাক দিয়ে সর্দি ঝরতো। আঙুল দিয়ে টেনে টেনে সেগুলো খেতাম আমি। মা দেখতে পেলেই ভীষণ বকুনি দিতেন। বেড়ার সঙ্গে ঝোলান বাঁশের ছড়িটা নিয়ে ক'ষে ছু'ঘা বসিয়ে দিতেন পিঠের ওপর।

বলতেন, কতদিন নিষেধ করেছি।

আমি কাঁদতাম।

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়তাম। আর হয়তো ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতাম। বাড়ির পেছনের পেয়ারা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে পেচ্ছাব করছি। পেচ্ছাব করে সারা বিছানাটা ভাসিয়ে দিয়েছি ততক্ষণে।

আমরা গরীব ছিলাম। অনেক ছুঃখ কষ্টে সংসার চলতো আমাদের। বাবা কি যে করতেন জানিনা। বলতেন ছোটখাট ব্যবসা করছেন। কখনো রোজগার হতো। কখনো হতোনা। আরো ছুটি বোন ছিল আমার। রুনী আর বিথী। বয়সে আমার চেয়ে বড়ো।

আমি, রুনী, বিথী আর বাবামা এইতো ছিলো আমাদের সংসার।

বাবাগো। মাগো। আমি তোমাদের মেয়ে ইতু। ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। একটু খোঁজও নিলেনা।

আহা আমার সেই অতীত। কৈশোর আর প্রথম যৌবন।

অতীত ছিলো বলেইতো বর্তমান আছে।

আর ভবিষ্যত ?

কি হবে জানিনা।

আমার বাবা মদ খেতেন। সস্তা দেশী মদ। কিছু পয়সা হাতে এলেই ছুটে যেতেন মদের দোকানে। মাঝে মাঝে দু একজন অপরিচিত লোককে সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরতেন বাবা। আর প্রায় দেখতাম, রুনী কিম্বা বিথী তাদের একজনকে ঘরে নিয়ে বসাতো। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিতো ভেতর থেকে।

অনেকক্ষণ পর আবার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতো ওরা।

একদিন বিকেলে রুনী যখন একটা লোককে এনে ঘরে বসালো তখন আমিও ভেতরে ছিলাম। কি বিশ্রী দেখতে ছিলো লোকটা। কালো রঙ। সারা মুখে কাটা কাটা দাগ। চোখ দুটো বিড়ালের মত। একরাশ পান চিবুচ্ছিলো সে। হাতে সোনাব চেন-দেয়া ঘড়ি। আঙুলে অনেকগুলো আংটি।

আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম তাকে। বাবা আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলো। ইচ্ছে ছিলো না। তবু যেতে হলো। রুনী এসে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেলো।

বাবা বললেন, তুমি এখানে বসে পড়ো।

পড়ায় মন বসলো না। আমার চোখ জোড়া সেই দরজা-লাগানো ঘরটার দিকে বারবার উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো।

কি হচ্ছে ওখানে ?

বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে এক সময় সরে পড়লাম আমি।

ঘরের পেছন দিকের বেড়াটা মাঝে মাঝে উইপোকায় খাওয়া। তার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম।

দেখলাম।

আমার বোন রুনী। আটহাতি শাড়ীটা দিয়ে যে সারাক্ষণ তার

দেহটাকে ঢেকে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকে, কাঁধ থেকে আঁচলটা খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ওটাকে তুলে এনে গলার সঙ্গে পেঁচিয়ে দেয়, সেই বোন আমার বিছানায় চুপচাপ বসে। আর সেই লোকটা, রুনীর নগ্ন বাহু, নগ্ন কাঁধ আর পিঠের ওপর হাত বুলোচ্ছে।

ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম বারান্দায়। বাবা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। কর্কশ গলায় প্রশ্ন করলেন : কোথায় গিছলি ?

মিথ্যে কথা বললাম। বললাম : পেচ্ছাব করতে।

পড়তে বসলেই তোমার পেচ্ছাব পায়। অপদার্থ কোথাকার।

বাবা অকারণে বকলেন আমায়।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো।

রাতে ঘুমোতে এসে রুনীকে বললাম সব।

বললাম : ও লোকটা তোর গায়ে অমন করে হাত বুলোচ্ছিলো কেনরে ?

রুনী চমকে উঠলো। পরক্ষণে প্রশ্ন করলো : তুই দেখলি কোথা থেকে ?

ওই বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

উইপোকায় খাওয়া বেড়াটার দিকে একবার তাকালো রুনী। ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেলো। কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ ধরে। মুহূর্তের জন্যে ওকে একটু বিষণ্ণ মনে হলো। তারপর সহসা শব্দ করে হেসে উঠে বিছানায় গড়াগড়ি দিলো রুনী। বললো : ওটা কিছুনা। ওর নাম টাকাআনাপাই বলে আবার শব্দ করে হেসে উঠলো সে। হাত বাড়িয়ে আমার মুখটা টিপে দিয়ে বললো : কাউকে বলিস না কিন্তু অ্যাঁ ? তোকে অনেকগুলো লজেন্স কিনে দেবো।

রুনী আর বিথী নাটকে অভিনয় করতো।

বাবা ওদেরকে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। মাঝে মাঝে আমিও যেতাম। কখনো কোন দূরের শহরে। কিম্বা গ্রামে। বেশ ভালো

লাগতো আমার। নতুন নতুন জায়গা দেখার আনন্দ আর নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয়।

এমনি একবার নাটক করতে গিয়ে চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাবার। তিনিও এসেছিলেন সেখানে একটা নাটকের দল নিয়ে।

বিত্তশালী বুড়ো। নাটক করা পেশা নয় নেশা ছিল তাঁর। টাকা দিয়ে দল গড়েছিলেন। সেই দল নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে নাটক করে বেড়াতেন। রোজগার যা হতো দলের লোকদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দিতেন।

বাবা আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন চৌধুরীর।

রুনী, বিথী আর আমি। আমরা তিনবোন।

বাবা বললেন : তোমাদের মামা। ওকে মামা বলে ডেকো।

সেদিন বিকেলে মামা আমাদের শহর দেখাতে নিয়ে গেলেন। নদীর ধারে অনেকক্ষণ বেড়ালাম। পার্কে গেলাম। জাদুঘর দেখলাম। তারপর বাজারের একটা মস্তবড় দোকানে নিয়ে গেলেন তিনি। আমাকে একটা লাল রঙের ফ্রক কিনে দিলেন। রুনী আর বিথীকে কিনে দিলেন দুটো ছাপা শাড়ী। বাবার জন্যে একটা পাঞ্জাবীর কাপড়।

আখড়ায় ফিরে এসে বাবা তাঁর অনেক প্রশংসা করলেন।

রুনী, বিথী, আমি, আমরা সবাই চৌধুরীর নানা গুণ নিয়ে আলোচনা করলাম।

কিছুদিনের মধ্যে চৌধুরী আমাদের খুব আপনজন হয়ে গেলেন।

মাঝে মাঝে আমাদের সিনেমায় নিয়ে যেতেন তিনি।

আইসক্রিম খাওয়াতেন।

চকলেট কিনে দিতেন।

কিছু কিছু টাকাও ধার দিতেন বাবাকে।

তারপর একদিন বাবা বললেন : ইতুকে ওর মামা সঙ্গে নিয়ে

যেতে চায় শহরে। নাচ আর অভিনয় শেখাবে। নাটকের নায়িকা বানাবে। মাসে মাসে এক'শ টাকা দেবে হাতখরচ। কিরে তুই যাবি? বাবা প্রশ্ন করলেন।

রুনী আর বিথীর চোখে ঈর্ষা। ওদের বাদ দিয়ে চৌধুরী আমাকে পছন্দ করলেন কেন।

মনে মনে খুশী হলাম আমি। বললাম: আমি কিন্তু একা যাবো না। মাকে সঙ্গে যেতে হবে।

বাবা শব্দ করে হেসে উঠলেন। কেনরে, ভয়ের কি আছে? মামার বাড়ী থাকবি। মামী আছেন। তার ছেলেমেয়েরা আছে।

বললাম: না। একা যাবো না।

যাবার প্রলোভন যদিও আমার সারা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো তবু অজানা পরিবেশের কথা ভেবে বারবার হোঁচট খাচ্ছিলাম।

নিত্যনতুন জামাকাপড়।

সিনেমা।

চকলেট।

ভালো ভালো খাবার। কার না প্রলোভন হয়।

বিশেষ করে আমাদের মত গরীবের ঘরে। যেখানে সুখ এক দুর্লভ সম্ভাবনা। ঐশ্বর্য হলো সোনার হরিণ।

আমি খুশী মনে রাজী হলাম যেতে।

তারপর একদিন চৌধুরী আমায় নিতে এলেন। বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ কি যেন আলাপ করলেন তিনি।

বাবার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন দেখলাম।

যাবার সময় আমার কান্না পেলো। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আমি কেঁদে উঠলাম। মাও কাঁদলেন। রুনী আর বিথীর চোখেও কান্না।

আমি মায়ের আঁচলের নীচে মুখ লুকিয়ে বললাম, আমি যাবো না মা।

মা যদি না করতেন তাহলে কিন্তু মনে আঘাত পেতাম। মা কিছু বললেন না। শুধু আমাকে আরো গভীর ভাবে কাছে টেনে নিলেন। মায়ের ওপর ভীষণ ভীষণ রাগ হলো আমার। তার পানিভরা চোখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, কতকগুলো রূপোর টাকা চিকচিক করছে সেখানে। তারপর সেগুলো কান্না হয়ে ঝরে পড়ছে আমার মুখের ওপর। মা অপ্রস্তুত হয়ে শুধোলেন: কিরে, অমন করে কি দেখছিস?

বল্লাম, তোমাকে মা।

তারপর চৌধুরীর সঙ্গে নতুন শহরে চলে এলাম আমি।

মামা আর মামী দুজনে দেখতে প্রায় এক রকম। মোটা এবং মাংসল। তাদের তিন ছেলেমেয়ে। বড়টা মেয়ে। বকুল। আমার সমবয়সী। ভীষণ মিশুক, আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেলো ওদের। বাড়ীর চিলেকোঠায় একসঙ্গে খেলা করতাম আমরা।

বৈঠকখানা ছাড়াও বাড়ীতে আরো দুটো কামরা ছিলো।

ও দুটোতে আমরা থাকতাম। একটাতে মামামামী। আরেকটাতে আমি, বকুল, মনু, রুবী আর ওদের দূরসম্পর্কের এক ভাই তপু।

দু কামরার মাঝখানে একটা জানালা ছিলো। আমাদের খাটটা ছিলো জানালার সঙ্গে লাগানো। কখনো কখনো ওটা খোলা থাকতো। কখনো বন্ধ।

একদিন রাতে ছারপোকার কামড়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলো আমার। জেগে দেখি, বকুল জানলা দিয়ে ওপাশের ঘরে কি যেন দেখছে। বকুল মামার বড়মেয়ে।

কৌতুহল হলো।

কি দেখছিসরে? শুয়ে থেকে প্রশ্ন করলাম।

বকুল হাতের ইশারায় আমাকে চুপ করতে বললো। মুখ টিপে

একটু হাসলো সে। তারপর আমাকে কাছে ডেকে চাপা গলায় বললো :

দেখ না।

ওর কাঁধের ওপব দিয়ে মুখ গলিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পাশের ঘরে। দেখলাম, টাকাআনাপাই।

বকুল আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসলো।

আমি ফিস'ফিস করে বললাম : কি করছেরে ?

বকুল জোরে চুল টেনে দিলো আমার। ইস, বোঝেনা যেন; ন্যাকা সাজা হচ্ছে না।

আমি বললাম : একেবারে বুঝিনা তা নয়। টাকাআনাপাই।

তার মানে ? সে অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে।

বললাম : বারে এবার নিজে ন্যাকা সাজছো বুঝি ?

পবদিন আমি আর বকুল দুজনে আগের রাতের ঘটনাটা নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করলাম। আলাপ করতে ভালো লাগলো।

বকুল বললো, কিন্তু টাকাআনাপাই নাম হবে কেন ?

আমি বললাম, রুনী বলেছে। তারপর ওকে রুনীর গল্প শোনালাম আমি। শুনে হেসে কুটি কুটি হলো সে। তারপর সেও একটা গল্প শোনালো আমায়। তার এক ভাই আর ভাবীর গল্প।

নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে আমরাও টাকাআনাপাই-এর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলাম। আমি মন্নু বকুল আর তপু।

দুটি ছেলে।

দুটি মেয়ে।

আমরা রোজ রাতে অন্ধকার জানালায় মুখ গলিয়ে মামা আর মামীকে দেখতাম।

তারপর, কখন জানি না, আমি আর মন্নু, বকুল আর তপু, আমরা সেই ফাঁদে পা বাড়ালাম।

বেলা দুপুরে যখন মামা বাসায় থাকতো না আর মামী মোষের

মত পড়ে পড়ে ঘুমোতো তখন চিলেকোঠায় এসে জড়ো হতাম আমরা। বকুল আর তপু যখন ভেতরে থাকতো তখন আমি আর মনু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতাম। পায়চারী করতাম ঠিক আমার বাবার মতো।

তারপর।

তারপর একদিন চৌধুরীর কাছে ধরা পড়ে গেলাম।

আমি আর মনু।

দেখলাম মামা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর চোখের পলক পড়ছিলো না। আর কেমন যেন লাগছিলো তাঁকে। সহসা মনুর কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে গিয়ে ভীষণভাবে মারলেন তাকে।

মামী চিৎকার করে তাকে থামাতে গেলেন। কী হয়েছে। অমন করে মারছো কেন? হয়েছেটা কি শুনি?

ভয়ে বুকটা আমার কাঁপতে লাগলো।

মনু মার খেয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলো। তিনদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিলো। আর আমি?

মামার সামনে পড়লে তাঁর চোখের দিকে মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না। ভয় হতো। অথচ মামা সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখতেন। আর অকারণে আমার ওপর রেগে যেতেন। অকারণে বকুনি দিতেন।

তাঁর এই রূপান্তর আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুললো। একদিন একা একা বসে কিছুক্ষণ কাঁদলাম। নিজেকে বড় অসহায় মনে হতে লাগলো।

এ সময়ে হঠাৎ মামীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন চৌধুরী। বকুল মনু' তপু ওরাও সঙ্গে :গেলো। মামী আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, মামা দিলেন না। বললেন, ও গিয়ে কি করবে ওখানে। ওর বাবা আসবে দু একদিনের মধ্যে। ও এখানে থাক।

মন্নু যাবার আগে আমার হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে গেলো। খুলে দেখি লেখা আছে—চুমু নিয়ো।

মন্নুটা ভারী অসভ্যতো। লজ্জায় আমি ছাতে পালিয়ে গেলাম।

কিছুদিন আগে মন্নু লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে কতগুলো ছবি দেখিয়েছিলো। মাগো কি বিশ্রী সব ছবি। কোথায় পেলে তুমি আঁ? এগুলো কোথায় পেলে?

বাবার বিছানার নীচে। মন্নু চাপাস্বরে জবাব দিয়েছিলো।

মাগো, তোমার কি সাহস। ভয়ে বুকটা কাঁপছিলো আমার।

মামা ছাতে এসে ডেকে নীচে নিয়ে গেলেন আমায়।

মামার সে রূপ আমি আর কোনদিন দেখিনি।

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। একা ঘরে একা বাড়ীতে আমার হাত পা জমে সমস্ত শরীর বরফের মত হয়ে আসতে লাগলো।

আমার বাচ্চা ছেলেটাকে নষ্ট করেছো তুমি। কেন করেছো? সহসা চিৎকার করে উঠলেন চৌধুরী। চুপ করে আছো কেন। বলো। উত্তর দাও। আমার ছেলেটাকে নষ্ট করেছো কেন?

কি উত্তর দেবো। তখন আমার পা কাঁপছে। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে এখুনি মেঝেতে পড়ে যাবো। আহা, কেউ যদি এক গ্লাস পানি এনে দিতো আমায়।

সহসা চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো আবার। এদিকে এসো।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে আবার ডাকলেন তিনি। এদিকে এসো। অপেক্ষা না করে নিজেই এগিয়ে এলেন আমার দিকে। লোহার মত শক্ত দুটো হাতে আমার দুবাহু ধরে আচমকা আমাকে শূন্যে তুলে নিলেন। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বিছানার ওপর।

তারপর?

আমি কিছু জানিনা। কিছুই জানিনা। শুধু একবার মনে হয়েছিলো আমার হাড়মাংস সব যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

আর আমার কণ্ঠে কি একটা অস্পষ্ট ধ্বনি বেরুচ্ছে। আমি মরে যাবো। আমি মরে যাবো।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো দেখলাম চৌধুরী আমার চুলের মধ্যে মৃদু হাত বুলোচ্ছেন আর ফিসফিস করে বলছেন, কাউকে বলোনা কিন্তু আঁ? তোমাকে আমি সোনার চুড়ি কিনে দেবো। দুল কিনে দেবো। হার কিনে দেবো।

জীবনটা জটিল। মানুষের মন বোধহয় তার চেয়েও বেশী জটিল।

আমি আর মামা মানে চৌধুরী টাকাআনাপাই-এর পৃথিবীতে হারিয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে বাবা এসেছিলেন আমাকে দেখতে। সঙ্গে কিছু পিঠা চিড়ে আর গুড় নিয়ে এসেছিলেন।

তার মুখ থেকে শুনলাম, রুনী পালিয়েছে। পাড়ার একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে রুনী। তার কথা বলতে গিয়ে কাঁদলেন বাবা। অনেক অভিসম্পাত দিলেন তাকে।

বাবাকে কিছু কাপড় কিনে দিলেন চৌধুরী, আর কিছু টাকা। বাবার চোখে মুখে হাসি ঠিকরে বেরুতে দেখলাম।

আমাকে অনেক আশীর্বাদ করে আর রুনীকে অশেষ অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ী ফিরে গেলেন বাবা।

তার চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই আমার দেহে এক নতুন পরিবর্তনের ইংগিত পেলাম। মাথাটা সারাক্ষণ বনবন করে ঘুরতো। কোন কাজে মন লাগতো না। মনে হতো দুনিয়ার যত ক্লান্তি আর অবসাদ এসে আমার দেহে বাসা বেঁধেছে। কেন জানি না।

আমার শুধু কান্না পেতো। বসে বসে কাঁদতাম।

তারপর।

তারপর থেকে রাতে আর ঘুম হয়না। ঘুমোতে গেলেই একটা দুঃস্বপ্ন দেখি।

দেখি, আমি মরে গেছি।

আর আমার মৃতদেহটা কফিনে আবৃত করে একটা খাটিয়ায় রাখা। চারটে লোক। চারজন মানুষ।

একজন আমার বাবা।

একজন আমার মা।

একজন চৌধুরী।

আরেকজন মন্নু।

ওরা চারজনে খাটিয়াটাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে গোরস্থানের দিকে।

মানুষ হলো একটা ইচ্ছার নাম।

যার জন্ম আরেকটি ইচ্ছার অঙ্কুর থেকে।

যার জীবন তার এই ইচ্ছার ক্রীতদাস।

আর ইচ্ছা হলো এক সীমাহীন শূন্যতা। যার ইতি নেই। যতি নেই। আকার নেই॥

তিমিরবরণ সিংহ

সত্যোচ্চারণের অবিনত ঔদ্ধত্যে চিহ্নিত পশ্চিমবাংলার সত্তরের দশক, যার সংগঠিত ক্রোধ জ্বালা ও প্রতিবাদের বিনিময় মূল্য প্রাণ। এই সত্তরের প্রতিনিধি তিমিরবরণ। উত্তর সাতচল্লিশের ভারতে সত্তরের দশক এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। এই দশক প্রথম দেখল লাল পতাকা হাতে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক। এই কালকে সাক্ষী রেখে যখন শত শত যুবকের মাস্‌-মার্ডার ঘটে গেল, তখন রাষ্ট্রশক্তির রক্ষকের বেশে ঘাতকেরা নির্বিচারে খুন খারাবি চালাল আর বুদ্ধ-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের মানবতার ঐতিহ্যবাহীরা অবনত মস্তকে নীরবতা মারফৎ হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করল। আইনের ন্যায়ের আর মানবতার অনুমোদন লাভ করতে ঘাতকের মুখে বারেকের জন্য 'নকশালপন্থী'—এই বিশেষণটির উচ্চারণই চূড়ান্ত গণ্য হল। কারাগারে ও থানা লক্‌-আপে সরকারী হত্যাকাণ্ডের একমাত্র কৈফিয়ৎ—নিহত বন্দী পালাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কৈফিয়ৎ গৃহীতও হল বিনা মৌখিক প্রতিবাদে। রাজনৈতিক কোন দলও একবারো ঘোষণা করল না—রাজনৈতিক বন্দীদের পালাবার চেষ্টা করার মৌলিক অধিকার আছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের উজ্জ্বল ছাত্র তিমিরবরণ মধ্যবিত্তের সুরক্ষিত জীবন ছেড়ে সত্তরের অগ্নিময় ইতিহাস রচনায় সামিল হয়েছিলেন। সচেতনভাবে রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের দায়িত্ব স্বীকার করলেও ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁকে আকর্ষণ করেছে সাংস্কৃতিক জগৎ। বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় তাঁর গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি মধ্যবিত্তের ফাঁপা অস্তিত্ব নিয়ে অস্থির :

> "এক একটা রাতে আমি
> হু হু বর্ষার মতো কেঁদেছি।
> অন্ধ কুঠরীতে আগুন ঢেলেছি
> ক্ষ্যাপা সেজেছি·
> উদাসী হেঁটেছি
> ফসলকাটা মাঠে
> অন্ধকারে নেমে।" (উদাসী হেঁটেছি)

তিমিরবরণের এই আত্মানুসন্ধান পর্বের রচনা 'সংশপ্তক' ও পরবর্তী জীবনের

গল্প 'সূর্যসেনা' সংযোজিত হল। শেষোক্ত রচনাটি একটি ভূমিকা সহ 'স্পন্দন' পত্রিকার ১৯৭২-এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্পন্দন-এর সম্পাদক লিখেছেন :

"বিপ্লবী সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিমিরবরণ সিংহ, এক উজ্জ্বল তরুণ মধ্যবিত্ত যুবক চলে গিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে সুদূর গ্রামাঞ্চলে, দেশের বেশীর ভাগ দুর্দশাগ্রস্ত শোষিত মেহনতি মানুষের সঙ্গে মেশবার জন্যে। সাথে ছিল সশস্ত্র চিন্তাধারা, পঞ্চান্ন কোটি ভারতীয় মানুষের গলা থেকে শোষণের ফাঁস খুলে দেওয়ার চাবিকাঠি। মূলতঃ রাজনৈতিক কাজকর্মের সাথে সাথে তিমির তাঁর সংস্কৃতি চর্চাও চালিয়ে যেত। এই সংস্কৃতি চর্চা যে অবশ্যই নতুন সংস্কৃতি, নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা সশস্ত্র বিপ্লবী সংস্কৃতি বিষয়ক, বর্তমান গল্পটি তারই জলন্ত উদাহরণ। তিমির ২৪শে ফেব্রুয়ারি, উনিশশো একাত্তরে বহরমপুর জেলে 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের' চরম প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ত পুলিশ বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে অন্যান্য অনেক বিপ্লবী কর্মীর সাথে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেন। তিমির ও জেলের অন্যান্য অনেক বিপ্লবী বন্দীদের এই মৃত্যু আমাদের কাছে হিমালয়ের থেকে ভারী, আর সেই কারণেই সারা দেশের শোষিত মানুষ, এমন কি সারা দুনিয়ার শোষিত মানুষ অন্যান্য বিপ্লবীর মৃত্যুর মতো তাঁর মৃত্যুকেও বহু যুগ ধরে বিপ্লবী অভিনন্দন জানাবে।

"তিমিরের শেষ দিককার বেশীর ভাগ লেখা পুলিশ কর্তৃপক্ষ নষ্ট করে ফেলেছে। আমরা তাঁর সেই সময়কার কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া রচনা উদ্ধার করতে পেরেছি। এ সবের মধ্যে থেকে বাছাই করে বর্তমান গল্পটি প্রকাশ করা হল। গল্পটি এক জায়গায় অস্পষ্ট থাকায় ও দু এক জায়গা সংগ্রহের আগেই ছিঁড়ে হারিয়ে যাওয়ায় সম্ভবতঃ মূল যোগসূত্র কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

শুধু বহরমপুর জেল আর তিমিরবরণ সিংহই নয়, সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক বন্দী ও কারারক্ষীবাহিনীর মধ্যে অন্ততঃ ২০টি বড় আকারের ও অসংখ্য ছোট আকারের ঘটনা ঘটেছে। পরিকল্পিতভাবে জেল কর্তৃপক্ষ বিপ্লবী নিধন কার্য চালিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের চাপে ১৯৭৫-এ হাওড়া জেলে বন্দী হত্যার বিষয়ে শর্মা তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। সেই কমিশনের রিপোর্টও 'জরুরী অবস্থা'-র সুযোগ নিয়ে প্রকাশিত হয় না। অংশবিশেষ ছাপা হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। এই রিপোর্টের একাংশ :

"...Use of force and firing by the sentries inside the Howrah District Jail (on May 3, 1975) was not only excessive, but also illegal and unjustified having regard to the nature, manner, number, occassion and timing of the use of force including firing The incident shocked not only the relations of the dead and the injured, but also the social and moral conscience of the people here and abroad.."

শর্মা কমিশন শুধু হাওড়া জেল নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলখানায় সংঘটিত এইরকম সবগুলি ঘটনার জন্যই প্রশাসনকে দায়ী করেছেন। নিরস্ত্র বন্দীদের পিটিয়ে ও গুলি চালিয়ে যারা হত্যা করেছে তারা জানে না বন্দীদেব বিপ্লবী আদর্শ অবিনশ্বর। মরণ সাগব পারের সেই অমরতাকে স্মরণ করেই সত্তরের আত্মত্যাগী বিপ্লবীদের কণ্ঠে ছিল এই গান :

এই তপ্ত অশ্রু হোক শক্তি।
এই শোকের আগুন জ্বলুক দ্বিগুণ
চিরশত্রুর পরে ঘৃণার আগুন।
জ্বলুক জ্বলুক দাবানল,
দাবানল জ্বলুক দাবানল জ্বলুক
দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ুক
বিপ্লবের দাবানল।
সামনে মোদের কত বীর শহিদ,
মুক্তিযুদ্ধে দিল জীবন বলি।
এসো তাদের সে পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে
রক্ত চিহ্ন বেয়ে এগিয়ে চলি।
শোন, শহিদের ডাক, সাহসী হও।
আত্মত্যাগের পথে সাহসী হও।
হাজার বাধা ঠেলে সাহসী হও।
বিজয় অর্জনে সাহসী হও।
উন্নতশীর তব জয়যাত্রা গাও
মুক্তির পথে অবিচল॥

সংশপ্তক

তিমিবরণ সিংহ

আসলে মশায় আমি গড়িয়াহাটার প্রেমে পড়ে গেছি। সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময়েই চোলে আসবেন, দেখবেন কেমন জ্বলে উঠেছে। তিন শ' রূপওয়ালা বাপ্‌কা ছেলে অরুণাংশু সেনও সামনে খ্যাক-খ্যাক ক'রে মোজাইক ফ্লোর বাথ টাব ভোগী তিনটে পাঁচটা ছেলের সঙ্গে হিস হিস ক'রে বেরিয়ে যাওয়া ডবকা মেয়েগুলোর ডাইমেনশন নিচ্ছে। তখন শালা তুমি আমি সব এক লেভেলের—একেবারে সাম্যবাদ।

আহা-হা 'সাম্যবাদ', চুঃ—তুমিও যো, আমি ভি সো। কেষ্টা, বিল্টু, ঝণ্টু, Soণ্টু, মায় গুরুদেব পর্যন্ত Saব্ Samান্। উঁচু-নীচু জমির উপর দিয়ে হাঙ্গরমুখো বুলডোজার চালিয়ে দাও—ব্যস, সব লেভেল্‌ড্। হ ভাই, সেইদিন ওই ড্রাইভারের পোস্টটা আমায় দিস, হড় হড় হড়। Soলরে আমার বুলডোজার Soল।

কি বললেন, মজা লাগছে?—আরও মজা লাগাতে পারি যদি মাইরি এক কাপ চা খাইয়ে দেন। আর ওর সঙ্গে যদি একটা চপের অর্ডার হয়ে যায় তো চাবুক! কি বললেন—আপনি তাতেই রাজী? চা-বুক। চাই কি গল্পটা আপনাকে তিনবারও শুনিয়ে দিতে পারি।

আমার এখন বয়স কত—ধরুন সাতাশ! এই তো, তখন আমি তেইশ কি একুশ, বুঝলেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েছি টিউশনিতে যাবো—পকেটে চারটি দশ। দিল্ সরিফ। আগেই রাস্তাটা এক পশলা ভিজে গ্যাছে। বিকেল তিনটের কলকাতাকেও আপনার কেমন মায়া মায়া ঠেকছে। আমাদের গলি থেকে ট্রাম রাস্তায় পড়েছি, গড়িয়াহাটার মোড়ে নামতে হবে। ওখান থেকে বাস ধরবো। রাস্তার ধারে দেখলাম একটা ছেলে নিঃসঙ্গভাবে তেলেভাজা-ভাজছে। বেগুনিটা তখনো কড়ায় লাস হয়নি। ব্রিলিয়াণ্ট! ওটাই টারগেট ছিল মশাই, কিন্তু ঠিক সময়ে ছাত্রের কাছে পৌছতে হবে। আমি

ভাগ্যবান, থালার আলুর চপগুলো সত্ত ভাজা ছিল। তারই দুটো খেতে খেতে ও ফ্লেভার নিতে নিতে হকার্স কর্নার পর্যন্ত চোলে এসেছি, হঠাৎ আমার পিছন থেকে পূর্বতন প্রেয়সীকে চিনতে পারলাম। 'প্রে য়-সী'! আমি ডাকিনি। আমি কাউকে ডাকতে পারি না।...মেয়েটি কিন্তু চোস্ত।...আমার উনিশের বয়সের দুটো স্মৃতি: এক আমার মায়ের মৃত্যু, আর তুই—

আমি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলাম। আমাকে চিনতে পারেনি অথবা চেনবার চেষ্টা করেনি। আমি নিরুত্তাপ ভাবে এগিয়ে গিয়েছিলাম। গড়িয়াহাট মোড় পর্যন্ত চোলে এলাম তারপর কিভাবে যেন যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিকেই ফিরে হাঁটতে লাগলাম। আসলে তিন বছর পর, মহাশ্বেতার মুখটা আমার পুরোপুরি দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ঠিক যেখানটায় ওকে পেরিয়ে এসেছিলাম, সেখানে ওকে দেখতে পেলাম না। আমার নিজেকে ঈষৎ দুঃখী মনে হতে লাগল। আমি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হকার্স কর্নারের প্রত্যেকটি আনাচ খুঁড়ে নিতে চাইলাম।

অবশেষে আমার সমস্ত আবেগ চেনা হয়ে গেল। অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমার খুব পেচ্ছাপ পেয়েছিল।

আমার 'পূর্বতন প্রেয়সী' নিভাঁজ মুখ নিয়ে, একটা স্মার্ট ভক্সল গাড়ির পিছনের সীটে বসে যৌবনকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিচ্ছিলেন।

আমার পড়াতে যেতে সেদিন কিছু দেরী হয়ে গিয়েছিল মশায়।

সত্যেন, তুই এক তরুণ বট। তুই আমাকে সঠিক দুঃখ চিনিয়ে দে। তুই বলেছিলি, আমার মনে আছে—

সূর্যসেনা

তিমিরবরণ সিংহ

একটা জ্বলন্ত আগুনের ডেলা গাঁক করে ছুটে বেরিয়ে এল। কোটি কোটি বছরে যে বিচিত্র মানুষের সৃষ্টি সেই মানুষের বুক কবুতরের মতো ভালোবাসায় কাঁপছিল। সেই ভালোবাসার কবোষ্ণ ঢালু বুক লোভী কসাইগুলো ফেঁড়ে ফেলল।

আর ঝড় উঠল, রক্তের মতো হয়ে গেল সারাটা আকাশ। মরদগুলোর চোখের কোণে কোণে প্রতিহিংসা ছুরির মতো কেটে কেটে বসে গেল।

চৈত্রের হল্‌কা বাতাসে সাঁওতাল গাঁওটা তখন নেড়ী কুত্তার মতো হাঁপাচ্ছে। শুকনো রুটির মতো পেটে মরদগুলো তাড়ি গেলে আর খরা বাতাস ওদের বুকে বাড়ি মারে। আর সেই ভুখা সূর্যের জ্বলুনি বুকে নিয়ে একটা ছেলে এল সেই গ্রামে। বলল, লড়তে হবে। বলল, অস্তর হাতে নিতে হবে, এককাট্টা হতে হবে, লড়তে হবে জান্ কবুল করে—এটা ইজ্জতের লড়াই। দেখ্ তোদের বাপদাদাদের রক্ত লেগে আছে এ মাটির সঙ্গে, এই মাটিতে তোদের রক্তের ফসল ওঠে।

বর্ষা নামল মৃত্যুর মতো অন্ধকারকে বুকে নিয়ে, বর্ষা নামল আগুনের টুকরোর মত আকাশ ফাটিয়ে।

সারাদিন বৃষ্টি চলল, বর্শার ফলার মতো বৃষ্টির টুকরোগুলো মরদগুলোর বুকে বিঁধতে লাগল, বুক খামচে ধরে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল লখিন।

শকুনটা উড়ছিল ঘোলাটে চোখদুটোর লোভী দৃষ্টি নিয়ে—ওটা স্থির হয়ে দাঁড়াল গ্রামটার মাথার উপর—নখ থেকে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে নামল মাটি পর্যন্ত, খামচে ধরল গ্রামটাকে—নখগুলো বিঁধিয়ে দিল ঢালু বুকে।

চম্পার বুকফাটা চীৎকারে গাঁওটার বুক কাঁপিয়ে উঠল, হেঁই গো মরদরা—

ছেলেটি বলল, আমাদের খুন ঢালতে হবে—তাজা খুন। বলল, আমাদের নেতা চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ। ছেলেটি রক্তের মত লাল বইটা খুলে মাও সে তুঙের ফটোটা দেখাল, 'ইনি চীন দেশের আশি কোটি মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, এঁর নেতৃত্বে লড়াই করে আশি কোটি মানুষেব গলার ফাঁস খুলে গেছে। ইনি বলেছেন, কোনো কোনো মৃত্যু বেলে হাঁসের পালকের চাইতেও হাল্কা আর কোনো কোনো মৃত্যু হিমালয় পাহাড়ের চাইতেও ভারী।

ছেলেটির গলার স্বর আবেগে কাঁপছিল, আমরা যদি স্বার্থপরের মতো মরি, তাহলে ঐ মরণ দেখে ঐ যে বেলে হাঁসটা উড়ে যাচ্ছে ওর পালকটাও হাসতে থাকবে। আর যদি সমস্ত গরীব ভাইদের জন্য আমরা মরতে পারি, তাহলে হিমালয় পাহাড়টাও মাথা নোয়াবে।

কি আছে, আমরা তো মরেই আছি—আমরা যদি ঐ কেউটে সাপগুলোকে জিন্দা রেখে দিই তাহলে উয়ারা আমাদের চ্যাংড়াদের বুকেও বিষ ঢালবে। ঐ কেউটে সাপগুলোর ফণা কাটতে হবে।

—কিরে পারবি না ?

—হাঁ, পারব না কেন ?

বর্ষা কেটে গেছে। অন্ধকার আকাশটা পাতলা হয়ে জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে। জ্যোৎস্নার বুকে বিরাট বিরাট মহুয়া গাছগুলো বারমাসের এক দুঃখের ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে। লাল কাঁকড়ের ঢিবিগুলো রাত্রিবেলা বন্য বিড়ালের মত ঘুমিয়ে রয়েছে। এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নার মধ্যে গাঁওটা ঘুমোতে পারে না। লখিনের বুকের মধ্যে একটা সাদা হাড়ের করাত কেটে বসে রয়েছে।

আলোছায়ায় তারাগুলো নিঃশব্দ স্বপ্নের ফিনকি ছিটোচ্ছে। ঐ স্বপ্নের ফিনকি চম্পার চোখে দেখত লখিন। তাই ঐ নীল

তারাগুলো চম্পার কথা মনে পড়িয়ে দেয়—লখিন ভর রাত ঠায় বসে থাকে—মাঝে মাঝে বুকের ভিতরে চিড় খেয়ে যায়—হেঁই রে লখিন, অনেক রাত হল, শুতে যা।

ঐ থিরথিরে তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে লখিনের মনে হয়, চম্পা কাঁদছে।

'আজ অনুশোচনার দিন নয়, আগুনের মত জ্বলে ওঠার দিন, কোনো হত্যাই যেন বিনা বদলায় না যায়।' তাই কালকে আগ্নেয়গিরির লাভায় আকাশটা টকটকে লাল হয়ে যাবে, আর সেই আগ্নেয় লাভা ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মরদগুলোর বুক থেকে।

আগামীকাল কি ওদের পরব ?

["গল্পটির জায়গা বিশেষ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় একটা কাটা ছেঁড়া ভাব থেকে গেছে। যতদূর জানা গেছে : প্রতীকের মাধ্যমে শোষণ নির্যাতন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের চিত্র আঁকাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। প্রতীকটি এই রকম—প্রত্যেক বছর একটা শকুন ডানা মেলে গ্রামটাকে ঢেকে ফেলত একবার না একবার। শকুনের নোখগুলো মাটিতে বিঁধে যেত। আর প্রত্যেকবারই শকুনটা একটি যুবতী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। লখিনের বৌ চম্পাকে নেওয়ার সময়ই বাধা এল মরদগুলোর কাছ থেকে। সূর্যের আলো বুকে নিয়ে তারা যে তখন সূর্যসেনা"—'সম্মুখ' পত্রিকার সম্পাদকের সংযোজন]

Benche Thaki Bidrohe
(In Struggle We Live)
An anthology of stories, letters, statements
and reminiscences by Martyrs
of the world.
Ed. by Sidhartha Ghosh

সাহিত্যধারা

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮১

প্রকাশক | রমা ভট্টাচার্য | এ-১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭

মুদ্রক | বাণীরূপা প্রেস | ৯এ মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৯

ব্লক | টাইপোগ্রাফিক আর্টস | ৫৪।১বি পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ | ক্রিৎস গুল্ৎজে-এর মূল চিত্র (২১৯ পৃষ্ঠা দেখুন)
অবলম্বনে প্রবীর সেন

সূচীপত্র